গঙ্গোত্রী

সুবোধ ঘোষ

তিলাঞ্জলি, ফসিল, মণিকর্ণিকা, পুতুলের চিঠি
প্রভৃতি গ্রন্থের লেখক

এম. সি. সরকার এণ্ড সন্স লিঃ
কলেজস্কোয়ার, কলিকাতা—১

গঙ্গোত্রী

'সুবোধবাবুর লেখাগুলির মধ্যে আমরা এক নতুনত্বের সন্ধান পাইয়াছি। তাঁহাকে অবলম্বন করিয়া বাঙলা সাহিত্যের গতানুগতিকতার মোড় ফিরিতেছে।'

—আনন্দবাজার পত্রিকা

পর পর কয়েকটি ঘটনার অপরাধে বিশ্বের সহানুভূতি হারাতে বসেছে মান্দার গাঁ। ম্যাঞ্চেস্টার স্টার নামে বিখ্যাত বিলাতী পত্রিকা পর্যন্ত রাগ করে সম্পাদকীয় লিখেছে—অবিলম্বে মান্দার গ্রামের স্বায়ত্তশাসন বাতিল করে দেওয়া হোক।

এত বড় একটা মন্তব্যের পর নিশ্চয় গম্ভীর হয়ে কিছুক্ষণ ভাবা উচিত, কি-সম্পর্ক ম্যাঞ্চেস্টার স্টারে আর ক্ষুদ্র মান্দার গাঁয়ে? কি অপরাধ করেছে মান্দার গাঁ? দরদ ও উদারতার জন্য প্রসিদ্ধ, এত শান্ত মেজাজের ম্যাঞ্চেস্টার স্টার পর্যন্ত যার উপর চটে গেছে, তার অপরাধটাও নিশ্চয় ছোটখাটো বা সভ্যভব্য ধরণের নয়।

মান্দার গাঁয়ের আর্য পাঠশালার মাস্টার কেশব ভট্চায, বয়সে সব মাস্টারদের চেয়ে ছোট, নিতান্ত তরুণ। এই বয়সেই পুরুতগিরি, মাষ্টারী আর মোড়লী করে কেশব। ম্যাট্রিকে জলপানি পেয়েও কলেজে পড়েনি। নিতান্ত একটা গোঁয়ো স্বভাবের দায়ে কেশবের সব প্রতিভা যেন বাঁধা পড়ে গেছে।

পর পর দুটো মামলাতেই আসামীদের মধ্যে কেশব ভট্চাযও একজন ছিল। প্রথম মামলায় তিন মাস, দ্বিতীয় মামলায় পুরো পাঁচটি বছরের জেল।

বাইরে থেকে যে-ঘটনা যত কল্যাণের প্রতিশ্রুতি নিয়ে এখানে ঢুকতে চেষ্টা করুক না কেন, মান্দার গাঁয়ের জীবনে সেটা একটা মামলা হয়ে দাঁড়ায়। যেন তিব্বতী পাথরের অবিচল গোঁড়ামি দিয়ে ঘেরা মান্দার গাঁয়ের অন্তরাত্মা। সেখানে সতর্ক প্রহরীর মত একমাত্র জেগে আছে কেশব ভট্চায। এক একটা ঘটনা আসে, মান্দার গাঁ ভয়ে সন্দেহে ও আগ্রহে চুপ করে যেন কিছুক্ষণ দেখতে থাকে। তারপর কেশব ভটচায একবার যেন কানে কানে মন্ত্র ফুঁকে দেয়। • পর মুহূর্তে মান্দাব গাঁ হিংস্র হয়ে ওঠে। দাঙ্গা হয়ে যায়।

পর পর দুটো ঘটনা। স্থান ক্ষুদ্র মান্দার গাঁ। শারদীয়া পূজার কদিন আগে তিনজন খৃস্টান পাদবী আকস্মিকভাবে দীঘির ঘাটে আবির্ভূত হলেন। মান্দাব গাঁয়ের কৌতূহলী জনতা শান্তভাবে পাদরীদেব ঘিবে রইল। পাদবীরা বক্তৃতা করলেন। সাহেব পাদরীটাই সুন্দর বাংলা ভাযায খুব ভাল বক্তৃতা কবলেন, ধর্মকথা শোনালেন। এক এক কপি সুসমাচাব কোলে নিযে জনতা মুগ্ধ হযে পাদরী সাহেবের বক্তৃতা আব আবৃত্তি শুনছিল।

তারপর বক্তৃতা করতে উঠলেন একজন কালো পাদরী।—আজ তোমরা স্বর্গেব কথা শুনলে। সব সময এই কথা স্মবণে রাখবে। পদে পদে নরকের ভয আছে। তাই আজ তোমবা সবাই শপথ কর, পুতুল পুজো করবে না। কখনই না। আব পাঁচ দিন পবে তোমাদেব কাছে নরকের ভয দেখা দেবে। এখন থেকেই সাবধান হও, ভুল করো না। আর পাঁচদিন পরে মান্দার গাঁযে যেন পূজোর শঙ্খ না বেজে ওঠে। শপথ কর, শপথ কর।

জনতার স্থৈর্য আবার আশঙ্কায় টলমল করে উঠলো।—মাস্টারমশাই কোথায়? মাস্টারমশাই কোথায়? ফিস্‌ফাস্ করে সারা জনতা ক্রমেই সরব ও চঞ্চল হয়ে উঠতে লাগলো।

আসরের শেষ দিকে এক কোণে জনতার মধ্যেই কেশব ভট্‌চায নিঃশব্দে বসেছিল। কেশব ভটচাযের রুক্ষমূর্তিটা উঠে দাঁড়ালো। মাথাটা একবার দুলে উঠলো।

—মারো! ক্ষিপ্ত জনতা চীৎকার করে ঢিল পাটকেল ছুঁড়ে পাদরীদের তাড়া করে নিয়ে চললো। নিরুপায় পাদরীরা মার খেয়ে দৌড়তে দৌড়তে জেলা বোর্ডের সড়কে গিয়ে পৌছলো।

পরদিন পুলিশ এসে গাঁ ছেঁকে গ্রেপ্তার করে নিয়ে গেল ষোল জন আসামীকে। মামলা হলো। হরিশের তিন বছর, সনাতন দিগম্বর আর শিবুর দু'বছর জেল। সাক্ষী প্রমাণ না থাক্, নিতান্ত সন্দেহের কারণ থাকাতেই কেশব ভটচাযের হলো তিন মাস। ম্যাঞ্চেস্টার স্টার সম্পাদকীয় লিখলো—'ভারতীয় গ্রামবাসীর নৈতিক উন্নতির জন্য অবিলম্বে সমুচিত শিক্ষার বন্দোবস্ত করা চাই। এই সম্পর্কে একটি তদন্ত কমিটি গঠন করা হোক্। আমাদের মতে, কমিটির চেয়ারম্যান পদের জন্য ব্রিগেডিয়ার জেনারেল জন কলিন্স সবচেয়ে উপযুক্ত লোক।

দু'বছর পার হতে না হতেই মান্দার গাঁ আবার ভারতবর্ষের নাম ডুবিয়ে ছাড়লো। অদৃশ্য এক পাপের ভুত যেন পুরণো যুগের কবর থেকে মান্দার গাঁয়ের গায়ে হাড়ের টুকরো ছুঁড়ে মেরেছে। যে-কলঙ্ক চরমভাবে মুছে গিয়েছিল চিরদিনের জন্য, তারই দাগে নতুন করে দাগী হয়ে উঠলো মান্দার গাঁ। এর জন্য প্রস্তুত ছিল না মান্দার গাঁ। মান্দার গাঁ সব কিছুরই আগমন সহ্য করতে

পারে, শুধু বরদাস্ত করতে পারে না আক্রমণ, নতুনের হোক বা পুরাতনের হোক।

মান্দার গায়ের এক নিরীহ রাজপুত পরিবারের কর্তা হঠাৎ এক বর্ষার রাত্রে সন্ন্যাস রোগে মারা গেলেন। মৃত কর্তার শোকাকুলা স্ত্রী ঘোষণা করলেন—তিনি সতী হবেন। স্বপ্নে তিনি আদেশ পেয়েছেন।

ভোর হতে, খবর শুনে সারা মান্দার গাযের নরনারী ভয়ে বিস্মযে ও উত্তেজনায উদ্‌ভ্রান্ত হযে বাধা দেবার জন্য রাজপুত বাড়ির দিকে ছুটে চললো। কেশব ভটচাযেরও দৌড়ে আসতে একটু দেরি হযেছিল। রাজপুত বাড়ির দক্ষিণের মাঠে তখন শুধু ধূপ আর চন্দন কাঠের ধোঁযা থম্ থম্ করছে। সতীদাহ হযে গেছে। ঢাকী আর ঢুলিরা ঘরে ফিরে গেছে। রাজপুত বাড়ির কুলগুরু এক অবধূত শুধু গাঁজার নেশায় কাঠ হযে পড়ে আছেন মন্দিরের সিঁড়ির উপর। সারা রাজপুত বাড়ি ভযঙ্কর এক নিঃশব্দ শান্তিতে সমাধিস্থ হযে আছে। মাথায হাত দিযে কাঁপতে কাঁপতে বসে পড়লো কেশব ভটচায। অতৃপ্ত কৌতূহলের বোঝা আর আতঙ্কের শিহর মনের মধ্যে পুষে একে একে মান্দার গাযের নরনারী ঘরে ফিরে গেল।

পুলিশ এল পরদিন। রাজপুত বাড়ির দশজন লোক আর সারা গা থেকে আরও ত্রিশজন গ্রেপ্তার হলো। রাজপুত বাড়ির তিনটি পর্দানশীন বধূও গ্রেপ্তার হলেন। দাযরায সোপর্দ হলো আসামীরা।

দুটো দিন ধরে ঘরের মধ্যেই অসাড় হযে শুযে পড়েছিল কেশব ভটচায। অসহ একটা বেদনার উপপ্লবে যেন তার সকল শক্তি ও সাহসের আধার ঐ হৃদপিণ্ডটা এইবার অসহাযের মত দূরে ভেসে চলে গেছে।

শুধু রাজপুত বাড়ির লোকেরা নয়। নরেশ মুদী থেকে আরম্ভ করে

মাটিকাটা মজুর গফুরকে পর্যন্ত, হাতের কাছে যাকে পেয়েছে তাকেই পুলিশে ধরে নিয়ে গেছে।

সন্ধ্যে বেলা চুপি চুপি এসে নরেশ মুদীর ছেলে সন্তোষ ডাকলো—মাস্টার মশাই!

—কি খবর?

—ছোট রাজপুতের বৌটি নাকি দাঁতে দাঁত লেগে হাজতে পড়ে আছে। আজও জ্ঞান হয়নি। সকলে বলছে, রাজপুত বাড়ির বৌদের নাকি পুলিশে মারধর করেছে মাস্টার মশাই।

যেন হঠাৎ আগুনের আঁচ লেগে ছটফট করে উঠলো কেশব। তখুনি ঘর ছেড়ে বাইরে বের হয়ে গেল।

এক মাসের মধ্যেই এই নিদারুণ মামলার নতুন একটি আসামী গ্রেপ্তার হলো—কেশব ভট্চায। মাঝের ক'টা দিন শুধু স্বাধীন ছিল কেশব, গাযে গাযে আর সদরে আনাগোনা করছিল। চাঁদা তুলছিল, গোপনে গোপনে একটি ডিফেন্স কমিটি গঠন করেছিল। প্রতি শিক্ষিত ভদ্রলোক দূর্ দূর্ করে তাড়িযে দিয়েছে কেশবকে। মান্দার গাঁযের এই নৃশংস সাহসের লজ্জায় তাঁরা মর্মে মর্মে লজ্জিত হযেছেন, ক্ষুব্ধ হয়েছেন। কেশবের গ্রেপ্তার হতেও বেশী দেরি হয়নি।

অবধূতের চোদ্দ বছর, আর বাকী সবাইয়ের দশ বছর থেকে সুরু করে ছ' মাসের কয়েদ হলো। বধূ তিনটি ছাড়া আর কোন আসামীই রেহাই পেল না। কেশব ভট্চাযের হলো পাঁচ বছর। রায় শুনে হেসে ফেলেছিল কেশব।

ম্যাঞ্চেস্টার স্টারের ব্যস্ততা এখনো বোধ হয় শান্ত হয়নি। নিত্য-

নতুন করে সম্পাদকীয় লিখছে ম্যাঞ্চেস্টার স্টার—'এখনো আমাদের কর্তব্য শেষ হয়নি। আরও বহু শত বছর ধরে ভারতবর্ষকে সেবা করতে হবে, যতদিন না এই বিরাট অবনত দেশের প্রত্যেকটি মানুষ সুশাসনের গুণে শিক্ষিত হয়ে ওঠে। ভারতবর্ষের সঙ্গে আমাদের এক অবিচ্ছেদ্য ও পবিত্র কর্তব্যের সম্পর্ক রয়েছে এবং যতদূর মনে হয় চিরকাল থাকবে।'

আজ আবার পাঁচ বছর পরে জেল থেকে ছাড়া পেয়ে মান্দার গাঁয়ে ফিরছে কেশব ভটচায। মান্দার গাঁ ঠিক আছে, সারা ভারতবর্ষ ঠিক আছে। জেল ফটকের বাইরে পা দিয়ে মাটি ও আকাশের দিকে তাকিয়ে কেশব যেন একটা নিশ্চিন্ততার নিঃশ্বাস ফেলছিল। কিছু বদলায় নি। কিছু বদলাবার নয়। তার মাটি ও আকাশ চিরকাল এমনিভাবে আপন মহিমায় নিরেট হয়ে থাকবে। কেশব তখনো জানতে পারে নি, মান্দার গাঁয়ের সাগরপারের অভিভাবক ম্যাঞ্চেস্টার স্টারে একটি শোকসংবাদও বেরিয়েছে—"ভারতের বিখ্যাত প্রাক্তন কয়েদী বালগঙ্গাধর তিলকের মৃত্যু হয়েছে। তবুও ভারতের বর্তমান রকম সকম সুবিধার নয়।

গাঁয়ে পৌঁছুতেই সন্ধ্যা হয়ে গেল। জেলা বোর্ডের সড়ক ছেড়ে আমবাগানের সরু পথে নেমে পড়লো কেশব।

আমবাগানের সরু পথে বিষাক্ত কেউটের দল ঘুরে ফিরে বেড়ায়। নির্বোধ মান্দার গাঁ, কেশব মাস্টার ততোধিক দুর্বোধ্য, কেউটে সাপগুলির প্রকৃতিও অদ্ভুত। হাততালি দিলে ভয় পায় না, আরও জোরে তেড়ে আসে ছোবল দিতে। কেশব জানে, মান্দার গাঁয়ের এই বন্য প্রবেশ পথে দাঁড়িয়ে শুধু পরম আদরের সুরে শিস দিতে হয়। কেউটেরা সরে যায়।

শিস দিতে দিতে আমবাগানের সরু পথ ধরে গাঁয়ের দিকে এগিয়ে চললো কেশব।

গঙ্গোত্রী

দীঘির ঘাট পর্যন্ত অন্ধকারে হেঁটে আসতে আসতে তিনবার দিকভুল হলো কেশবের। পথটা যেন নতুনভাবে এঁকে বেঁকে গেছে, তাই কেমন অচেনা-অচেনা মনে হয়। পাঁচ বছর আগেকার সেই পরিচিত ধুলো, আজও আগের মতই সন্ধ্যার শিশিরে শান্ত ও ঠাণ্ডা হয়ে রয়েছে। তবু এক একটা জায়গায় হঠাৎ অপরিচিতের মত লাগে। যেখানে পথটা সোজা থাকার কথা সেখানে হঠাৎ ডাইনে বেঁকে গেছে মনে হয়। যেখানে বড় বড় মাটির ঢেলায় রূঢ় হয়েছিল পথটা, সেখানে কাদা জমে রয়েছে; অকারণ এক পতনের আবেগে যেন একটা ডোবার কিনারায় নেমে আবার ওপরে উঠে গেছে। অন্ধকার হলেও বোঝা যায়, এখানে ওখানে বেড়া-বাঁধা নতুন এক একটা ক্ষেত আর বাগান নিজের নিজের ঠাঁই বুঝে শক্ত হয়ে নিঃশব্দে বসে আছে। তারই ভিড়ে ও বাধায় পথটা খান্ খান্ হয়ে এদিক-ওদিক এঁকে বেঁকে গেছে। তাই দিক-ভুল হচ্ছিল কেশবের।

মান্দার গাঁ বোধ হয় বদ্‌লেছে। পথচলার ক্লান্তির ফাঁকে ফাঁকে কেশবের মনের কোণে একটা সন্দেহ ক্ষণে ক্ষণে উঁকি দিচ্ছিলো। পাঁচ বছরের একটানা নির্বাসিত জীবন তার কাছে এক রাত্রির ঘুমের মতন পার হয়ে গেছে। তার মধ্যে এতটুকু স্বপ্নের স্পর্শ ছিল না। কোন নতুন হাসি-কান্নার আবেগ তার চেতনাকে বিহ্বল করেনি। শুধু এই ঘুম ছেড়ে একদিন জেগে উঠবে কেশব, তারপর মান্দার গাঁয়ের আকাশে আবার একটি পরিচিত প্রত্যুষের আলো দেখতে পাবে। যা-কিছু যেভাবে ছেড়ে আসতে হয়েছিল একদিন, সবই সে তেমনিভাবে ফিরে পাবে। আম বাগান

থেকে দীঘির ঘাট পর্যন্ত আসতে আসতে কেশবের সেই অধিকার আশার ছবি যেন মিথ্যে হয়ে যাবার আভাষ দিয়ে মনের ভেতর কেঁপে কেঁপে উঠলো।

আর্য পাঠশালার টিনের চালাটা আছে কিনা, এখানে দাঁড়িয়ে অন্ধকারে ঠিক ঠাহর হয় না। কিন্তু এখানে যে একটা ঘন বাঁশঝাড় ছিল, লক্ষ জোনাকির খেলায় অন্ধকার ঝিক ঝিক্ করতো, একটা আলোময় সঙ্কেত এখান থেকে যেন পথ চিনিয়ে দিত—আর একটু বাঁয়ে এগিয়ে গেলে প্রথম দালান বাড়িটাই হলো মাধুবীদের বাড়ি। কিন্তু সেই বাঁশঝাড়টা নেই, তার বদলে পরিষ্কার এক টুক্‌রো মাঠ, এখানকার অন্ধকার কেমন যেন ঝরঝরে ও পরিচ্ছন্ন হয়ে গেছে।

সত্যিই বদ্‌লেছে মান্দার গাঁ আর সন্দেহ নেই। কেশব হয়তো এই পাঁচটি বছর এক ঘুমে পার করে দিয়েছে, কিন্তু সেজন্য মান্দারগাঁও পাঁচ বছর ঘুমিয়ে কাটায়নি। এইটুকু পথ চলতেই কেশব বুঝতে পারে, ছোট ছোট কাঁটার মত সেই পরিবর্তনের নানা ছোট ছোট প্রমাণ ছড়িয়ে রয়েছে অন্ধকারে। ছোট ছোট বেদনার মত মনের ভেতর বিঁধতে থাকে।

একটু তাড়াতাড়ি বাকী পথটুকু হেঁটে বাড়ির কাছাকাছি পৌছলো কেশব। বাড়ি অর্থাৎ সাতপুরুষের ভিটে। নীচে ক্ষেতের আলের উপর দাঁড়িয়ে দেখলে বাড়িটাকে একটা স্তূপপীঠের মত দেখায়। ছেলেবেলা থেকেই আপন দেহের ত্বগস্থিমাংসের মত এই বাড়ির রূপ রস গন্ধ স্পর্শকে আপন করে চেনে কেশব। নিজের সাতপুরুষের ভিটের কাছাকাছি এসেও দু'তিনবার থম্‌কে দাঁড়ালো কেশব, পথ ভুল হলো। কলাবাগান আর নোনা আতার গাছটাকে বাঁয়ে রেখে পথটা অনেকখানি দূরে সরে

গেছে। উত্তরের বাগানটা সংক্ষিপ্ত হয়ে গেছে। পূবে-পশ্চিমে লম্বালম্বি একটা বেড়া বাগানটাকে দু'ভাগ করে রেখেছে।

—আমি এলাম গো মা।

উঠোনে দাঁড়িয়ে ডাক দিতেই একটি প্রদীপ হাতে নিয়ে ঘর থেকে বাইরে এলেন সারদাদেবী—কেশবের মা। সারা মন আনন্দে চঞ্চল হয়ে উঠলেও কেশব চুপ করে দাঁড়িয়ে দেখছিল, ঠিক আগের মতই ডাক শোনামাত্র প্রদীপ হাতে নিয়ে ধীরে ধীরে ঘরের বাইরে এসে মা দাঁড়ালেন। সেই সাদা থান কাপড়, সেই রকমই সাদা সুন্দর মূর্তিটা। সেই রোগা রোগা মুখখানা, সব সময় গায়ে যেন একটা পূজোর ঘরের গন্ধমাখা। মাকে প্রণাম করার জন্য যেন ছট্‌ফট্‌ করছিল কেশব, কিন্তু প্রণাম করবার লোভে নয়, এখুনি মা তার মাথায় হাত দেবেন, সেই পরম স্পর্শটুকুর লোভে এক লাফে সত্যিকারের লোভীর মত এগিয়ে এসে মায়ের পায়ের ধূলো নিল কেশব।

মাথায় হাত বুলিয়ে দিচ্ছিলেন মা। অদ্ভুত এক শান্তি ও সান্ত্বনার তৃপ্তিতে কেশবের মনের সব সন্দেহের ভয় একে একে বাতিল হয়ে যাচ্ছিল। না, মা ঠিক আছেন, সব ঠিক আছে। তার সাত পুরুষের ভিটে, দীঘির ঘাট, মাধুরীদের বাড়ি, আর্য পাঠশালা—সব ঠিক আছে।

কেশবের মুখের কাছে প্রদীপটা তুলে নিয়ে অনেক্ষণ ধরে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখলেন সারদা। তার রোগা মুখের বিষণ্ণতা ছাপিয়ে চোখের দৃষ্টিটা প্রখর একটা আগ্রহে জ্বল্‌জ্বল্‌ করছিল। একটা প্রতিহিংসাপরায়ণ মাতৃস্নেহ যেন সকল দিকে ব্যর্থ হয়ে এতদিন চুপ করে দিন গুণছিল।

আজ তাই যেন তিনি ওজন করে হিসেব নিচ্ছিলেন, তার অপহৃত জিনিস তিনি ঠিকমত ফিরে পেয়েছেন কি না।

কেশবের কানের কাছে প্রদীপটা একটু উঁচু করে তুলে ধরলেন সারদা, আর এক হাতে কানপাটির কাছে একটা ক্ষতচিহ্নের উপর আঙুল বুলিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন—এটা কিসের দাগ রে খোকা ?

কেশব হেসে হেসে বললো—ওটা একটা দাগ।

সারদা আর কিছু বললেন না। কেশবের খোঁচা খোঁচা দাড়িমাথা মুখের ওপর হাত বুলিয়ে দিতে লাগলেন।—এত রোগা আর এত বুড়োটে কেন হয়ে গেলিরে খোকা ?

এটা একেবারেই জিজ্ঞাসা করার মত প্রশ্ন নয়। তবু মা আজ অবুঝের মত সেই কথাই বলছেন। কেশব মুখে হাসছিল, কিন্তু মনে মনে একটু আশ্চর্য না হয়ে পারছিল না। মা তো কখনো এরকম বেতালা কথা বলেন না। মা যে সব বোঝেন।

সারদা আবার বললেন—যখন যা চেয়ে পাঠিয়েছিস, তখুনি তা পাঠিয়েছি। তবে এ দশা হলো কেন তোর ?

চম্‌কে উঠলো কেশব—তুমি কি বলছো মা ? আমি কিছু বুঝতে পারছি না।

সারদাও কিছুক্ষণ বিমূঢ়ের মত থেকে বললেন,—জেলের লোকেরা এসে প্রতি মাসে টাকা নিয়ে গেছে। পঞ্চাশ চাইলে ষাট দিয়েছি, একশো চাইলে একশো বিশ দিয়েছি। তুই যাতে ভাল থাকিস, তার জন্য আমি যে সব দিয়ে দিয়েছি রে খোকা। ওষুধের জন্য, ফলের জন্য, বই কেনার জন্য, যখন যা চেয়ে পাঠিয়েছিস···

কেশবের বিস্ময় আর গলার স্বর একটা আর্ত শব্দ করে শিউরে উঠলো—আমি তো কখনো কিছু চেয়ে পাঠাইনি।

মুহূর্তের মধ্যে সারদার সারা মুখ ক্রমে করুণ বিবর্ণ ও তারপর একেবারে ফ্যাকাসে হয়ে গেল। বিড় বিড় করে বললেন—কিন্তু ওরা যে প্রতি মাসে এসে টাকা নিযে গেছে। গাছ বেচেছি, পুকুরের মাছ বেচে দিযেছি, সোনা রূপা যা ছিল···আমি যে সব বেচে দিযে ওদের হাতে টাকা তুলে দিযেছি। আর তুই···।

—আমি শুধু ঘানি ঘুরিয়েছি।

কিছুক্ষণ চুপ করে রইলেন সারদা। পাঁচ বছর ধরে কতগুলি ধূর্ত আশ্বাসের ছলনা সদবের চরেব বেশে এসে এক মাযের হৃদযের দুর্বলতা নিংড়ে নিংড়ে পযসা আদায কবে চলে গেছে। ক্ষতির হিসেবটার দিকে তাকিযে যেন ধীরে ধীরে আতঙ্কে নিষ্প্রভ হযে আসছিলেন সারদা। প্রদীপটা নামিযে রাখলেন।—উত্তরের বাগানটাকেও দু'ভাগ করে নন্দর বাবার কাছে সেদিন বিক্রী কযে দিযেছি খোকা।

—তুমি এ কী কাণ্ড করলে মা? তুমি এভাবে ঠকতে গেলে কেন মা? তোমার এ ভুল কেন হলো মা?

বলতে বলতে অভিমানী ছোট ছেলের মত ফুঁপিযে কেঁদে ফেললো কেশব।

টাকার ক্ষতি হযেছে, ঠগীরা ঠকিযে নিযে গেছে, এই ক্ষতির কারণে কাঁদেনি কেশব, কাঁদছিল অপমানের কারণে। পাঁচ বছর ধরে জেল-সংহিতার প্রতি নিগ্রহ, শাস্তি ও অমানুষিকতাকে শুধু ঘাড় উঁচু করে উপেক্ষা করেছে কেশব। কোন দিন কোন অনুগ্রহের লোভে ঘাড়

নীচু করেনি। কড়া বেড়ী ঘানি আর বেণ্টের বাড়ি, ঠাণ্ডি গারদ, মশার কামড়, আর জংলী খিচুড়ী, মেটের খিস্তি আর ছেঁড়া জাঙ্গিয়ার বর্বরতা—মনে প্রাণে কয়েদী হয়ে সব কিছু সহ্য করে এসেছে কেশব। কিন্তু তার সকল অহঙ্কার মিথ্যে করে দিয়ে মা এ কী কাণ্ড করে বসে আছেন।

সারদা শুধু নিস্তব্ধ হয়ে দেখছিলেন—কেশব অঝোরে কাঁদছে। তাঁরই সেই চিরকেলে গোয়ার দুরন্ত খোকা। আছাড় খেয়ে মাথা ফাটিয়েও কোনদিন একটা উঃ-আঃ শব্দ করেনি।

ধীরে ধীরে উঠে এসে সারদা কেশবের মাথাটাকে বুকে জড়িয়ে ধরলেন—কাঁদিস না রে খোকা। আর আমায় জ্বালাস্‌নি। সহ্য করতে পারছিলাম না, তাই আমার মাথা খারাপ হয়েছিল। নইলে আমি ঠকতাম না।

শান্ত হলো কেশব। মা'র এই করুণ আক্ষেপের পেছনে একটি বড় কথা লুকিয়ে রয়েছে—মা মাপ চাইছেন।

কেশব বললো—তুমি কিন্তু একেবারে বদ্‌লে গেছ মা।

সারদা চুপ করে রইলেন, যেন নীরবে একটা ধিক্কারকে মনে মনে মেনে নিলেন। জীবনে যেন তিনি এই প্রথম তাঁর খোকার কাছে ছোট হয়ে গেলেন। জীবনে তিনি যেন এই প্রথম তাঁর খোকার একটা ক্ষতি করলেন।

—হ্যাঁ, আমি বদ্‌লে গেছি। চল্, ঘরের ভেতরে চল।

সারদা আবার প্রদীপটা তুলে নিয়ে সস্নেহে কেশবের হাত ধরলেন। আবার সহজ স্ফুর্তির সঙ্গে উঠে দাঁড়ালো কেশব। মা'র মুখের দিকে তাকিয়ে একটু হাসিমুখেই যেন আপশোষ করলো—এঃ, তুমি সত্যিই অনেক বুড়ো হয়ে গিয়েছ মা।

যে-কথাটা রাত্রি বেলা বলতে একটু সঙ্কোচ হয়েছিল, কেশবের ক্লান্ত পীড়িত মুখের দিকে তাকিয়ে বলতে পারেননি, আজ সকালেই বলবেন ব'লে ঠিক করে রেখেছিলেন—সেই কথাটাই বললেন সারদা।

সকাল হতেই ছটফট্ করছিল কেশব, কতক্ষণে একবার ঘরের বাইরে বের হবে, মান্দার গাঁয়ের বাতাসে একবার ছুটোছুটি করে আসবে। বাইরে বের হবার জন্য তৈরী হতেই সারদা ঘরের ভেতর থেকে বললেন—ফিরতে দেরি করিস্ না রে বাবা।

—না দেরী করবো না।

—মাধুরীরা মীরনগর চলে গেছে, বাড়িতে কেউ নেই।

কথাটা বলে কিছুক্ষণ চুপ করে রইলেন সারদা। ঘরের ভেতরে থাকলেও তিনি জানেন, কেশব তখনো বাইরে দাঁড়িয়ে আছে। এই সংবাদ শুনে চট্ করে চলে যেতে পারে না কেশব। কিছুক্ষণ চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকবেই। সারদা আবার বললেন—মাধুরী কলেজে ভর্তি হয়েছে।

সত্যিই কিছুক্ষণ স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে ছিল কেশব। সামনে একটা অপরাজিতার ঝোপের ভেতর এক জোড়া মৌটুসি পাখী মনের আনন্দে লাফালাফি করছিল। সরে গিয়ে আর একটু দূরে দাঁড়াল কেশব। দেখছিল, পুকুরটার প্রায় অর্ধেক জল দাম-বেঁধে ঢাকা পড়ে গেছে। দুটো জলপদ্মের পাতা থর্থর্ করে কাঁপছে, মাছে ঠোকরাচ্ছে পদ্মের ডাঁটা। পাঁচ বছর ধরে গ্রাম-ছাড়া নির্বাসনে থেকেও কেশব আজও একেবারে ভুলে যায়নি, পদ্মপাতার কাঁপুনির রকম দেখেই বুঝতে পারে—এটা শোল মাছের ঠোকর।

সংশয়গুলিকে মনের আড়ালেই জোর করে সরিয়ে রেখে, আবার একটা খুসীভরা আশার নিঃশ্বাস টানে কেশব। তার পুরনো দিনের মান্দার গাঁকে খুঁজে পাবার জন্য পথে বের হয়ে পড়ে।

বেশী দূর এগিয়ে যেতে হয়নি। অজয়কে দেখতে পেয়ে মনের ভার যেন খানিকটা কমে গেল কেশবের। সেই অজয়, ছেলেবেলা থেকে একই সাথীত্বের ডোরে বাঁধা দু'জনার মন। পাঁচ বছর আগে, মীর-নগরের আদালতে আসামীদের ডকে দাঁড়িয়ে একদিন দায়রা জজের রায় শুনেছিল কেশব। রায় শুনে হেসে ফেলেছিল। কিন্তু সেইখানে দাড়িয়েই পরমুহূর্তে মন-মরা হয়ে তাকিয়েছিল একজনের দিকে, অজয়ের দিকে। তার সুহৃদোত্তম অজয় উকীলবাবুর পেছনে চুপ করে দাড়িয়ে আছে, চোখ দুটো জলে ভরে গেছে।

অজয়ও তাকিয়ে দেখছিল কেশবকে। মুখে হাসি ছিল ঠিকই, কিন্তু হাসিতে চাঞ্চল্য ছিল না। কেমন যেন, হিসেব করা সাবধানী হাসি।

আরও কাছে এগিয়ে এসে অজয়ের কাঁধে হাত রাখলো কেশব। অজয় একটু ভদ্রোচিতভাবেই যেন প্রশ্ন করলো—কবে ছাড়া পেলে?

ভাগ্যিস 'পেলেন' বলেনি অজয়। কেশব মনে মনে একটু আশ্বস্ত হলো। তবু ভাল, সামান্য একটুখানি উন্নতি হয়েছে অজয়ের। ভাষার দিক দিয়ে একটু লৌকিকতা। এ ছাড়া আর কি পরিবর্তন হতে পারে?

—তুই বড় অকৃতজ্ঞ কেশব। কথাগুলি বলার সময় অজয়ের চোখের দৃষ্টিটা কেমন একটা শাণিত আভায় ঝকমক্ করছিল। হয়তো তার আড়ালে একটা রুদ্ধ বেদনা পুড়ছে, হয়তো অজয়ের চোখ দু'টো এখুনি জলে ভরে উঠবে। কিন্তু কেশব একট আশ্চর্য্য হয়েই দেখে,

অজয়ের চোখের দৃষ্টিটা সম্পূর্ণ বদলে গেছে, যেন হঠাৎ আক্রান্ত এক নিরীহ পথিকের চোখে নিরুপায় প্রতিহিংসার দৃষ্টি।

যেন আচম্‌কা একটা ধাক্কা খেয়ে একটু সরে দাঁড়ালো কেশব ভট্‌চায।
—এ আবার কী একটা কথা বল্‌লি অজয় ?

তেমনি হিসেবী হাসি দিয়ে ওজন করে আর চোয়ালটা একটু কঠিন করে অজয় উত্তর দিল—কেন, আমি কি কথা বলতে জানি না।

স্তম্ভিত হয়ে রইল কেশব। এ কোন্ ধরণের প্রলাপ বকছে অজয় ? তার মুখের ভাষা এভাবে বদলে যায় কি করে ?

—খুব যে নতুন নতুন কথা শিখেছিস অজয় !

সংযতভাবে গুছিয়ে বলতে গিয়েও কথাগুলি অস্বাভাবিক স্বরে চিবিয়ে চিবিয়ে বললো কেশব। চোখের দৃষ্টিটা তীব্র হয়ে উঠছিল। একটা হিংস্র উত্তেজনায় চাপা নিঃশ্বাস বার বার বিব্রত করছিল কেশবকে।

অজয় বললো—শিখতে হয়, বাধ্য হয়ে।

অন্যদিকে মুখ ঘুরিয়ে নিল কেশব। দাঙ্গা দুঃসাহসে ও সারা গাঁয়ের আশ্বাসে আশৈশব পুষ্ট এক দলপতির সত্তা যেন হঠাৎ পেছন থেকে টিল খেয়ে মাথা সরিয়ে নিল। যে অপমান সহ্য করবার মত নয়, তাই আজ সহ্য করতে হবে। কিছুক্ষণের জন্য ভালমন্দ বুঝবার মত বুদ্ধি ও শক্তি গোলমাল হয়ে যায় কেশবের। এক দাগী কয়েদীর জেদ আর প্রতিহিংসা ক্রমে ক্রমে উগ্র হয়ে উঠতে থাকে। অজয়ের গলাটা টিপে ধরবার জন্য হাতটা ছটফট করতে থাকে। তাড়াতাড়ি পা ফেলে চলে গেল কেশব।

অনেকের সঙ্গে দেখা হলো, সবাই চিনতে পারলো, অনেকেই কথা বললো, অনেকে বললো না।

অনেকের সঙ্গে দেখা হলো না, অনেকে মারা গেছে, অনেকে গাঁ ছেড়ে চলে গেছে।

অনেক নতুন দালানবাড়ি উঠেছে, অনেক নতুন মুখ এসেছে। অনেক নতুন বেড়া, নতুন পুকুরঘাট। পুরনো পথঘাট অনেক ভেঙে গেছে।

আর্য পাঠশালা নেই, সেই টিনের চালা নেই, ইংরেজি মিড্ল্ স্কুল হয়েছে। সরকারী সাহায্যে স্কুল চলে, হেডমাষ্টারের নাম ডেভিড দিনমণি বিশ্বাস, সদর থেকে ইনস্পেক্টর আসেন মাঝে মাঝে, স্কুলের ভালমন্দ স্বচক্ষে দেখে যান।

দীঘির পশ্চিমের মাঠটার পরিবর্তন কাল রাত্রের অন্ধকারে স্পষ্ট করে দেখতে পায় নি কেশব। আজ দেখলো, মধ্যাহ্ন সূর্যের আলোকে সেখানে স্পষ্ট হয়ে রয়েছে এক অভিনব জিনিস—ইউনিয়ন বোর্ডের অফিস। বোর্ডের প্রেসিডেণ্ট ভূদেব চাটুয্যে।

বোর্ড আফিসের মাত্র কয়েক গজ দূরে আর একটি ছোট ঘর—লাইসেন্সী গাঁজা ও আফিমের দোকান। ছোট একটা ভিড় লেগে রয়েছে দোকান ঘরের দরজায়।

সেই ভিড়ের মধ্যে থেকেই জীর্ণ শীর্ণ একটা মূর্তি উঠে এসে কেশব ভট্চাযের পা ছুঁয়ে প্রণাম করলো—ঠাকুর কবে এলেন ?

কেশব অনেক কষ্টে চিনতে পারলো। এরই নাম ভজু বাউরী, মান্দার-গাঁয়ের লেঠেল ভজু বাউরী। সেই সুঠাম শরীরের সবল পেশীর সজ্জা একেবারে শূন্য হয়ে গেছে। শুকনো হাড়-চামড়ায় শুধু ঠক্‌ঠক্ করছে একটা বিকৃত মানুষের রূপ! চোখ দুটো কাঁচা ক্ষতের মত লাল।

ঘুরতে ঘুরতে সত্যিই অনেক দেরি হয়ে গেল। কিন্তু নতুন মান্দার-গাঁকে ভাল করেই চেনা হয়ে গেছে কেশবের।

আর একটু সময় নষ্ট হলো কেশবের। মাধুরীদের বাড়িটা দূরে থেকে চোখে পড়লো। মাধুরীরা নেই। কবে চলে গেল ওরা? কেন গেল? একেবারেই চলে গেল, না আবার ফিরে আসবে? মাঝে মাঝে আসে নিশ্চয়। সামান্য কিছুক্ষণ চুপ করে দাঁড়িয়ে, শুধু একবার ভেবে নিল কেশব। তার পরেই ঘরের দিকে ফিরলো।

চলতে চলতে শুধু একটি নিষ্ঠুর সত্যকে তার সমস্ত চিন্তার বেদনা দিয়ে বুঝতে পারছিল কেশব—হ্যাঁ, মান্দার গাঁ বদলে গেছে। মান্দার গাঁয়ের গাছে আর ছায়া হয় না। ছোট মান্দার গাঁ ফেঁপে বড় হয়ে গেছে। বাইরে পৃথিবীর সঙ্গে বড় বড় জিনিস আর বড় বড় কথার আমদানী-রপ্তানী চলেছে মান্দার গাঁয়ে। দীঘির ঘাটের জনতার মত দুরন্ত সৌহার্দে ঠাসা-ঠাসি সেই প্রাণের সমাবেশ ছিন্ন-ভিন্ন হযে গেছে। কেশব মাস্টারের মাস্টারী ঘুচে গেছে চিরদিনের জন্য। গেঁযো নেতা কেশব ভট্চাযের কিশোর অহঙ্কার পাঁচ বছর পরে বৃথা গাযে ফিরে এসেছে। সে অহঙ্কার রাখার স্থান-কাল-পাত্র আজ সবই বাতিল হযে গেছে।

কিন্তু কেন? পথে চলতে চলতেই, এই নির্মম পরাভব আর প্রত্যাখানের রৌদ্রজ্বালায় কেশবের মনের সংশযগুলি ধক্ করে জ্বলে ওঠে। মান্দার গাঁয়ের জীবনে এই ছন্দপতন কেন?

কপালের ঘাম মুছে একটু অবসন্নের মত কেশব ভট্চায আবার ভাবে—কে জানে, এটা হযতো নতুন ছন্দ।

পুকুরঘাটের শেষ সিঁড়িটা পার হযে প্রায় এক-বুক জলে নেমে যেন লুটিযে লুটিযে স্নান করছিল কেশব। চারদিকের তাল-খেজুরের ছায়ায ঘেরা পুকুরটার জলে একটা উপেক্ষিত তীর্থের শান্তিকুণ্ডের আস্বাদ যেন লুকিয়ে আছে। জলে ডুব দিয়ে উঠে কেশবের সিক্ত

চোখের দৃষ্টিতে রৌদ্রতপ্ত মান্দার গাঁয়ের রূপটা ক্ষণে ক্ষণে স্নিগ্ধ হয়ে আসছিল।

বিশ্বাস করতে ইচ্ছে করে না, তবু বাধ্য হয়েই বিশ্বাস করে কেশব— মাধুরীরা নেই। গাঁ ছেড়ে শহরে চলে গেছে মাধুরী। মাধুরীও কলেজে পড়ছে। আশ্চর্য! এর চেয়ে অদ্ভুত কথা আর কি হতে পারে? মান্দার গাঁয়ের পরিবর্তনের ইতিহাসে এটাই তো সব চেয়ে বড় সত্য।

মান্দার গাঁয়ের হৃদয় থেকে সত্যিকারের স্নিগ্ধতা মুছে গেছে। না, ঠিক মুছে যায়নি। সরে গেছে, পালিয়ে গেছে।

কিন্তু কত দিনেরই বা কথা! এইতো মাত্র পাঁচটি বছর। গাঁয়ের মাঠে মখমল পোকা কুড়িয়ে আর্য পাঠশালায় নামতা পড়ে, ঝরা শিউলী নিয়ে খেলা করে আর প্রতি মাসে দুটো-তিনটে ব্রত করে যে মেয়ে বড় হয়ে উঠেছিল, সে আজ কলেজে পড়ে কেমন করে? ব্রত করতে করতে আজ তার পক্ষে তো শুধু তপস্বিনী হয়ে যাবার কথা।

কেশবের মনের ভাবনাগুলিও হঠাৎ অভিমানে সিক্ত হয়ে আসে। পাঁচ বছর ধরে জেলের ভাত খেয়ে তার কয়েদী শরীরটাই শুধু পাকা ও পোক্ত হয়ে উঠেছে। মনটা রয়ে গেছে পাঁচ বছর আগেকার। কঠোর প্রতীক্ষা আর ধৈর্যের আবরণের ভেতর কেশব যেন সযত্নে তার কাঁচা গেঁয়ো মনটিকে বাঁচিয়ে রেখেছিল। সেই মনের বিশ্বাসেই হয়তো এক তপস্বিনী মূর্তিকে খুঁজেছিল কেশব। পাঁচ বছর অদেখার দুঃখে তারও তো তপস্বিনী হয়ে যাবার কথা। সে আজ কলেজে পড়ে কেমন করে।

অন্তরে-বাহিরে খেই হারিয়ে গেছে কেশবের। মনের ভেতর ছোট

ছোট নিঃশব্দ ভাবনার দ্বন্দ্বেই তার বুদ্ধি পথহারা হয়ে যায়। এক নতুন নিয়মের দেশে হঠাৎ এসে পড়েছে কেশব। ঘটনাগুলির কারণ খুঁজে পায় না, অর্থ বুঝতে পারে না।

স্নান হযে গেল, তারপর খাওযা। তারপর ঘুম। খাওযা শেষ হতে বিকেল, ঘুম শেষ হতে সন্ধ্যা হবে। তারপর? তারপর আর কিছু করবার নেই। সন্ধ্যের প্রদীপ পুড়ে ক্ষয হতে থাকবে মাঝ রাত্রি পর্যন্ত, তবু কোন কাজ খুঁজে পাবে না কেশব। শুধু ভাবতে হবে, শুধু ঘুমিযে পড়তে হবে। এক জেল থেকে আর এক জেলে তার অন্তরাত্মা শুধু বদলি হযে এসেছে। কিন্তু এই বেদনার মেয়াদ কবে শেষ হবে, সেটা একেবারেই জানা নেই।

রান্নাঘরের দুয়ারে দাঁড়িযে সারদা ডাকছিলেন—কত দেরি করছিস কেশব, খেতে আয়।

জোর করে নিজেকে একটু ব্যস্ত করে তোলে কেশব। আছাড় দিযে জোরে জোরে কাপড়টা কাচে। পুকুরঘাটের জলে ও বাতাসে শব্দের আলোড়ন জাগে। তবুও কিছুটা জীবনের সাড়া যেন লুকোচুরি করে, ছুটাছুটি করতে থাকে আশেপাশে। কেশবের বধিরতা একটু একটু করে ভাঙতে থাকে। মাযের অহ্বান স্পষ্ট শুনতে পায়। সহজ স্ফূর্তির সঙ্গে উঠে দাঁড়ায় কেশব।

পুকুর ঘাট ছেড়ে ঘরের দরজা পর্যন্ত আসতে আসতেই আবার নেহাৎ অজ্ঞাতসারে সারা শরীরটা শ্লথ হযে আসে। চলার স্ফূর্তি স্তিমিত হয়ে পড়ে। নিজের মনের অন্ধকারের ভেতরেই আগুনে পোড়া মান্দার গাঁযের মূর্তিটা যেন ধিক্কার আর অভিশাপের ছাই উড়িয়ে ছুটাছুটি করতে থাকে। পৈতে আন্দোলন, ইউনিয়ন বোর্ডে গাঁজার দোকান,

ইংরেজী স্কুল—কুড়ুল দিয়ে কুপিয়ে কুপিয়ে কোন্ দুস্‌মন যেন মান্দার গাঁকে চিরে দিয়ে গেছে। সেই দৃশ্য ঘুরে-ফিরে স্বচক্ষে দেখেও আজ কত সুবাধ্য ভালছেলের মত ফিরে এসেছে কেশব। কোন দাঙ্গা হয়নি, একটা ইটপাটকেলও চলেনি। মান্দার গাঁয়ের সকল মাঙ্গলিকের পুরুত, মান্দার গাঁয়ের দৌরাত্ম্যের মোড়ল, মান্দার গাঁয়ের বিবেকের মাষ্টার কেশব ভট্‌চায নিশ্চয় মরে গেছে। নইলে অজয় মিত্তিরের মাথা আজ ফাটতো, ইংরেজী স্কুলের টেবিল বেঞ্চে আগুন লাগ্‌তো। কিন্তু সে-সব কিছুই হলো না কেন আজ ?

কেশব বুঝতে পারে, সে নিজেই বদ্‌লে গেছে সব চেয়ে বেশী।

জেলের জীবনে একবার ঠিক এমনি করে চুপ করে দাঁড়িয়ে মার খেয়েছিল কেশব। মাথাটা ফেটে গিয়েছিল, কানপাটির ওপরে সেই ক্ষত চিহ্নটা আজও আছে।

আজও চুপ করে দাঁড়িয়ে আস্তে আস্তে কাঁপতে থাকে কেশব। ভাবনাগুলি মনের ভেতর দৌড়াদৌড়ি করতে থাকে। এ এক অদ্ভুত ধরণের ভাবনা, ওজন আছে বলে মনে হয়। মাথার ভেতর তাদের পদশব্দের প্রতিধ্বনি যেন বাজতে থাকে। ক্ষত চিহ্নটা থেকে যেন নতুন করে রক্ত ঝরে পড়ছে অঝোরে। আবার চারদিকে স্তব্ধতা, বধিরতা ও উত্তাপ নিয়ে নিস্পন্দ ও নিরালোক একটা পৃথিবী থম্‌থম করতে থাকে। মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়ে কেশব। যেন তার চিরকেলে স্বভাবের মানুষটি হাত-পা বাঁধা হয়ে সুতরল অন্ধকারের মত এক ভাবনার গভীরে অসহায়ের মত নেমে চলেছে। চোখ-মুখ লাল হয়ে ওঠে, নিহত মানুষের মুখে ক্ষণিক রক্তোচ্ছ্বাসের মত।

সারদা দেবী দৌড়ে এসে কেশবের হাতটা ধরেন। আতঙ্কিত হয়ে

বলতে থাকেন—এরকম করছিস কেন খোকা ? কি হয়েছে ? ওঠ্ খাবি চল। ওঠ্ ওঠ্।

সারদার সস্নেহ প্রশ্নের আকুলতার একটু স্পর্শ লাগে কেশবের গায়ে। মুখ-চোখের রক্তাভ উগ্রতা ধীরে ধীরে মিটে আসে। অপোগণ্ড শৈশবের লোলুপ আগ্রহ নিয়ে সারদার বুকের দিকে কেশবের মাথাটা আর হাত দুটো যেন এক পরমাশ্রয় খোঁজার জন্য এগিয়ে আসতে থাকে।

সঙ্কোচে দু'পা পেছনে সরে দাঁড়ান সারদা। স্থির দৃষ্টি দিয়ে কেশবকে দেখতে থাকেন। তারপর বলেন—আমায় সত্যি করে বল্, জেল থেকে কোন অসুখ নিয়ে আসিস্ নি তো ?

বিস্ময় আর বিস্মৃতির কুয়াশার মধ্যে যেন কেশবের চোখ দুটো অকস্মাৎ ছল্‌ছল্ করে ওঠে। অস্পষ্ট প্রলাপের মত বিড় বিড় করে বলে—অসুখ ?

সারদা—হ্যাঁ।

কেশব—অসুখ কেন হবে ? কিসের অসুখ ?

সারদা—মাথার অসুখ।

কাল থেকে এই সন্দেহ করছিলেন সারদা, মুখে কিছু বলেন নি, কিন্তু সব সময় লক্ষ্য রাখছিলেন। কেশবের কথা, চাউনি, আচরণ, সবই কেমন একটু অদ্ভুত ধরণের হয়ে গেছে, সব সময় তার অর্থ বুঝতে পারেন না সারদা।

সারদার প্রশ্নে একটা রূঢ় আঘাত পেয়ে চম্‌কে উঠলো কেশব। তবু বহু আয়াসে তার উত্তেজিত মনের প্রতিধ্বনিকে একটু কোমল করেই উত্তর দিল—না, আমার কোন অসুখ হয়নি। তুমি ভুল বুঝেছ। তোমার বোঝবার শক্তি নেই।

সারদা হাসছিলেন। চোখের দৃষ্টিটা অন্য দিকে ফিরিয়ে নিল কেশব।

সহ্য করার শক্তি যেন ফুরিয়ে আসছে তার। আর কত সহ্য করা যায়? মাত্র পাঁচ বছরের মধ্যে সকল পুরনো মায়া-মমতা, প্রতিশ্রুতি-অনুরাগ, রাগ ও ঘৃণা বাতিল করে দিয়ে যারা একেবারে নতুন হয়ে বদলে যাবে, তারা এইভাবেই হাসবে। সারা মান্দার গাঁ এইভাবেই বেহায়ার মত হাসছে। পাঁচ বছরের মধ্যে কত সেয়ানা হয়ে উঠেছে মান্দারগাঁ। পাঁচ বছরের আগেকার মানুষকে এরা পাগল মনে করে, করুণা করে ও হাসে।

কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে সারদা বললেন—নে, ওঠ এবার, খাবি চল্।

কেশব—না, থাক্।

সারদা আবার হাসতে আরম্ভ করলেন। বিকার রোগীর মত কেশব সারদার দিকে অস্বাভাবিক একটা শূন্য দৃষ্টির আক্ষেপ তুলে বললো—এরকম করো না মা।

সারদা ভয় পেলেন। অজস্র সান্ত্বনা ও আদরের আবেগে কেশবের মাথায় হাত বুলিয়ে দিলেন। জোর করে টেনে নিয়ে গেলেন খাবার ঘরে।

নিজের আচরণে একটু লজ্জিত হয়ে চুপ করে খেতে বসলো কেশব। হেসে হেসে বললো—জেলে থাকতে মাথা খারাপ হয়নি মা, জেলের বাইরে এসে হয়েছে।

ব্যস্তভাবে ভাতের থালাটা এগিয়ে দিয়ে সারদা বললেন—না না, কিছু হয়নি।

খুসি হয়ে খাচ্ছিল কেশব। পিঁড়ির ওপর উবু হয়ে বসেছিল। ডাল ভাত তরকারী সব একসঙ্গে চট্‌কে নিয়ে বড় বড় গ্রাস তুলে খাচ্ছিল কেশব। থালাটা ঠক্‌ঠক্ করছিল, তাই বাঁ হাত দিয়ে থালাটাকে এক একবার চেপে ধরছিল। খাওয়া শেষ হলে শূন্য থালায় গেলাসের জলটা ঢেলে নিয়ে চুমুক দিয়ে খেল।

পরক্ষণেই কেশব চেঁচিয়ে উঠলো—ছি ছি!

সারদার চোখ দুটো এতক্ষণ দৃশ্যটার দিকে তাকিয়ে ভর্ৎসনা ও করুণায় পীড়িত হয়ে থাকলেও এতক্ষণ কিছু বলেননি, কোন বাধা দেননি।

কেশব আবার বললো—একেবারে অন্যমনস্ক ছিলাম মা। অভ্যাসের দোষে সব ভুল হয়ে গেল। পাঁচ বছরের অভ্যাস।

তবু সারদা চুপ করেছিলেন। কেশবের মুখটা হঠাৎ করুণ হয়ে উঠলো।—সত্যি কথাটা কি জান মা? আমি এখনো বিশ্বাস করতে পারছি না যে, জেল থেকে ছাড়া পেয়েছি, তোমাদেব কাছে ফিরে এসেছি। তাই কয়েদীর মত···।

সারদা এতক্ষণে তাঁর নীরবতা ছেড়ে কথা বললেন—মাধুরীর বাবা সঞ্জীববাবুর খুব পসার হয়েছে। মীরনগরে ওকালতি করছেন। নতুন বাড়ি করেছেন সদরে। মাধুরীর বড় ভাই দেবু এক কাণ্ড করেছে।

কেশব—কি?

সারদা—বিলেত গেছে।

বিমর্ষভাবেই এতক্ষণ সারদার কথাগুলি মন দিয়ে শুনছিল কেশব। মাধুরীদের অন্তর্ধানেব ইতিহাসের কোন কারণ খুঁজে পায়নি এতদিন। সারদার কথায় সেই জটিল রহস্যের খানিকটা অর্থভেদ হলো যেন। কেশব বললো—তাই বুঝি মাধুরীদের সবাই একঘ'রে করেছে। তাই ওরা মীরনগর চলে গেছে।

কেমন একটু উৎফুল্লভাবেই কথাগুলি বলছিল কেশব। মান্দার গাঁয়ের মানুষ হয়েও যারা মান্দার গাঁয়ের নিয়ম মানবে না, সে দুঃসাহসের ক্ষমা নেই। মাধুরীরা গাঁ ছেড়ে মীরনগর চলে যাবে, এরকম দুর্ঘটনা

বিনা কারণে হতে পাবে না। অনিযমেব প্রতিফলেই অনিযম হযেছে। তাই মাধুবীকে আজ কলেজে পড়তে হচ্ছে।

কেশব যেন মনে মনে একটু আশ্বস্ত হয।

সাবদা আবাব হেসে ফেললেন—মাধুবীদেব একঘ'রে কাবনি কেউ। গত মাসেই ওবা এসেছিল। দেবু বিলেত গেল, কত বড সভা হযে গেল স্কুল ঘবে। সবাই মিলে দেবুকে ফুলেব মালা দিযেছে।

ধীরে ধীবে মাথাটা ঝুঁকে পডে কেশবেব। কযেদীব বুদ্ধিতে আজ সোজা সত্যগুলি কিছুই ধবা পডে না। বুঝবাব নিযমগুলিও যেন এলোমেলো হযে গেছে। মান্দাবর্গা বদ্‌লে গেছে, এ সত্য জেনেও বাব বার ভুল হযে যায কেন কেশবেব? বোধ হয ভুলে যেতে ভাল লাগে।

সাবদা বললেন—তুই একটু বুঝতে শেখ খোকা।

কেশব—সব বুঝেছি।

সাবদা—দেবুব সঙ্গে আব একটি ছেলে বিলেত গেল। ওবাও মীবনগবেই থাকে। বড সুন্দব ছেলেটি, নন্দদেব কিবকম আত্মীয হয।

খাওযা হযে গিযেছিল অনেকক্ষণ। কেশব উঠে পডলো। সাবদা বললেন—একটু বুঝতে শেখ খোকা।

কেশব—আমি সব বুঝেছি মা।

সাবদা—এইবার একটু কাজকর্মেব চেষ্টা কব। ধাবকর্জ অনেক হযেছে, এইবাব শোধ কবতে হবে।

কাজ করতে হবে, পযসা উপায কবতে হবে—একেবাবে নতুন একটা কথা শুনে চম্‌কে উঠলো কেশব। জেল থেকে ফিবে এসে সব কথাই মনে পডেছে, শুধু এই কথাটাই মনে পডেনি।

সারদা বললেন—যজমানদের ভরসা ছেড়ে দে। কায়েতরা সব পৈতে নিয়েছে, তারা তোকে আর ডাকবে না। তারা ভিন্ন পুরুত আনিয়েছে।

কেশবকে নিরুত্তর দেখে সারদা আর একটু ব্যাখ্যা করে বললেন—এক উপায় হতে পারে, ইস্কুলে একটা চাকরি, যদি হেড-মাস্টার বিশ্বেস মশাইকে হাতে-পায়ে ধরে···।

দৌড়ে পালিয়ে গেল কেশব। ঘরের ভেতর ঢুকে খিল এঁটে দিল। সারদার কথাগুলি যেন মানুষের ভাষা নয়, যেন সাপের মত বিষ বমি করছে। ইংরেজী স্কুলের খৃষ্টান হেড-মাস্টার দিনমণি বিশ্বাসের হাতে-পায়ে ধরে···। কেশব ভেবে পায় না, এর চেয়েও দুঃসহ অপমানের কথা জীবনে সে আর কখনো শুনেছে কি না। জেল থেকে ফিরে এসেও সে কয়েদী হয়েই আছে নিশ্চয়। মা নিশ্চয় তাঁর ছেলেকে ফিরে পায়নি। নইলে মা নিজমুখে ছেলের কাছে এই মৃত্যুর প্রস্তাব করতে পারতেন না। এতক্ষণ মা শুধু এক কয়েদীর সঙ্গেই কথাবার্তা বলছেন। অন্তত মা তাই মনে করেন।

রাত খুব বেশী গভীর হয়নি। অঘোরে ঘুমোচ্ছিল কেশব। তার অশান্ত আত্মার সব অভিযোগ ও অভিমান যেন মৃত্যুর অভিষেক পাবার আশায় অসাড় হয়ে পড়েছিল।

উঠানে দাঁড়িয়ে ডাকাডাকি করছিল রতন চৌকীদার।—কেশব ভট্‌চায বাড়ি আছেন? আছেন যদি, বাইরে আসুন।

ধড়ফড় করে উঠে একলাফে বাইরে এল কেশব। আলো হাতে নিয়ে সারদাও বাইরে এলেন।

রতন চৌকীদার বললো—বাড়ি আছেন দেখছি। যাক্, ভালকথা বাড়িতেই থাকবেন কিন্তু ভট্‌চায, রাত-বেরাতে বের হবেন না।

কেশব—এর মানে কি ?

রতন চৌকীদার মাথা হেলিযে বেশ মোলাযেম করে বললো—মানে কিছু নয় ভট্‌চায মশাই। থানার হুকুম, বোর্ডের প্রেসিডেণ্টবাবুর হুকুম, আমরা শুধু হুকুমে খাটি ভট্‌চায মশাই। আমাদেব দোষ নিবেন না। দাগীর খাতায আপনার নামটা চড়েছে। তাই রাত-বেরাতে খবর করতে এলাম। আচ্ছা, আমি চলি এবার ভট্‌চায মশাই।

রতন চৌকীদার চলে গেল। সারদা নিজের ঘরে গিযে ঢুকলেন। শুধু একটা নির্বোধ অন্ধকার কেশবকে সাগ্রহে ঘিবে দাঁড়িযে রইল উঠোনের ওপর।

উঠোন ছেড়ে পুকুবেব ধারে কলাবাগানটার কাছে এসে দাঁড়ালো কেশব। তারপর আর একটু এগিযে গিযে ক্ষেতেব আলেব ওপর দাঁড়ালো। রাত্রিচর জানোযারের মত দু'তিন লাফে আল পার হযে পথের ওপর গিযে উঠলো। এক নিঃশ্বাসে যেন দীঘির ঘাটের কাছে পৌছে গেল কেশব। দীঘির ঘাট থেকে আমবাগান পর্যন্ত মেঠো পথটুকু দৌড়ের বেগে যেন নিঃশব্দে ফুরিযে গেল।

আমবাগান পাব হযে জেলা বোর্ডেব সড়ক। জেলা বোর্ডেব সড়ক ছেড়ে মাইল খানেক ডাঙ্গা ধরে দৌড়ে গিযে রেল লাইনের কাছে পৌছলো কেশব।

শিশিবে ভেজা ঠাণ্ডা লাইনের ওপর গলাটা রেখে একবার শুয়ে নিল কেশব। না, কোন অসুবিধা নেই। খুব আবামে শুযে থাকা যায, একেবারে ঘুমিয়ে পড়া যায।

লাইনের ওপর কান পেতে একবার শুনবার চেষ্টা করলো কেশব, আর কত দেরি? কোন নিকট মৃত্যুর হর্ষ এই লোহার লাইনে রিমঝিম করে বেজে উঠতে আর কতক্ষণ? এক্সপ্রেস গাড়ির সময় নিশ্চয় চলে যায়নি।

—কে ওখানে, সাবধান!

অন্ধকারের শান্তিকে কদর্য করে দিয়ে একটা কর্কশ গলার স্বর শোনা গেল। চারদিকে তাকিয়ে কাউকে দেখতে পাচ্ছিল না কেশব। একটা বেঁটে লাঠি হিংস্র শব্দ করে কেশবের সামনে লাইনের ওপর এসে ছিটকে পড়লো। একটুর জন্য কেশবের গায়ে লাগেনি।

একটু বিরক্ত ও অপ্রস্তুত হয়ে কেশব উত্তর দিল—আমি, মান্দার-গাঁয়ের···।

বলতে গিয়েও একটু ইতস্ততঃ করে থেমে গেল কেশব, লাইনের ওপর থেকে ধীরে ধীরে একটা মসীময় মূর্তি কেশবের দিকে এগিয়ে এল, গাঁজা-খাওয়া মোটা গলার স্বরে বললো—ঠাকুর এখানে কি করছেন?

ভজু বাউরীকে চিনতে পেরে আরও অপ্রস্তুত হয়ে গেল কেশব। সহসা কিছু বলবার মত কথা খুঁজে পেল না।

ভজু আরেকটু কাছে এগিয়ে এসে বললো—অ্যা, এ কি ঠাকুরমশাই, ভুঁয়ে বসে আছেন ক্যানে?

অলক্ষ্য ঝর্ণার শব্দের মত রেল লাইনটা কেঁপে কেঁপে বাজতে শুরু করে দিল। বহুদূরে গাছের মাথাগুলিকে ঝলসে দিয়ে একটা দৌড়ন্ত আলোকের ছটা এগিয়ে আসতে লাগলো।

—আমি বুঝেছি ঠাকুর, তোমার মাথা খারাপ হয়েছে।

বলতে বলতে এক লাফ দিয়ে উঠে ভজু তার সাঁড়াশির মত শীর্ণ দুটি

হাত দিয়ে কেশবকে কোলে তুলে নিল। এক দমে কতকটা পথ পার হয়ে গাছতলায় এসে কেশবকে নামিয়ে দিল ভজু।

দু'জনেই চুপ করে ছিল। এক্সপ্রেস ট্রেন শব্দের তুফান তুলে পার হয়ে গেল। ট্রেনের শব্দও দূর অন্ধকারে মৃদু হযে মিলিয়ে গেল।

কেশব যেন হঠাৎ একটা দুঃস্বপ্ন থেকে জেগে উঠে শুনতে পেল—ভজু বাউরীর জীর্ণ ফুসফুস ফাটা হাপরের মত হাঁপাচ্ছে।

দূরে ট্রেনের শব্দের মতই ভজু বাউরীর পরিশ্রান্ত নিঃশ্বাসের শব্দ ধীরে ধীরে হতাসের সঙ্গে মিশে একেবারে শান্ত হযে গেল। নিরেট শান্তির মত চারদিকের নিস্তব্ধতা। কেশবের শুধু মনে হচ্ছিল, হঠাৎ যেন তার ঘুম ভেঙে গেছে। দুঃস্বপ্নটা একেবাবে মিথ্যা। দুঃস্বপ্নের যন্ত্রণাটাও নিতান্ত অসার ও অবাস্তব। সাবা শবীরটা ঘামে ভিজে গিযেছিল কেশবেব। শেষ রাত্রিব অন্ধকাবটা কালো জলের মত ঠাণ্ডা, তারই মধ্যে যেন ডুব দিযে স্নান করছে কেশব। এই স্নানের পুলক, আস্বাদ ও পরিতৃপ্তি একেবারে নতুন রকমের।

প্রথম কথা বললো ভজু বাউবী।—মাথা খারাপ করবেন না ঠাকুর। এভাবে মরতে নাই। এত কথা ছেড়ে দিন, মববেন ক্যানে? কোন্ দুঃখে?

ঠিক কথা বলেছে ভজু। এই দুটো দিন যেন মনেব ভেতব একটা তুফান চলছিল। সেই দুঃস্বপ্নের অর্থহীন বেদনাগুলি ভীত পাখির ঝাঁকের মত পালিযে গেছে। সত্যিই তো কোন্ দুঃখে? মনের চারদিকে উঁকি দিযে কোন দুঃখ খুঁজে পায না কেশব।

ভজু বললো—ভগবান যতটা দিন না মারছেন, যতটা দিন কৃপা করে রাখছেন, ততটা দিন বাঁচতে হবেই মানুষের মত।

অন্ধকারের মধ্যেই ভজুর চেহারাটা একবার স্পষ্ট করে দেখবার চেষ্টা করলো কেশব। সত্যিই মানুষের মত দেখাচ্ছিল ভজুকে। সেই রোগা জিরজিরে চর্মাস্থিসার ভজুর মূর্তিটা একেবারে বদ্‌লে গেছে। অন্ধকার দিয়ে তৈরি মোটা মোটা হাত-পা ও কাঁধ-বুক নিয়ে একটি অপার্থিব মানুষ বসে আছে। ভজুও বাঁচতে জানে, বাঁচতে চায়। দিনের আলোতে শুধু ব্যর্থ হয়ে থাকে ভজু। দীন দরিদ্র নেশাখোর জীর্ণশীর্ণ ভজু তবু মরে না, মরতে চায় না। প্রতি রাত্রে মানুষ হয়ে ওঠে।

ভজু বললো—মরতে হয়, মেরে মরবো।

যেন একটা মন্ত্রোচ্চারণ করলো ভজু। নতুন রকমের একটা সত্যে ও পুণ্যে কথাগুলি যেন মাখামাখি হয়ে আছে। শুধু শুনতে একটু খারাপ লাগে, ভাষাটার মধ্যে একটা অপরিচিত বিভীষিকার ছোঁয়াচ রয়েছে। কিন্তু বুঝতে ও বিশ্বাস করতে বড় ভাল লাগে।

ট্যাঁক হাতড়ে কল্‌কেটা বের করে গাঁজা ধরালো ভজু। দম ভরে কয়েকটা টান দিয়ে চুপ করে অনেকক্ষণ বসে রইল।

একটা কৌতূহলের আবেগ অনেকক্ষণ ধরে সংযত করে রেখেছিল কেশব। আর্য পাঠশালার সুবিজ্ঞ মাষ্টার হয়েও এই বিচিত্র অন্ধকারের দেশে, রেল লাইনের ধারে গাছতলায় বসে, রাত্রিশেষের নিঃশব্দ শীতলতায় সে যেন আবার নতুন করে ছাত্র হয়ে গেছে। এখানে একমাত্র শ্রদ্ধেয় বিজ্ঞ ও গুরুত্বে গুরু হয়ে রয়েছে যে, সে তারই সামনে বসে রয়েছে—ভজু বাউরী।

কেশব বললো—একটা কথা জিজ্ঞেস করি, কিছু মনে করো না ভজু।

ভজু—বলুন আইজ্ঞা।

কেশব—এত রাত্রে তুমি কোথায় গিয়েছিলে?

ভজু—আপনি কি সত্যিই কিছু বুঝতে পারছেন না ঠাকুরমশাই? একথাও কি শুধাতে হয়।

কেশব—না সত্যিই আমি…।

ভজু—একটু কারবারের ফিকিরে বের হয়েছিলাম ঠাকুর।

কেশব—কিসের কারবার?

ভজু হেসে ফেললো—অর্ডার সাপ্লাই করি। আপনি তো ইংরেজী ভাল বোঝেন ঠাকুরমশাই, এইবার বুঝে নিন।

কেশব—সত্যিই আমি বুঝতে পারছি না ভজু।

ভজু—মাল যোগাড় করতে সুবিধা হয়, তাই রেতের বেলা বের হই। হেই দেখুন, কিছু মাল আজ পেয়েছি।

কোমরের সঙ্গে গামছা দিয়ে বাঁধা ছোট একটা পোঁটলা আস্তে আস্তে খুলে মাটির ওপর ছুড়ে ফেলে দিল ভজু। ঝনাৎ করে একটা শব্দ হলো, ছোট ছোট কয়েকটা কাঁসা-পেতলের বাসনপত্রের শব্দ।

রহস্যটা এতক্ষণে স্পষ্ট হয়ে উঠলো কেশবের কাছে। আরও নিঃসন্দেহ ও স্পষ্ট করে দিয়ে ভজু নিজেই বললো—রাত-বেরাতে দৌড়তে হয়, কুকুরে খেদা করে আসে, একটু বেসামাল হলেই প্রাণটা চলে যাবে। বড় মেহন্নত, ঠাকুর মশাই, বড় জঘন্য জীবন। চোরের চেয়ে কয়েদী ভাল।

কেশব—না ভজু, কয়েদীর চেয়ে চোর ভাল।

হো হো করে আন্তরিক উল্লাসে হেসে ফেললো ভজু।—তা'হলে তুমি আমাকে ভাল লোক মনে কর ঠাকুর মশাই?

কেশব—হ্যাঁ ভজু।

প্রত্যুত্তরে একটু বিমর্ষভাবেই ভজু বললো—ভদ্দরলোকের কথায় প্রত্যয় হয় না ঠাকুর! আজ এখনি এত ভাল কথা বলছেন, কাল সকালেই সবার সুমুখে ভজু শালার গলা টিপে ধরবেন, পুলিশ ডাকবেন···।

কেশব—না, আমি আর পুলিশ ডাকবো না ভজু।

পরমুহূর্তে ভজুর গলার স্বর একটা চাপা হিংসার উত্তেজনায় বিষিয়ে উঠলো—তার জন্য ভয় করি না ঠাকুর! আমিও পুলিশের কাছে বলতে পারি, আপনি আত্মহত্যা করতে এসেছিলেন লাইনের কাছে।

কেশব—তা যদি দরকার হয়, তুমি বলো।

আবার হঠাৎ একটা খুশির আশ্বাসে ভজুর গলার স্বর দ্রব হয়ে এল। —না আপনি আর তা করতে পারেন না ঠাকুর মশাই। সে খবর আমি জানি। রতন বলছিল···।

কেশব—কি!

ভজু—রতন দুঃখ করছিল, উয়ারা আপনার মত মানুষকেও দাগী করে দিলে।

কেশব—তার জন্যে আমার আর কোন দুঃখ নেই ভজু। ভালই হয়েছে।

ভজু—হ্যাঁ, ভালই হয়েছে। আপনি ঘাবড়াবেন না ঠাকুর। গাঁ ছেড়ে যাবেন না। এই গায়ের উপর বসে একে একে উদিকে ঘায়েল করুন, যেমন আগে করতেন। আপনি একদিন কি না করেছেন ঠাকুর, কি না করতে পারেন।

একটু চুপ করে থেকে ভজু গলার স্বর নামিযে অন্তরঙ্গভাবে জিজ্ঞেসা করলো—একটা কথা বল্‌তে পারেন ঠাকুর, আপনার বিঘ্নটি কে? তার নামটি কি বটে?

একটু ফাঁপরে পড়লো কেশব। কে তার বিঘ্ন? কার নাম করা যায়? কাব নাম কবা যায না? জেল থেকে বের হযে মান্দারগাঁয়ে পা দেওযার পর থেকে আজ পর্যন্ত কেউ তাকে হাসিমুখে অভ্যর্থনা করেনি। মা পর্যন্ত কেমন হযে গেছেন, তাঁর স্নেহের রূপ পালটে গেছে। সাবা মান্দার গাঁযের মধ্যে একটিমাত্র হাসিমুখেব অভ্যর্থনা অবধারিত ছিল, সেও নেই। সে থাকলেই বা কি হতো কে জানে! তার মুখের হাসিও বোধ হয নতুন নিযমেব গুণে পাল্‌টে গেছে।

কেশবের হঠাৎ মনে পড়ে যায, এই সেই ভজু, যে তাকে প্রথম দেখাব আনন্দেই পাযের ধূলো নিযে অভ্যর্থনা কবেছিল। পুবনো মান্দার গাঁযেব অবহেলিত হৃদযের ধর্মকে বুকের মধ্যে চোবাই মালেব মত যেন লুকিযে রেখেছে একমাত্র ভজু। পুরনো মান্দাব গাঁযের লেঠেল ভজু যেন সকলেব উপেক্ষায আব নতুনেব আঘাতে গেঁজেল হযে গিযেছে, তবু গাঁ ছাড়তে পারেনি, মরতেও চায না। দিনের আলোকে ভজু আব লাঠি চালাতে পারে না। রাত্রির অন্ধকাবে লাঠি ছুড়ে মাবে। ভজুব এ দশা কেন হলো? ভজুর বিঘ্নটি কে?

কেশব জিজ্ঞেসা কবলো—তুমিই আগে বল ভজু, তোমবে বিঘ্নটি কে?

—আর শুনেই বা কি করবেন ঠাকুর মশাই?

—না, আমি শুনবো, তুমি বল।

—ইউনিয়ন বোর্ডের প্রেসিডেণ্ট ভূদেব চাটুয্যে, উহারই অর্ডার সাপলাই করি।

ভজু হাসতে লাগলো। কেশব একটু বিস্মিত না হয়ে পারলো না।—কিছু বুঝলাম না ভজু।

—চাটুয্যের অর্ডার, সব মাল চাটুয্যের হাতে দিতে হয়।

—চাটুয্যে এই সব মাল নিয়ে কি করে?

—সদরে নিয়ে গিয়ে বিক্রী করে। পাঁচ টাকায় বেচে চার টাকা নিজের হিসেবে মেরে নেয়, আমি পাই এক টাকা। এত বড় ঠগ মালদার কখনও দেখি নাই ঠাকুর। বেশ্তে মানুষ গজমতি, তারও হৃদয় ছিল। যত মাল দিয়েছি, অর্ধেক বখ্‌রা দিয়েছে, কভু ঠকায় নাই। কিন্তু চাটুয্যের একেবারে হৃদয় নাই ঠাকুরমশাই। মরবার আগে একবার চাটুয্যাকে দেখে লিব। বিম্নটির শেষ দেখে যাব।

অন্ধকারের মধ্যে ভজু বাউরীর প্রতিজ্ঞাটা ভীষণ হয়ে শোনাচ্ছিল। এক ধীর স্থির ও শান্ত প্রতীক্ষায় অবিচল, এক পবিত্র প্রতিহিংসায় উদাত্ত প্রতিজ্ঞা। তার জীবনের বিঘ্নের স্বরূপকে চিনে ফেলেছে ভজু। তার অধঃপতিত জীবনের সমস্ত ক্ষতের বিষ আড়ালে আড়ালে জমিয়ে রাখছে, ঠিক সময় হলেই তার সদ্ব্যবহার করবে। সময় সম্বন্ধেও তার কোন সংশয় নেই, মরবার আগে। মেরে মরতে চায় ভজু, সমস্ত মনুষ্যত্বের ইতিহাস যেন ভজুর একটি কথায় প্রতিধ্বনিত হয়ে উঠছে।

ভজু ততক্ষণে শান্ত হয়ে মন খুলে গল্প করতে আরম্ভ করে দিয়েছে। শেষ রাত্রির অন্ধকার ফিকে হয়ে আসছিল। গাছের পাতার আড়ালে ঘুম-ভাঙা পাখীর ডানা ঝাড়ার শব্দ ছট্‌ফট্‌ করছিল। অন্ধকার রাত্রির সেই ভয়াবহ মানুষ ভজুর গলার স্বর যেন এক দুঃখীর কাহিনীর বেদনার মত অশ্রুপ্লুত হয়ে উঠছিল। কোন্ নিয়মে এত নির্মমভাবে

বদ্‌লে গিয়েছে মান্দারগাঁ, ভেবে ভেবে তার কোন কূলকিনারা পায়নি, ভজুর গল্পে সেই বিপর্যয়ের অভিনব রীতিনীতির কিছুটা আভাষ পাচ্ছিল কেশব। একদিন এস. ডি. ও. সাহেব গাঁয়ে এলেন, তারপর এলেন এক সার্কেল অফিসার। পাঁচটা গাঁয়ের মতাব্বর এক হয়ে বসলো। কি করতে হবে, কি না করতে হবে, যত সলাপরামর্শ দরকার, হেড মাস্টার দিনমণি বিশ্বাসই দিলেন। কী পণ্ডিত আর কত বুদ্ধি রাখেন বিশ্বাস মশাই! ইউনিয়ন বোর্ড গড়ে উঠলো, প্রেসিডেন্ট হলেন ভূদেব চাটুয্যে।

গল্পের মাঝখানে একটা দীর্ঘশ্বাস ছাড়লো ভজু।—আমি উহার পায়ে ধরেছি।

কেশব—কেন?

ভজু—চৌকিদারী চাকরিটার জন্য বড় সখ ছিল ঠাকুর। তা আমাকে দিবে কেন? রতনের কিছু পয়সা আছে, আমার মত গরীব তো নয়। রতন পঞ্চাশটি টাকা ঘুষ দিয়ে চাটুয্যার নজর কিনে নিলে।

একটু চুপ করে থেকে ভজু আবার অহংকারের সুরে জোরে জোরে বলতে লাগলো—তা সাত টাকা মাহিনার চাকরি নিযে রতন যদি রাজা হয়, হোক্। আমিও কি চুপ করে রযেছি? আমি কি ভিক্ষুক হয়েছি? আমিও মরদ বটি ঠাকুরমশাই, তিন সাত তুলে নিচ্ছি। ভজুর পথ বন্ধ করলে তোরা থাক্‌বি কোথায়?

না, ভজুকে পথ ছেড়ে দিতে হযেছে, নইলে ভজুর পুরুষকার মান্দার গাঁযের নতুন জীবনের আলোককে ছিন্ন-ভিন্ন করে দেবে। ততখানি শক্তি সে রাখে। মাঝে মাঝে নিজের মনের আবেগ ও চাঞ্চল্যের ভুলে এক বিরাট মানুষের ছায়ার মত ভজুর মূর্তিটা কেশবের

চোখে মোহ সৃষ্টি করে। কিন্তু বড় বিকৃত ও করুণ একটি ছায়া। পরক্ষণেই কথা বলে ভজু, এক পরাভবহীন প্রাণের বিচিত্র গর্ব ও দুঃসাহসের ভাষা। সেই প্রসন্নতাটুকু পাওয়ার লোভে কেশব শুধু উৎকর্ণ হয়ে শুনে যায়, দু'চোখ মেলে দেখতে চেষ্টা করে।

কিন্তু একটি দুঃখের কথা কি জানেন।...

ভজু আবার দুঃখ করে কথা বলতে আরম্ভ করলো। এ ধরণের কথা শুনতে ভাল লাগছিল না কেশবের। ভজুর জীবনদর্শনের সঙ্গে এ ধরণের কথা খাপ খায় না। দুঃখ, মৃত্যু, বেদনা ও অপমানকে অগ্রাহ্য করার যে ধর্ম, তারই কঠিন দীক্ষায় দুর্মর হয়ে আছে ভজু। ভজু বিচলিত হলে কেশবের নতুন উপলব্ধির আনন্দটুকু যেন মিথ্যে হয়ে যাবে।

ভজু বললো—দুঃখের কথা হলো, আমি রাত-বেরাতে খেটে মরি, মাল যোগাড় করি, কিন্তু রতন ও চাটুয্যা লাভ মারে। চাটুয্যার অর্ডারের শেষ নাই ঠাকুর। এত লিযেও উহার পেট ভরে না। রোজই বলবে—আরও লিযে আয, আরও লিযে আয।

কেশব—কিন্তু কি উপায হতে পারে ভজু? কিছু বলতে পার?

ভজু কিছুক্ষণ কি ভাব্‌লো। তারপর একটু আগ্রহ করে বললো—আপনার বিঘ্নটি কি, বললেন না তো ঠাকুর?

কেশব—কার নাম করি বল?

ভজু—কার নামটা আগে মনে লিচ্ছে?

কেশব—খৃষ্টান হেড মাস্টারটা ভযানক প্রকৃতির লোক।

ভজু—যদি বলেন তো একটা লোটিস দিযে দিই।

কেশব—কি করে?

ভজু—রবিবারে সদরে যায গির্জে করতে। রেতের বেলায় গাঁযে

ফিরে আসে। বলেন তো, আমবাগানের পথেই দু'এক লাঠি জমিয়ে দিই। যদি বুদ্ধি থাকে তো ভেগে পড়বে।

কেশব—অজয় আজকাল কি করছে জান?

ভজু—অজয়বাবুর উপর কি আপনার কোনরকম সন্দেহ হয়েছে?

কেশব—হ্যাঁ।

ভজু—কেন, জানতে পারি ঠাকুরমশাই।

কেশব—কেন, তা আমিও ঠিক বুঝতে পারি না ভজু।

ভজু—অজয়ের খুড়া অক্ষয়বাবুকে চিনেন? পুকুরের হিস্যা নিয়ে ফৌজদারী লাগবে শীগগির খুড়া-ভাইপোর মধ্যে। অক্ষয়বাবুর পক্ষ নিন, টাকা দিবে ভালো। একটা ভাল মত মামলা বাধায়ে দিন, অজয়ের সংসারে বিড়াল কাঁদবে তারপর। দেখে লিবেন।

কেশব—এই ইউনিয়ন বোর্ড অফিসটাই একটা পাপীর ষড়যন্ত্র।

ভজু—ঠিক বলেছেন ঠাকুর, আগুন লাগায়ে দিন, চাটুয্যার খবর লিব পরে।

কেশব—রতন চৌকীদারকে আমি সহ্য করতে পারব না ভজু। রোজ রাত্রে ঘরের দুয়ারে উঠে হাঁক দিয়ে খোঁজ নেবে, ঐ প্রেতের গলার স্বর আর খবরদারী আমি সহ্য করতে পারবো না।

ভজু হেসে ফেললে—আপনি একেবারে ছেলেমানুষ রয়ে গেছেন ঠাকুরমশাই। পেঁচামুখো রত্নাকে এত ভয়! কিচ্ছু ভাববেন নাই। রতনের হাতে পাঁচটা টাকা ধরায়ে দিবেন বাস্, রতনা বোবা হয়ে থাকবে। তারপর।...

হাঁ, তারপর নিশাচর প্রতিহিংসার মত মান্দার গাঁয়ের আরামের ঘুমে আগুন লাগিয়ে দিতে আর কোন বাধা নেই।

বোধ হয় আরও কিছুক্ষণ বসে থাকতো কেশব। বসে বসে নিজেরই মনের আনন্দের স্পন্দনগুলি কান পেতে শুনতো। কিন্তু প্রায় ভোর হয়ে আসছিল। রেল লাইন ধরে একদল দূর-গাঁয়ের চাষী সার বেঁধে স্টেশনের দিকে যাচ্ছিল, বড় বড় সজীর বোঝা ঝুলছিল কাঁধের বাঁকে। তাদের পরিশ্রান্ত ফুসফুসের নিঃশ্বাস পথচলার আবেগে যেন মরিয়া হয়ে অন্ধকারের বাধা ভেদ করে চলেছিল। অপার্থিব আক্রোশের মত শব্দটা ভয়াবহ হয়ে শোনাচ্ছিল মাঝে মাঝে। ব্যস্ত হয়ে উঠে দাঁড়ালো কেশব।

ভজু বললো—না ঠাকুর, এইবার উঠা যাক্, রাত ফুরিয়ে গেছে, লোকজন ছুটছে।

কেমন যেন আপশোষ করে কথাগুলি বললো ভজু। শব্দহীন অন্ধ রাত্রিটার সঙ্গে যেন এতক্ষণ অন্তরঙ্গ হয়েছিল ভজু। আবার আলো ফুটে উঠছে, জাগরণের হর্ষ শোনা যাচ্ছে, আবার একটা চক্ষুলজ্জার দিন দেখা দিচ্ছে। দিবালোকের নিয়মে আবার ভজুর নিশাচার পৌরুষের সত্তা ভীরু শামুকের মত কঠিন খোলসের আড়ালে মুখ লুকিয়ে ফেলবে, লোকের দ্বারে দ্বারে ধর্ণা দিয়ে ঘুরে বেড়াবে, মাটি কাটবে, কাঠ কাটবে। হাত পেতে মজুরী চাইবে, মজুরীর মূল্যের চেহারা দেখে গা ঘিন-ঘিন করবে—চার পয়সা, ছ'পয়সা। লক্ষ্মীছাড়া পরিশ্রমের স্বরূপ দেখে মনটা বিষিয়ে ওঠে। তা'ও আবার ভিক্ষের মত করে হাত পেতে চাইতে হয়, দয়ামায়ার দোহাই দিতে হয়। জীবনের প্রাপ্যকে শক্ত মুঠোয় কেড়ে নিতে পারে না ভজু, দিনের আলোকের নিয়ম এসে বাধা দেয়। অপরাধীর মত, অনধিকারীর মত কোঁদল করে, তোষামোদ করে, ঘ্যানঘ্যান করে ব'কে ব'কে দাতার গর্বকে বিগলিত করে, হাত পেতে কৃপণ দাক্ষিণ্য

তুলে নিতে হবে, দিনের জীবনে এই পর্যন্ত তার অধিকার। এই খর্ব মনুষ্যত্বের গ্লানিকে সারাদিন ধরে ঘাড়ের বোঝার মত মাথা হেঁট করে বহন করে বেড়াতে হবে। চার পয়সার মজুরীতে পেট-ভরা ভাত হয় না, দুটো কড়াটানের দমের মত গাঁজাও হয় না। দিবালোকের আবির্ভাবে ভজু বিমর্ষ হযে পড়বে, আশ্চর্য হবার কিছু নেই।

কেশব ও ভজু দু'জনেই ব্যস্তভাবে গাঁয়ের দিকে হেঁটে চলেছিল। অকেজো জীবনে এক নতুন কাজের পথের দিশা পেয়ে গেছে কেশব। তার অন্ধকারের অভিসার সার্থক হয়েছে। মান্দার গাঁয়ের যত নতুন পাপের উপদ্রব একে একে পুড়ে ছাই হযে যাবে। অশান্তি, আতঙ্ক ও নিজের ভীরুতায মান্দার গাঁযের কৃতঘ্ন হৃদযে অনুতাপের জ্বালা লাগবে। ভুল বুঝবে, পথ খুঁজবে মান্দার গাঁ। কেশব ভট্চাযের কথা আবার নতুন করে মনে পড়বে। কল্পনায় মান্দার গাঁযের সেই আসন্ন কালাশৌচের করুণ রূপ কেশবের চোখে এক সফল স্বপ্নের তৃপ্তি এনে দিচ্ছিলো।

তখনো পূবের আকাশ একেবারে ফর্সা হযে ওঠেনি। ভজুর মনটাও হঠাৎ বোধ হয কল্পনায় আর একটু দূরের ভবিষ্যতে পৌছে গিযে, আরও সুখী সুস্থ ও সার্থক মান্দার গাঁযের ছবিটা মুগ্ধভাবে দেখছিল। হঠাৎ উৎফুল্লভাবে ভজু বললো—তারপর কি হবে, সেটাও জেনে রাখুন ঠাকুর-মশাই। আপনি হবেন বোর্ডের প্রেসিডেণ্ট, আর আমি হব···।

বক্তব্য শেষ না করেই ভজু হেসে ফেললো। কেশবও হাসছিল। কেশবের কোন প্রশ্ন বা প্রত্যুত্তরের অপেক্ষা না করেই ভজু তার মনের সহজ আবেগে বলে ফেললো—চৌকিদারী চাকরিটার জন্য হৃদযে বড় একটা সাধ ছিল, সেকথা তো আপনি জানেনই ঠাকুরমশাই।

ভজুর সহজ ও সরল ছোট কথাগুলির মধ্যে যেন একটা বন্যার আবেগের সুর ছিল। সকল ধাঁধা দ্বিধা ও হতাশার বাধা তুচ্ছ হয়ে যাচ্ছে। কতভাবে পথ দেখাচ্ছে ভজু, কতভাবে তার জীবনের লক্ষ্যের সন্ধান পাচ্ছে কেশব। তার হৃত-সিংহাসন আবার অধিকার করে নিতে হবে। ভজুর স্বপ্ন আর কেশব ভট্চাযের স্বপ্ন যেন এক সংগ্রামের প্রেরণায় এক হয়ে মিশে রয়েছে। দুঃস্বপ্নের রূপে দু'জনে মিলে মান্দার গাঁয়ের নতুন ঘুমের শিবিরে হানা দেবে। একের পর এক আক্রমণ চলতেই থাকবে, যতদিন না জয়পরাজয়ের মীমাংসা হয়ে যায়। কেশব ভট্চাযের সম্মুখে এই একমাত্র কাজের পথ।

কেশব বললো—তাই হবে ভজু ; আর চুপ করে বসে থাকলে চলবে না।

দীঘির ঘাটের কাছাকাছি পৌছে ভজু বললো—এইবার একটু ছাড়াছাড়ি হতে হয় ঠাকুর।

ছাড়াছাড়ি হতে ইচ্ছে হচ্ছিল না কেশবের। একটা অসহায়তার ভয় মনের মধ্যে হঠাৎ শিহর দিয়ে উঠলো। ভজু বললো—কোন চিন্তা করবেন না ঠাকুর, সন্ধ্যে লাগুক, আবার দেখা দিব। রতন চৌকিদারকে পাঠিয়ে দিচ্ছি, ওকে একটু খুশি করে দিবেন। তারপর···।

ভজু একটু থেমে নিয়ে চাপা গলার স্বরটা পরিষ্কার করে নিল। কঠিন আশ্বাসে শাণিত ভজুর শেষ কথাগুলি আবার যেন ঝিলিক দিয়ে কেশবের ক্ষণিক বিমর্ষতা মিথ্যে করে দিল—তারপর আর কোন ভয় নাই ঠাকুর।

বিকেল থাকতেই রতন চৌকিদার একবার এসেছিল। মাত্র পাঁচ টাকাতেই খুশি হয়ে চলে গেল রতন। যাবার সময় বলে গেল—এইরকম মাঝে মাঝে গরীবের দিকে একটুকু নজর রাখবেন ঠাকুরমশাই। বাস্,

তা'হলেই হলো। আপনি আগে যেমন রাজাটি হয়েছিলেন, তেমন রাজাটি হয়ে থাকবেন।

কেশবও খুশি হয়েছিল। মাত্র পাঁচটি টাকা তার মুক্তিপণ। একে ঘুষ বলা চলে না। ঘুষ বললেই বা কি আসে যায়? নতুন মান্দার গাঁয়ের সকল গর্বের সিংহদ্বারে যে প্রহরী দাঁড়িয়ে আছে, সে যদি পাঁচ টাকার বিনিময়ে পথ ছেড়ে দেয়, সে-সুযোগ ছেড়ে দেবে কোন্ মূর্খ? ভেবে আশ্চর্য হচ্ছিল, মনে মনে হেসে উঠছিল কেশব। এত হাঁক-ডাক, ভোট-ভাট, থানা-কাছারী নিয়ে, এই নাকি ইউনিয়নের নতুন শাসন! পাঁচ বছর ধরে কি নিষ্ফল চেষ্টা! বালুর দুর্গের মত কত নতুন উপাচার, কত নতুন বাড়ি, বাগান, বাঁধ, পথঘাট, ট্যাক্স, কাছারী, গাঁজা-আফিম আর ইংরেজী ইস্কুল নিয়ে ফেঁপে উঠেছে মান্দার গাঁ। কিন্তু কী দুর্বল, কী শিথিল সজ্জা, আর কী ভীরু এই নতুনত্ব! অন্ধকারে গা-ঢাকা দিয়ে একটা ঢিল ছুঁড়ে মারলে এই দুর্গ ভেঙ্গে চুরমার হয়ে যাবে। পাঁচ টাকার ঘুষ, সত্যি তার মুক্তিপণ। মাত্র পাঁচ টাকার যাদুবলে, রতন চৌকিদারের ভরসার আশ্রয়ে সে আজ সব বিধি-বিধানের চক্র ব্যর্থ করে দিতে পারে। থানা আর দায়রা আদালতের ভ্রূকুটিকে কত সহজে হেসে তুচ্ছ করে, বাতিল করে দেওয়া যায়।

সন্ধ্যে হতেই ভজু এসে ডাকলো—চলুন ঠাকুর।

সারদা একবার ঘরের ভিতর থেকেই মৃদু ভয়ার্ত স্বরে ডাক দিলেন—কোথায় চললি খোকা?

মায়ের কথার উত্তর দেবার অবসর ছিল না কেশবের। উত্তর দেবার কথা মনেও পড়লো না। কাল রাত্রিশেষের অন্ধকারে ভজুর কাছে কাজের পথের কথা শুনেছিল কেশব। আজকের সন্ধ্যার নতুন অন্ধকার ঘনিয়ে

উঠতেই আবার স্বয়ং সশরীরে কাজের আহ্বান নিয়ে পৌঁছে গেছে ভজু। এখুনি কাজের পথে নেমে পড়তে হবে, আর ভাবনার অবকাশ নেই। এক দুর্নিবার আকর্ষণের মোহ ছিল ভজুর আহ্বানে। কোথায় যেতে হবে, কেন যেতে হবে, কোন প্রশ্নের দ্বিধা জাগে না কেশবের মনে। কেশব শুধু জানে সারা মান্দার গাঁয়ের মধ্যে একমাত্র সুহৃদ ভজু তার ভবিতব্য রচনার দায় নিজের কাঁধে তুলে নিয়েছে। পথ বলে দেবে, পথ দেখিয়ে দেবে ভজু। গুরু হয়ে এগিয়ে থাকবে ভজু, সাথী হয়ে গায়ে গায়ে থাকবে ভজু। কেশব শুধু তার চিরকেলে দুঃসাহসের তূণীর নিয়ে ভজুর পাশে পাশে থাকবে।

আম বাগানের কাছে পৌঁছতেই সন্ধ্যে ঘোরাল হয়ে উঠলো। আম বাগানের মাথায় শুধু জোনাকির দল ঝিকমিক করে, নীচে নিশ্চল অন্ধকার। তারই ভেতর সংকীর্ণ আঁকাবাঁকা পথটা গুপ্ত নাড়ীর মত অদৃশ্য হয়ে রয়েছে।

পথের মুখে এসে কেশব আর ভজু থামল। ভজু বললো—আজ রবিবার, সদরে গীর্জে করতে গিয়েছে দিনমণি বিশ্বেস। এক্ষুণি ফিরবে এই পথে। আজ উহাকে মরণ লোটাশ দিব ঠাকুরমশাই।

কিছুক্ষণের জন্য যেন বধির হয়ে দাঁড়িয়ে রইল কেশব। আম বাগানের ঝিঁঝির রব কানে শুনতে পাচ্ছিল না। সব সাড়াশব্দ মুছে গিয়ে শুধু তার নিজেরই হৃদ্‌পিণ্ডের ধুকধুক শব্দটুকু পৃথিবীময় ছড়িয়ে পড়ছিল।

—আর একটু এগিয়ে দাঁড়াই ঠাকুরমশাই।

ভজুর নির্দেশমত দু'পা এগিয়ে গিয়ে বাগানের ভেতর একটা বুড়ো বটের জটার ভিড়ে দু'জনে গিয়ে দাঁড়ালো। হাল্‌কা হাওয়ায় শুকনো পাতা-কুটো মাঝে মাঝে থর্‌থর্ শব্দ করছিল, ছোট ছোট প্রতিহিংসা যেন বুকে

হেঁটে বেড়াচ্ছে। একটানা ঝিঁঝির ডাকে ধীরে ধীরে দুটি ম ষের মূর্তি- যেন বটের ঝুরির সঙ্গে অশরীরী ছায়ার মত মিশে যাচ্ছিল।

—না, এখানে সুবিধা হবে না ঠাকুরমশাই। জায়গাটা ঠিক নয়। এখানে মারটা অবশ্য জমবে ভাল, কিন্তু ভেগে পড়তে হলে…।

আবার দু'জনে পথের ওপর এসে দাঁড়ায়। ভজু যেন মনের আনন্দে এক নাটমঞ্চের আসর সাজিয়ে চলেছে। এক শুদ্ধাদর্শীর নিষ্ঠায় ভজুর প্রতিটি পদক্ষেপ নির্ভুল সংযত ও দৃঢ়।

আম বাগানের সরুপথে অন্ধকারের সব কেউটে পথ ছেড়ে সরে গেছে। সকল হিংসার প্রতিনিধিরূপে ভজু আর কেশবের ছায়াময় মূর্তি দুটি আজ পথ আগলাবার দায়িত্ব নিয়েছে। পথ ধরে আম বাগান পার হয়ে জেলা বোর্ডের সড়কের কাছে পৌঁছল দু'জনে। এখানে দাঁড়িয়ে খোলা মাঠের তিনদিকের অন্ধকার পাহারা দেওয়া যায়।

ভজু বললো—আপনি কি লিবেন বলুন ঠাকুরমশাই, লাঠি না ডাণ্ডি ?

উত্তর দিতে গিয়ে কেশবের গলার স্বর কেঁপে উঠলো—আমায় ভাবতে একটু সময় দাও ভজু।

ভজু আশ্চর্য হয়ে গেল—আপনি এখন ভাবতে বসেছেন ঠাকুরমশাই ?

কেশব—আমি একটুখানি ভেবে দেখছি ভজু কাজটা কি ভাল হচ্ছে ?

ভজু কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে প্রশ্ন করলো—একটা কথা শুধাই আপনাকে ঠাকুর, দিনমণি বিশ্বেস কার বিঘ্ন বটে ? আমার না আপনার ?

কেশব—তুমি রাগ করো না ভজু, লোকটা আমারই বিঘ্ন।

ভজু—তবে ?

কেশবের ভীরু বিবেকের সকল ভ্রান্তিকে ধিক্কার দিয়ে ভজুর গলার স্বর অন্ধকারে একটা ভয়াবহ প্রতিধ্বনি সৃষ্টি করলো। অদ্ভুত এই ভজু, অদ্ভুত

এর দীক্ষার কৌশল, বিচিত্র সৌহার্দ্যে প্রেমে ও আত্মত্যাগে প্রচণ্ড এর সাথীত্ব। নিজের বিয়ের কথা মুলতবী করে রেখেছে ভজু। সবার আগে সে তার ঠাকুরমশায়ের মুক্তিপথের কাঁটা তুলতে টাঙি হাতে এগিয়ে এসেছে। ছোট আসনে বসেও গুরুর মত শ্রদ্ধেয় হয়ে ওঠে, কি-এক অপূর্ব কৌশল জানে ভজু। কেশবের ভাবনার দ্বিধা তখুনি নিঃশেষে মিলিয়ে গেল। কেশব বললো—তবে আর কিছু 'আমার ভাবনার নেই ভজু। দাও।

অন্ধকারে হাত পেতে ভজুর কাছ থেকে লাঠিটা তুলে নিল কেশব।

ভজু একটু ব্যস্তভাবে বললো—ঐ যে আসছে উহারা। একা নয় মনে হচ্ছে। একটু ফুর্তির সঙ্গে কাজ লিবেন ঠাকুরমশাই। আসুন আর একটুকু সরে দাঁড়াই ঠাকুর।

অনেক দূরে জেলা বোর্ডেব সড়ক ধরে একটা মৃদু লণ্ঠনের আলোর সঙ্গে দু'তিনটি পথচারী মূর্তি ধীরে ধীরে আম বাগানের দিকে এগিযে আসছিল।

দূর লণ্ঠনের আলো সেই অন্ধকারের মধ্যে এক বিচিত্র আলেয়ার রূপে ধীরে ধীরে এগিযে আসছিল। প্রতি মুহূর্তে এগিযে আসছে। ধূলো আর আলোর গলিত বাষ্প দিযে তৈরি ছোট একটি ভূচর নীহারিকার মত তারা এগিযে আসছে—একজন দু'জন তিনজন। সব সুদ্ধ তারা তিনজন। তিনটি কালো কালো কঙ্কালের মত তাদের মূর্তি সেই আলেয়ার কাযা ভেদ করে যেন ফুটে রয়েছে, নড়ছে কাঁপছে।

ভজু আবার বললো—একটু ফুর্তির সঙ্গে কাজ লিবেন ঠাকুরমশাই। আমি আগে লণ্ঠনটাকে চুরি করে দিব। দিবা মাত্র আপনি একটি তামেচা জমায়ে দিবেন, ঠিক কানপাটির উপরটাতে। ভাল মত বুঝে লিবেন ঠাকুর, লণ্ঠনটা চুর করবার আগেই তাক্ ঠিক করে লিবেন।

একটু চুপ করে থেকে ভজু জোরে একটা নিঃশ্বাস টেনে যেন তার নির্মম ফুসফুসটাতে বাতাস ভরে নিল।

কেশব বললো—তুমি টাঙিটা আজকের মত রেখে দাও ভজু। টাঙি চালাবার মত কাজ এখনো আসেনি।

ভজু হেসে ফেললো—কিন্তু উহাদের হাতে যদি টাঙি থাকে? তখন? তখন কি করবেন ঠাকুরমশাই, ঘাড়টা পেতে দিবেন কি?

কেশব—না ভজু। হঠাৎ শঙ্কিত হয়ে কথাটা বলে ফেলেই, পরক্ষণে নিজের অজ্ঞতার লজ্জাতেই যেন একেবারে চুপ করে গেল কেশব।

ভজু বললো—যদি উহারা আপনাকেই ঘায়েল করতে উঠে, তবে উপায় কি হবে? তাই আমি টাঙি নিয়েছি ঠাকুরমশাই, আপনাকে বাঁচাবার লেগেই টাঙি চালাতে হবে।

কেশবের প্রতিটি দুর্বলতা, সংশয় ও শঙ্কা ভজুর কথায় যেন ভুয়ো হয়ে উড়ে যাচ্ছিল। ভজুর ঐ টাঙির হিংস্রতাই আজ কেশবের জীবনের বুকে-পিঠে এক অপূর্ব সৌহার্দ্যের কবচের মত গাঁথা হয়ে আছে। কিছুই ভাববার, কিছুই ভয় করবার নেই কেশবের। ভজু রয়েছে—সুশাণিত ও সুকঠিন ভজু। দোসর হবার যাদু জানে ভজু। এমন করে কেউ কোন বন্ধুকে বাঁচায় না। রেল লাইন থেকে তুলে নিয়ে ভজুই তাকে বাঁচিয়েছে। সেই সঙ্গে ভজু যেন তাকে সব দিকে বাঁচাবার অধিকার অর্জন করে ফেলেছে। ভজু যে ভাবে তাকে বাঁচাতে চায়, সেই ভাবেই তাকে বাঁচতে হবে।

আর্য পাঠশালার জন্য যে দুঃখ, দিনমণি বিশ্বাসের ওপর যে প্রতিহিংসা, ইংরেজী ইস্কুলের ওপর যে আক্রোশ, অন্ততঃ এই মুহূর্তে মনের ভেতর তার কোন চিহ্ন খুঁজে পাচ্ছিল না কেশব। সেগুলি যেন নিষ্পত্তি হয়েই

গেছে অনেককাল আগে। আম বাগানের পথের পাশে কাঁচামাটির কবরের ওপর একটি কাঠের ক্রসচিহ্ন দাঁড়িয়ে আছে, নিশ্চিহ্ন দিনমণি বিশ্বাসের সকল অহংকারের পরিণাম যেন কেশবের চোখের সামনে ভাসতে থাকে। আর্য পাঠশালার টিনের চালাটা অটুট হয়ে দাঁড়িয়ে আছে, দেখতে পায় কেশব। ইংরেজী ইস্কুলের টেবিল বেঞ্চ পুড়ে ছাই হয়ে গেছে, সেই ছাইয়ের গাদাও ঝড়ের বাতাসে নিশ্চিহ্ন হয়ে আসছে, সব সমস্যার সমাধান হয়ে গেছে। এখন শুধু সবার প্রথম, সব চেয়ে বড় কর্তব্য বাকি রয়ে গেছে—ভজুর নির্দেশ। কোন কিছু ভয় করবার, দ্বিধা করবার ও ভাবনা করবার যেন অধিকারও নেই কেশবের।

দুটি ভাল শিকারীর মত পাশাপাশি বসেছিল দু'জনে—ভজু আর কেশব। লণ্ঠনটা এগিয়ে আসছে, একটা আলোর ছলনা যেন তিনটি ভীরু হরিণের মূর্তিকে টেনে নিয়ে আসছে।

ভজু বললো—মার হযে গেলেই কিন্তু ভেগে পড়বেন ঠাকুরমশাই।

আলেয়া অনেক নিকট হয়ে এসেছে! মূর্তিগুলির শুধু পা গুণতে পারা যায়। মুখ দেখা যায় না।

ভজু বললো—বুঝে লিন ঠাকুরমশাই, ঐ আগেরটিই দিনমণি বিশ্বাস বটে, পিছনে যেটিকে দেখছেন, উহার কাঁধে উটা কি? জোড়া টাঙি রয়েছে ঠাকুর। আর উহারও পিছনে যেটি, উহার মাথায়……।

হঠাৎ চুপ করে গেল ভজু। গলাটা টান করে ভজু যেন দু'চোখের তীব্র দৃষ্টির কৌতূহল নিয়ে শিকারের স্বরূপ চিনছিল।

—কিরকম তো মনে লিচ্ছে ঠাকুর! কে ইহারা? উঠে দাঁড়ান ঠাকুরমশাই।

একটু সন্ত্রস্তের মত কথাগুলি বললো ভজু। একহাত দিয়ে কেশবের লাঠিটাকে শক্ত করে চেপে ধরলো।

—আর একটু পেছু সরে দাঁড়াতে হয় ঠাকুর। কে ইহারা?

আরও বেশি শঙ্কিত হয়ে ভজু কথাগুলি বলতে বলতে কেশবের হাত ধরে টান দিল। চিতে বাঘের মত নিঃশব্দে তিন লাফে পেছনে সরে গেল দু'জনে।

লণ্ঠনের আলোক আর পথিকদের মূর্তিগুলি একেবারে নিকটে এসে পড়েছে। সেই আলেয়ার মত মৃদু মন্থরতা আর নেই, দ্রুত তালে আপন মনের উল্লাসে আম বাগানের দিকে এগিয়ে চলেছে। তাদের পায়ের শব্দ, গলার স্বর আর চকিত হাসির টুকরো ছড়িয়ে পড়ে চারদিকে।

—কিছুই বুঝতে পারছি না ঠাকুর। কে ইহারা? যদি সার্কেল বাবু হয়, তাহ'লে···।

কেশব—তাহ'লে কি?

ভজু—তাহ'লে বন্দুক আছে সঙ্গে, তাহ'লে পিয়াদা বেটারাও আছে, বুঝতে হবে।

ভজুর কথায় বাধ্য শিষ্যের মত শান্ত ও সংযত হওয়া দূরে থাক, কেমন যেন ছটফট করে উঠলো কেশব। ভজু বললো—এখানে আর দাঁড়াবো না ঠাকুর, চলুন বাগানে ঢুকে পড়ি। একটু আড়ালে গিয়ে দেখতে হবে, কে ইহারা।

কেশব যেন ভজুর কথাগুলি শুনতে পায়নি। মিছেমিছি উদ্‌ভ্রান্তের মত পায়চারি করছিল কেশব, শব্দ হচ্ছিল। ভজুর পৃথিবীর সকল নিয়মতন্ত্র যেন ভুলে যাচ্ছিল, ভুল করছিল কেশব। হঠাৎ বেশ জোরে

বিকৃত গ ার স্বরে ভজুকে সচকিত করে কেশব বললো—টাঙিটা আমার েতে দাও ভজু।

ভজু —আপনি এরকম করছেন ক্যানে ঠাকুর? কি হলো?

কেশব—যদি সার্কেল বাবু হয়, তবে···।

—ত ব কি? ধমকের সুরে কর্কশ করে উত্তর দিল ভজু।

কেশব নিশ্চয় অকৃতজ্ঞের মত দু'দিনের সৌহার্দ্যের সব ইতিহাস ভুলে ি ছিল। নইলে কখনো বলতে পারতো না—তুমি বন্দুক দেখে ভ পেয়েছ ভজু। টাঙিটা আমাকে দাও।

বি ও বিমর্ষভাবে ভজু বললো—কিন্তু, কি করবেন ঠাকুরমশাই?

পাঁ ছর আগেকার অহংকার যেন নতুন করে ফিরে পেয়েছে কেশব।- ার্কেল অফিসারটাকে আজ ছাড়বো না কিছুতেই ভজু।

টাঙি কেশবের হাতে সঁপে দিয়ে, ভজু তার ভীরুতাকে স্বীকার করে ি —হাঁ, আমি বন্দুককে সত্যিই বড় ডরাই ঠাকুরমশাই। এই নিন ইচ্ছে করুন। আমি এইখানে রইলাম। আপনি কাজ সেরে ফি আসুন।

টাঙি প্রথমে শক্ত মুঠোয় চেপে ধরলেও ধীরে ধীরে কেশবের শক্ত মুঠির দ শিথিল হয়ে আসছিল। টাঙিটা একবার হাত থেকে ফসকে মাটির ও পড়ে গেল।

ভজু লো—যান ঠাকুর, কাজ সেরে আসুন। আমি আছি এইখানে

কেশ সকল উত্তেজনার উচ্ছ্বাস যেন হঠাৎ অনড় শিলার মত কঠিন হ গেল। কেশব মর্মে মর্মে বুঝতে পারে, এক পা অগ্রসর হবার সা াই তার, যদি এই গাঁজাখোর দাগী-চোর ভজু নামে দীন-

হীন মানুষটি তার পাশে সহায় হয়ে না থাকে। ভজু পাশে থাকলেই এই অন্ধকারের শোণিতাক্ত উৎসব সার্থক হতে পারে।

অনেকক্ষণ নিরুত্তর হযে দাঁড়িযেছিল কেশব। ভজুও চুপ করে মাটির ওপর বসেছিল। দুটি আলোকের শত্রু যে হতাশ হযে ঝিমিযে পড়েছে, সেই সুযোগে লণ্ঠনের আলেযা আম বাগানের সরুপথের দিকে ব্যস্তভাবে সরে পড়ছিল।

কেশব বললো—আমি পারবো না ভজু।

ভজু—না,' আপনি কিছুই পারবেন না ঠাকুরমশাই। আপনি ভদ্রলোক।

অনুশোচনায পীড়িত হযে কেশব যেন মার্জনা চাইল—তুমি কিছু মনে করো না ভজু, আমি ভেবেছিলাম সার্কেল অফিসারটাকে আগে সরিয়ে দিতে পারলে আমাদেরই কাজের সুবিধা হবে।

ভজু—সেই জন্যেই তো বলছি ঠাকুর, আপনি নেহাৎ ভদ্রলোক। আগেভাগেই বড় কাজে হাত দিতে চান।

কেশব—তোমার কথা আমি সব সময বুঝতে পারি না ভজু।

ভজু—সামান্য কথাটা বুঝতে পারেন না ক্যানে ঠাকুরমশাই? সার্কেল বাবুকে সরাতে কি টাঙির দরকার হয?

কেশব— তবে কি করে সরাবে?

ভজু—আপনি সেই আগের মত ছেলেমানুষ রযে গেছেন। সরকারী লোকের গাযে হাত দিতে নাই। এই কাণ্ড করেই তো মিছামিছি জেল ভুগলেন ঠাকুর, এত পণ্ডিত হয়েও জেল ভুগলেন।

কেশব—তাহ'লে কি করবো বল? তুমি যে সব গোলমাল করে দিচ্ছ ভজু, স্পষ্ট করে কিছু বলতে পারছো না।

ভজু—রতন চৌকিদারকে পাঁচঠা টাকা দিয়েছেন, পথ থেকে সরে গেছে রতন। সরকারী মানুষকে এইভাবেই সরাতে হয়, সার্কেল বাবুকে সরাবেন তো ত্রিশটি টাকা খরচ করুন, একটা গাই কিনে দিন। সরকারী লোককে দুধ খাইয়ে সরাতে হয় ঠাকুর, এত পণ্ডিত হয়েও কথাটা বুঝেন না ক্যানে। টাঙি দিয়ে মারলে সরকারী লোক মরে না, উল্টা পাঁচ বছর আপনি বাঁধা পড়বেন।

বেশ পরিষ্কার ভাবেই বুঝতে পারছিল কেশব। ভজুর রাজনীতিতে কোন হেঁয়ালি নেই। শক্ত শত্রুর হিংসাকে কি ভাবে তুক্ করে দূরে সরিয়ে রাখতে হয়, একের পর এক বিঘ্নকে কি ভাবে বেছে বেছে উৎখাত করতে হয়—সারা জীবন দিযে যেন সাধনা করে এই জ্ঞানের সিদ্ধি লাভ করেছে ভজু।

ভজুর হাত ধরে বোধ হয সত্যিই স্পষ্ট ভাষায মাফ চেয়ে ফেলতো কেশব, কিন্তু সেই অজ্ঞাতকুলশীল আলেযার মূর্তি দুই শিকারীর পাহারা এড়িযে ততক্ষণে আম বাগানের ভেতর ঢুকে পড়েছে। কেশব চেঁচিয়ে উঠলো—আর বেশি সময় নেই ভজু। পালিযে যাচ্ছে ওরা।

ভজু খুশি হয়ে একটা লাফ দিযে দাঁড়ালো। টাঙিটা হাতে তুলে নিল। প্রেরণায় আপ্লুত হযে ভজুর দুর্ধর্ষ প্রতিজ্ঞাটা যেন প্রতিধ্বনি করলো,—পালাতে দিব না ঠাকুর। চোখ রেখে পেছু পেছু চলুন।

ভজু চলেছিল আগে আগে, পেছনে কেশব। কে ইহারা? কেশব শুধু এই একটি কথাই ভাবছিল। দিনমণি বিশ্বেস না সার্কেল অফিসার? মান্দার গাঁযের অদৃষ্টে দু'টি নতুন কৃতান্তের দূত। ওদের প্রতি নিঃশ্বাসে বিষ, প্রতি কণ্ঠস্বরে অভিশাপ, প্রতি দৃষ্টিতে সর্বনাশ। তবু কা সুন্দর ছন্দে অবাধে হেঁটে চলেছে, জ্বলজ্বল করছে, আনন্দে

তুলছে। ওদের জীবনে যেন ক্লান্তি নেই, নিরাশা নেই, শঙ্কা নেই। আর কিছুক্ষণ পরেই ওরা গাঁয়ে পৌছবে, দীঘির ঘাটে হাত-পা ধুয়ে নেবে, সকল ক্লান্তি ও শ্রান্তির পালা শেষ হয়ে যাবে। পেট ভরে খাবে, তৃপ্তির ঢেকুর তুলবে, আর ঘুমিয়ে পড়বে। কী প্রসন্ন জীবন! মাঝরাতে রতন চৌকিদার এসে হাঁক দিযে ওদের সুস্বপ্ন নষ্ট করবে না। ওরা কেউ দাগী নয়। অন্ধকারের মধ্যে অকপটভাবে কেশবের সারা মুখ-চোখ হিংস্র ও কুশ্রী হয়ে ওঠে। জীবনে দিনমণি বিশ্বেস হবার শক্তি নেই তার, কিন্তু একটা শক্তি আছে, দিনমণি বিশ্বাসকে আজ এখনি একটা পাকা বাঁশের লাঠির তমেচায সে ব্যর্থ করে দিতে পারে। এই শক্তির দীক্ষা দিযেছে ভজু। সেই তার সম্মুখে পথ দেখিযে চলেছে।

নিজেরই মনের উত্তেজিত আগ্রহকে অনেক কষ্টে সংযত করে কেশব বললো—একটু তাড়াতাড়ি চল ভজু।

কেশবের কথায ভজুর চলার বেগ তীব্রতর না হযে বরং মৃদুতব হযে এল। যেন পিছিযে আসছিল ভজু। তারপর সত্যিই থমকে দাঁড়িযে পড়লো।

ভজু বললো—আর পেছু নিযে লাভ নেই ঠাকুর।

কেশব—কেন?

ভজু—ইহারা আমাদের বিঘ্ন নয। দিনমণিও নয, সার্কেল বাবুও নয।

কেশব—তবে কারা?

ভজু—নাঃ, আমাদিগের কেউ নয। ফিবে চলুন ঠাকুর, আবার সেথা গিয়ে দাঁড়াতে হবে। দিনমণি বিশ্বেস আসবেই আজ, রেতের মধ্যে ফিরতে হবেই উহাকে।

আম বাগানের মাঝ-পথ থেকেই আবার দু'জনকে ফিরতে হলো। সত্যিই যেন একটা আলেয়া এতক্ষণ ধরে দু'জনার সঙ্গে বৃথা ছলনা করে সরে পড়েছে।

নিজেকে একটু ক্লান্ত বোধ করছিল কেশব। মাঠের খোলা হাওয়ায় পৌঁছে সহজ নিঃশ্বাসের আরামে উগ্র মনের নেশাটা থিতিয়ে আসছিল। দূরের একটা ডোবা থেকে কাদা-ভেজা কেয়ার গন্ধ বাতাসের আস্বাদ মিষ্টি করে তুলছিল।

ভজু বললো—মুখুজ্যার মেয়ে গাঁয়ে ফিরলো অনেক দিন পরে।

কেশব—কে? কোন্ মুখুজ্যার মেয়ে?

ভজু—আপনি উদিকে খুব ভাল করে চিনেন ঠাকুরমশাই। সঞ্জীব মুখুজ্যার মেয়ে। কলেজে পড়ে। বেশ বড় মানুষই হয়ে গেছে সঞ্জীব মুখুজ্যা।

দু'কান দিয়ে ভজুর কথার ধ্বনি আর সেই ধ্বনির রেশ শুনছিল কেশব। সারা অন্ধকারটাই যেন ধীরে ধীরে অলস ও নিস্তেজ হয়ে আসছিল কেয়াফুলের গন্ধে।

কতক্ষণ এভাবে চুপ করে বসেছিল, জানে না কেশব। চোখ মেলে তাকাতেই প্রথম দৃষ্টি পড়লো ভজুর ওপর। গাঁজার কল্‌কে মুখে তুলে লম্বা লম্বা টান দিচ্ছিল ভজু। আকাশে তারা গিজগিজ করছে। মেঠো হাওয়াটাও ঠাণ্ডা হয়ে এসেছে।

রাতটা ঠিক গতকালের রাতের মতই মনে হয়, এখনো সেই রেল লাইনের ধারেই যেন বসে আছে কেশব। মৃত্যুর স্পর্শ খুঁজতে গত রাত্রের মত আজও যেন এইখানেই এসেছিল কেশব। সেই ভজু ঠিক সেইভাবেই বসে আছে। গত রাত্রের দুঃস্বপ্ন যেন তাকে নিশির-ডাকে

ঘুরিয়ে ফিরিয়ে এখানে এনে ফেলেছে, এতক্ষণে শেষ হলো। সত্যিই দুঃস্বপ্নটা নিতান্ত মিথ্যা। মৃত্যুর স্পর্শ নয়, হারানো প্রাণের স্পর্শ এই পথেই কিছুক্ষণ আগে তার নিঃশ্বাসের বাতাস ছুঁয়ে চলে গেছে। মাধুরীরা গাঁয়ে ফিরেছে।

ভজু বললো—আপনি এত কি ভাবছেন ঠাকুর মশাই?

চমকে উঠলো কেশব। ভজু যেন কেশবের ধ্যানস্থ মনের এই গোপন সুস্বরের রেশটুকু শুনতে পেয়েছে। ভজুর প্রশ্নে যেন নির্মমতা আছে।

কেশব উত্তর দিল—না, কিছু ভাবছি না ভজু।

ভজু—সঞ্জীব মুখুজ্যার মেয়েকে আপনি নিশ্চয় চিনেন ঠাকুরমশাই।

কেশব—হ্যাঁ, চিনি।

ভজু—কিন্তু এখন আর চিনেন না নিশ্চয়। চিনতে পারবেন না। উহারা বড়মানুষ হয়ে গেছে।

কেশব চুপ করে রইল। ভজুর কথার মধ্যে সূক্ষ্ম একটা সাবধান-বাণী ইঙ্গিত দিয়ে উঠছে। ভজু যেন আভাসে বুঝিয়ে দিতে চায়, সঞ্জীব মুখুজ্যের মেয়ে আর জেল ফেরৎ দাগী কেশব ভট্চাযের মধ্যে অনেক ব্যবধান। এই ব্যবধান ঘুচতে পারে না এ জীবনে। সে আশা বৃথা, সে চেষ্টা বৃথা। কেশব যেন আবার নতুন করে সঞ্জীব মুখুজ্যের মেয়েকে চিনতে চেষ্টা না করে, করলে ব্যর্থ হতে হবে।

ভজু—আবার গাঁয়ের মধ্যে এক নতুন হাঙ্গামা ডেকে নিয়ে এল সঞ্জীব মুখুজ্যার মেয়ে। ইহাদের মাথা খারাপ হয়েছে, বড়মানুষ হলে যা হয় তাই।

কেশব—কিসের হাঙ্গামা?

ভজু—গান্ধী-হাঙ্গামা।

এই অর্থহীন কথাটা জেলে থাকতেই শুনেছিল কেশব। কথাটা কিছুদিন সত্যিই তার কয়েদীর জীবনে একটা মোহ সৃষ্টি করেছিল। শুধু কেশব একা নয়, জেলের প্রত্যেক নম্বরে প্রত্যেক কয়েদীর চোখের দৃষ্টিতে এক পরম আশার দীপ্তি এনেছিল। অধীর প্রতীক্ষায় এক এক করে সেই চঞ্চল আগ্রহের দিনগুলি কেটে গেছে। গান্ধী মহারাজ লড়াই সুরু করবেন, স্বরাজ হবে, গান্ধীজীর মুক্তি-সেনার দল একদিন জেল ফটকের কাছে এসে শঙ্খধ্বনি করবে, ফটক খুলে যাবে। সংসারের সকল পাপী দাগী অপরাধীকে গান্ধীজী ক্ষমা করে স্বরাজের দেশে ঠাঁই করে দেবেন। কিন্তু বৃথাই দিন গুণে গুণে মাস শেষ হলো, জেল ফটকের বাইরে কোনদিন সেই বাঞ্ছিত শঙ্খধ্বনি শোনা গেল না। দাগীরা দাগী হয়েই রইল, অপরাধীরা মেয়াদের ঘানিতেই ঘুরতে পড়ে রইল। দু'দিনের মরীচিকার মত ঐ কথাটা গোপন বাতাসে বৃথাই ভেসে এসেছিল। লাঞ্ছিত জীবনের ভরসার দুঃসাহসকে যেন অকারণে বিদ্রূপ করে কথাটা দু'দিন না যেতেই নিঃশব্দ হয়ে গেল।

সেই কথারই প্রতিধ্বনি করছে ভজু। কেশবেব চিন্তার অন্ধকারে কতগুলি বিস্মৃত কৌতূহলেব হাওযা লেগে যেন নিবন্ত মশালের আলোটা আবার দপ করে জ্বলে উঠলো। গান্ধী-হাঙ্গামা? কে এই গান্ধী? কেন তিনি হাঙ্গামা করেন? মাধুরীর সঙ্গে সেই হাঙ্গামার সম্পর্ক কি? কার জন্যে হাঙ্গামা করে গান্ধী?

রাত মাত্র গভীর হয়েছে। সম্মুখের অন্ধকারের কাছে সুকঠিন এক কর্তব্যেব সাধনায প্রতিশ্রুত হযে আছে কেশব, কিন্তু কেশবের ভুল হচ্ছিল। বর্তমানের মুহূর্তে এবং সম্মুখের অন্ধকারে জীবনের

যে ইঙ্গিত ধ্রুব নিশ্চিত ও অবধারিত হয়ে আছে, তার আহ্বান ধীরে ধীরে অস্পষ্ট হয়ে আসছে। কেশবের মনের ধর্মে যে চিন্তা নিষিদ্ধ, সেই নতুনের কথাই হঠাৎ আন্‌মনা হয়ে ভাবতে বসেছে কেশব।

ভজুও যেন কিছুক্ষণের জন্য একটু উদার হয়ে তার ক্ষুদ্র জীবনের পরিধির বাইরে, বড় পৃথিবীর প্রসঙ্গ এনে ফেলেছিল।—মীরনগরে খুব জোর গান্ধী-হাঙ্গামা বেধেছে। কালেজের বাবুরা দমতক্ চিল্লায়ে নিচ্ছে।

কথাটা শেষ করে হেসে ফেললো ভজু।

কেশব—সঞ্জীববাবুর মেয়ের সঙ্গে যাঁরা এলেন তাঁরাও কি···।

ভজু—হাঁ, উহারাও গান্ধীর লোক। বড় বড় ঝাণ্ডা কাঁধে নিয়ে এসেছে।

কেশব একটু অশ্চর্য হয়ে প্রশ্ন করলো—তুমি যে বললে ওদের কাঁধে জোড়া টাঙি ছিল ?

ভজু—সেই রকমই মনে নিয়েছিল প্রথমে, কিন্তু দেখলাম তা নয়। দুটো ঝাণ্ডা নিয়ে এসেছে।

নিজেরই মনের পুলকে হো হো করে হাসছিল ভজু। শুনতে ভাল লাগছিল কেশবের। ভজুর হাস্যালাপে তবু অন্ধকারের ভয়াবহতা যেন ফিকে হয়ে আসছিল।

ভজু বললো—এইবার দেখবেন ঠাকুরমশাই, কেমন মজার তামাশা লাগবে গাঁয়ে।

কেশবও হাসলো—তা একরকম মন্দ নয় ভজু।

ভজু—হাঁ, আমাদিগের আর কি বটে ঠাকুরমশাই ? ভদ্রলোকেরা হল্লা করবে আমরা তামাশা দেখবো।

ভজুর কথাটা কেশবের মনের ওপর একটা আঘাতের মত পড়লো। যেখানে ভদ্রলোকেরা হল্লা করবে, সেখানে কেশবের প্রবেশাধিকার নেই। কেশব আর ভজু দূরে দাঁড়িয়েই সেদৃশ্য দেখবে। কেশব আর ভজুর জীবনের পথ ও পরিণাম ভিন্ন মাটিতে তৈরী হয়ে আছে।

অনেকক্ষণ বিমর্ষ হয়ে বসেছিল কেশব। একটা চিন্তার যন্ত্রণার সঙ্গে নিঃশব্দে লড়াই করছিল কেশব। ভজুর অকপট সৌহার্দ্যের আলিঙ্গনে যেন তার অসহায় সত্তা হাঁসফাঁস করছে। পৃথিবীতে যেখানে যত খুশি তামাশা লাগুক, হাঙ্গাম বাধুক, সেখানে কেশবের উপস্থিত হবার কোন অধিকার নেই; কোন প্রয়োজন নেই।

কেশব বললো—রাত অনেক হয়েছে ভজু।

ভজু—ভালই হয়েছে। দিনমণি বিশ্বেস এইবার ফিরবে।

কেশবের সারা অন্তঃকরণের শুচিতা যেন ভজুর কথায় কলঙ্কিত হযে উঠলো। কী কঠোর হিংসার তপস্যায় ভজুর সকল বিচার-বিবেচনা, সাধ-আহ্লাদ সুস্থির হয়ে আছে। কোন ঘটনা, কোন আলেয়া, কোন নতুনের ইঙ্গিত ভজুকে তিলমাত্র পথভ্রষ্ট করতে পারে না।

কেশব উঠে দাঁড়ালো—একটা কথা আছে ভজু। কেশবের গলার স্বরে বিদ্রোহের উত্তেজনা ছিল।

ভজুও উঠে দাঁড়ালো—বলুন ঠাকুরমশাই।

কেশব—দিনমণি বিশ্বেস ফিরুক্ আর নাই ফিরুক্, আমি এইবার গাঁয়ে ফিরবো।

ভজু—আপনি গাঁয়ে ফিরুন আর নাই ফিরুন, আমি এইখানে দাঁড়িযে থাকবো।

কেশব—দাঁড়িয়ে থাকবে কেন ?

ভজু—আপনি গাঁয়ে ফিরবেন কেন ?

উত্তর দিতে পারলো না কেশব। কর্তব্যের আহ্বানে গাঁয়ের বাইরে এসে সে দাঁড়িয়েছে, হঠাৎ কেন তাঁর গাঁয়ে ফিরে যাবার কথা মনে পড়ে ? কোন্ অধিকারে ? কোন্ প্রয়োজনে ? কিসের প্রেরণায় ? দু'ঘণ্টার মধ্যে সকল শপথের নিষ্ঠা মরা পাতার মত ঝরে পড়বে, কি-এমন ঝড়ের হাওয়া লাগলো কেশবের মনে ? কেশব নিজেই এখনো স্পষ্ট করে জানে না, কিসের ঝড় ? কেশব শুধু জানে এই অন্ধকার আর সহ্য করা যায় না।

কেশব—আজ আমি তোমার কথার উত্তর দিতে পারবো না ভজু।

ভজু—দিবেন না।

কেশব—আমি তাহ'লে যাই।

ভজু—আসুন।

তবু থমকে দাঁড়িয়ে রইল কেশব। ভজুর মূর্তির দিকে তাকাতে ভয় করছিল। তবু এই ভাবে চলে গেলে কোন লাভ হবে না মনে হয়। ভজু নিশ্চয় বিশ্বাস করে, কেশব ভট্চায চলে যেতে পারে না। তাই সে এত সহজে, উদার হৃদয়ে কেশবকে মুক্ত করে দিতে চায়। কিন্তু উপায় নেই, ভজুর কাছ থেকে বিদায় নিতেই হবে তাকে। আজকের রাতের মত ভজুর নেতৃত্ব, ভজুর সৌহার্দ্য, ভজুর সহায়তাকে সে মেনে নিতে চায় না। আজকের মত প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করাই উচিত, কারণ প্রতিজ্ঞার স্বরূপ এখনো চেনা হয় নি। সময় চাই। সব দিকে কিছুদিনের জন্য সময় চাই কেশবের। জীবনের পথ সত্যই বড় কঠিন, বড় দুর্জ্ঞেয়। মুহূর্তের বিকারে যেমন জীবনের ওপর রাগ করা

নয়, উচিত তেমনি মুহূর্তের উল্লাসে জীবনকে ভুল করে দেবারও কোন অর্থ হয় না। ভজুর কাছে সে কৃতজ্ঞ, ভজুর হৃদয় আছে, ত্যাগী কর্মবীর ভজু। কিন্তু···।

মনের শিহরগুলিকে নিঃশ্বাস টেনে চেপে রাখার চেষ্টা করছিল কেশব। না, এই ভাবে চলে যাওয়া যায় না। এখানে একা একা টাঙি নিয়ে যদি অন্ধকারে বসে থাকে, কেউটের চেয়ে বেশী বিষাক্ত হয়ে যাবে ভজু। ভজুর হৃদয়কে অপমান করা উচিত নয়।

কেশব বললো—তুমি কিছু মনে করো না ভজু, আমাকে ফিরতেই হবে। আমার দ্বারা এখানে আজ রাত্রের মত কোন কাজ হবে না। আমি ভেবে দেখি।

ভজু—আপনি যেতে পারেন, আমি একাই কাজ করবো।

কেশব—মিছামিছি তুমি রাগ করছো ভজু। আজ রাতের মত খুনোখুনি কাণ্ডটা নাই বা করলে। একটু বুঝে সুঝে···।

ভজু হাসলো—তাতে আমার ক্ষতিটা কি ঠাকুরমশাই? দিনমণি বিশ্বেসকে আমি আজ জখম না করে গাঁয়ে ফিরবো না। আমার কোন ভয় নাই, কারণ আমার কিছুই হবে না। ফাঁসবেন আপনি।

কেশব—কেন?

ভজু—দিনমণি বিশ্বেস আপনার বিঘ্ন, আমার নয়। থানা থেকে সুরু করে বোর্ড অফিস পর্যন্ত সবাই জানে সে কথা।

কেশবের গলার স্বরে অদ্ভুত রকমের শঙ্কাচ্ছন্নতা ছিল—তাহ'লে, তুমি আমায় ফাঁসাবার জন্য এখানে দাঁড়িয়ে থাকবে ভজু?

ভজু—না ঠাকুরমশাই, আমি ফাঁসাতে চাই না আপনাকে, কিন্তু আপনি নিজেই ফাঁসবেন।

কেশব—কিন্তু তুমি এ কাজ করতে পার, আমি বিশ্বাস করতে পারি না ভজু।

ভজু আবার হেসে ফেললো—আপনি আমাকে এত বিশ্বাস কেন করলেন ঠাকুরমশাই ?

কেশব—বিশ্বাস করেছি, সেটাই কি আমার দোষ ?

ভজু—কিন্তু আপনি তো আমাকে সত্যিই বিশ্বাস করেন না ঠাকুর। যদি করতেন, তবে হঠাৎ বৈরাগী হযে গাঁযে ফিরবার জন্ম ছট্‌ফট্‌ করতেন না। আপনি আমাকে ভয় করছেন।

কেশবের গলার স্বর হঠাৎ উত্তপ্ত হযে উঠলো।—তুমি ভুল বুঝেছ ভজু, তোমাকে কেশ ভট্‌চায ভয় করে না।

ভজু—আমি দেখতে পাচ্ছি ঠাকুরমশাই, আপনি লাঠিটা শক্ত করে ধরেছেন ক্যানে ? ছি ছি !

কেশব—দেখতে পেযেছ ভালই কবেছ।

ভজু—হাঁ ভালই হলো ঠাকুবমশাই। ছোট মুখে বড় কথা অনেক বলেছি, আপনি অনেক সহ্য কবেছেন। মাপ কববেন ঠাকুব, চলুন।

কেশব—তুমি কোথায যাবে ?

ভজু—চলুন, আপনাকে বাগানটা পাব কবে দিযে চলে যাব।

কেশব—না, কোন দরকার নেই।

কেশব রওনা হলো। তবু কেশবের পেছু পেছু আম বাগানেব পথ ধরে হেঁটে আসছিল ভজু। কেন আসছে ? কি প্রযোজন ? কেশবের মনে এ সব প্রশ্নের আর কোন প্রশ্রয ছিল না। তার একটি কঠিন তিরস্কারের আঘাতে অন্ধকারের প্রাণী ভজুর মেরুদণ্ড ভেঙে গিযেছে। ঔদ্ধত্য চুর্ণ হয়ে

গেছে। ভজুরা সেই ধরণেরই প্রাণী, যাদের ভয় করলে তবে তারা ভয়াবহ হয়। তুচ্ছ করলে মুহূর্তে ভুয়ো হয়ে যায়।

আম বাগানটা পার হয়ে আবার গাঁয়ের পথে এসে দাঁড়ালো দু'জনে।

ভজু বললো—আমি এইবার যাই ঠাকুরমশাই।

কেশব—কোথায় ?

ভজু—যাই, চাটুয্যের অর্ডার সাপ্লাই করতে হবে, মাল যোগাড় করতে হবে।

অদ্ভুতভাবে গলার স্বর বিকৃত করে কথাগুলি বলছিল ভজু। কেশব বিস্মিত হয়ে ভজুর দিকে একটু এগিয়ে এসে উত্তর দিল—যাও, যেখানে খুশি যাও।

ভজুর দিকে এগিয়ে আসার সময় সাবধান থাকতে ভুল হয়নি কেশবের। লাঠিটা শক্ত করেই ধরেছিল। যদি প্রয়োজন হয়, ভজুর মত জীর্ণ-শীর্ণ একটা প্রাণীর যে-কোন হিংস্র ঔদ্ধত্যকে একটি আঘাতে চূর্ণ করে দেবার শক্তি তার আছে।

—আসি ঠাকুরমশাই। ক্ষেতের আল ধরে অন্য পথে রওনা হ'ল ভজু। কেশব ভট্‌চায হঠাৎ চম্‌কে বুঝতে পরলো, ভজুর গলার স্বরটা যেন কান্নার মত অসহায় করুণ ও বেদনায় সিক্ত। একটা আহত পশু যেন হঠাৎ তীক্ষ্ণ অস্ত্রের খোঁচা খেয়ে ছোট্ট একটা আর্তনাদ তুলে অন্য পথে পালিয়ে গেল।

ভোর না হতেই ঘরে ফিরলো কেশব। পূজোর ঘরের বেড়ার ফাঁক দিয়ে ক্ষীণ প্রদীপের কতকগুলি ছেঁড়া ছেঁড়া আলোর টুক্‌রো বাইরে ছড়িয়ে পড়েছিল। কিছুক্ষণ চুপ করে দাঁড়িয়ে কেশব শুনতে পেল, সারদা দেবী কাঁদছেন। আর একটু পরেই আরও ভাল করে বোঝা গেল, কান্নার সুরে একটা স্তব পাঠ করছেন সারদা।

কিছুক্ষণ একটা অস্বস্তির মধ্যে উঠোনের চারিদিক পায়চারি করলো কেশব। ক্লান্ত শরীর এলিয়ে দেবার মত একটা স্বাচ্ছন্দ্যের আশ্রয় খুঁজছিল। সারদার স্তবের সাড়া লেগে নিঝুম অন্ধকার করুণ হয়ে কাঁপছে। ডাকাডাকি করে এই নিপীড়িত নিশীথের প্রার্থনাকে ক্ষুণ্ণ করতে ইচ্ছে হলো না কেশবের।

টোলঘরের দাওয়ায় একটা মাদুর পাতা রয়েছে। দেখতে পেয়ে খুশি হলো কেশব। কতদিন এভাবে শুতে পায়নি, সেই বঞ্চনার শূন্যতাকে সে আজ কানায় কানায় ভরে তুলবে। ধুলোয় ভরা ঠাণ্ডা মাদুরের ওপর উপুড় হয়ে শুয়ে পড়লো কেশব। হাত দুটো ছড়িয়ে ধুলোর ওপরেই মাথাটা কাত করে গাল পেতে দিল। যেন দু'হাত দিয়ে ভিটের মাটি বুকে আঁকড়ে ধরলো কেশব। এমনিভাবে কিছুক্ষণ শুয়ে থাকলে সকল দৌরাত্ম আপনি শান্ত হয়ে আসে। দাওয়ার পাশে লেবু গাছের কুঁড়ির ভিড়ে তৃষিত পতঙ্গেরা ছুটোছুটি করে, ঠাণ্ডা মধুর ফোঁটা ছিটকে পড়ে, কপালে এসে লাগে। কেশবের আজও মনে পড়ে, ঠিকই এমনি ভাল লাগত মাকে বুকে জড়িয়ে শুয়ে থাকতে। এমনি নির্বিঘ্ন উপকূলের প্রশান্তি, এমনি নিবিড়তা, এমনি স্বপ্নলীন সুকোমল ঘুম। প্রতি রাত্রে তার ছোট্ট দুরন্ত প্রাণ-ক্লান্ত পাখীর মত ডানা গুটিয়ে নিশ্বাসে নিশ্বাসে সেই নিবিড়তার স্বাদ লুটে নিত। কতদিন আগে? আধো-তন্দ্রার মাঝখানে হিসাব করতে থাকে, হিসেব ভুল হয়ে যায়। কেশব ঘুমিয়ে পড়ে।

ঘুম ভাঙতেই কেশব দেখলো, উঠোনের ওপর দাঁড়িয়ে সারদা দেবী মহেশ কবিরাজের সঙ্গে কথা বলছেন।

মহেশ কবিরাজ বলছিলেন—তাহ'লে এবার আমি যাই মা। এই তেলটা স্নানের আগে ভাল করে মাথায় মাখিয়ে দেবেন। আর ঐ চূর্ণ

দিনে তিনবার ঠাণ্ডা জলের সঙ্গে মিশিয়ে খাইয়ে দেবেন। এইভাবে বায়ুর প্রকোপ একটু কমুক, তারপর একটা ঘৃত দেব। প্রতিদিন সকালে···।

কেশবের ঘুমভাঙা মূর্তিটার দিকে তাকালে এ সংশয় হবারই কথা। লাল চোখ, মাথার চুলে খড়ের কুটি জড়িয়ে আছে, ধূলোমাখা গা, কাপড়ে রাশি রাশি চোর কাঁটা—কোন্ নিশির ডাকে এই মূর্তি প্রতিরাত্রে পালিযে যায, ফিরে আসে পাগল হযে ?

টোল-ঘরের দাওয়া ছেড়ে ধীরে ধীরে শোবার ঘরের দিকে এগিযে যাচ্ছিল কেশব। মহেশ কবিরাজ একটু সন্ত্রস্তের মত ব্যস্ত হযে বললেন,—তাহ'লে এবার আমি যাই মা।

একা অসহাযের মত দাঁড়িযে সারদা দেবী হযতো আরও উদ্বিগ্ন হযে উঠতেন, কিন্তু কেশব নিজেই তাকে অনেকটা নিশ্চিন্ত করে দিল। পুকুরঘাটে গিযে স্নান সেরে এল কেশব। মাথা আঁচড়ালো, বাক্স খুলে বাছাবাছির পর পাঁচ বছর আগেকার বাসন্তী রঙের পাঞ্জাবীটা বের করে গাযে দিল। কাঠের সিন্দুক খুলে এক গাদা বই আর খাতা বের করে উঠোনের রোদে মেলে দিল।

দূরে দাঁড়িযে সারদা দেবী উৎফুল্লভাবে দেখছিলেন। তাঁর সাবা মুখে এক নির্ভয প্রসন্নতার হাসি ছড়িযে ছিল।

—কিছু খেতে দাও মা।

কেশবের কথাগুলি সারদার আনন্দ আবও উতলা করে তুললো। সত্যিই এতদিনে যেন তাঁর খোকা ফিরে এসেছে। তাই বা কেন ? মনে হয়, তাঁর খোকা কোথাও যাযনি, পাঁচ বছর ধরে অদৃশ্য হযে থাকেনি। প্রতিদিন এইভাবে সেই পরিচিত সুবে ডাক দিযে এসেছে। যেন বেলা

হয়েছে, আর্য পাঠশালার সময় হয়েছে, পড়াতে যেতে হবে, খেতে চাইছে খোকা।

মহেশ কবিরাজের দেওয়া তেলের শিশিটার দিকে তাকাতে লজ্জা পাচ্ছিলেন সারদা দেবী। ওষুধগুলি আঁচলের আড়ালে লুকিয়ে খাবার-ঘরের দিকে একরকম দৌড়ে চলে গেলেন। যেতে যেতে ব্যস্ত হয়ে আদরের সুরে অনুরোধ করলেন—একটু অপেক্ষা কর বাবা এখুনি দিচ্ছি, লক্ষী ছেলে আমার।

শুনতে শুনতে সত্যিই লক্ষী ছেলের বয়স যেন মনে মনে ফিরে পাচ্ছিল কেশব। বইগুলির ধুলো ঝেড়ে এক পাশে সাজিয়ে রাখছিল। মাঝে মাঝে খাতা খুলে পুরনো লেখাগুলির দিকে সাগ্রহ দৃষ্টি দিয়ে পড়ছিল। মান্দার গাঁয়ের জীবনের পুণ্য এক বর্ণও মুছে যায়নি। অক্ষরে অক্ষরে এই তো সবই সত্য হয়ে আছে তার খাতার পাতায়। কত আদর্শ, কত আকাঙ্ক্ষা, কত তপস্যার কথা। কত জল্পনা ঘোষণা পরিকল্পনা। কত 'গ্রামের উন্নতি,' কত 'শিক্ষা-সংস্কার', কত 'আত্মনির্ভরতা', কত 'স্বজাতি ও বিজাতি'। কেশবেরও মনে পড়েনা পাঁচ বছরের নির্বাসনে মান্দার গাঁয়ের জীবনে কখনো সে অগোচর হয়েছিল। মান্দার গাঁ হারিয়ে যায়নি শুধু ধুলোর ঢাকা খসে পড়লেই মান্দার গাঁযের সকালবেলার ঘাসে ঘাসে তরুণ শিশিরের বিন্দু আবার চিক্‌চিক্ করবে, আবার সন্ধ্যেবেলায় মুদি-পাড়ার কীর্তনের আসরে মৃদঙ্গের ধ্বনি শোনা যাবে, রাত্রির কদমগাছে বকের ঝাঁক শাদা ফুলের মত ফুটে থাকবে, আর্য পাঠশালার মাঠে খেলার পালা চুকিয়ে দিয়ে ছেলের দল শেযালের ডাক ডেকে ঘরের পথে রওনা হবে, আজও নিশ্চয় সেই মান্দার গাঁ কোথাও লুকিয়ে আছে। শুধু অজয়ের হেডমাস্টার দিনমণি বিশ্বাসের এ-বি-সি-ডির শাসনে, প্রেসিডেন্ট

ভূদেব চাটুয্যের ইউনিয়নে আর গাঁজার দোকানের নানা ধুলামলিনতায় ঢাকা পড়ে আছে মান্দার গাঁ।

গুন গুন করে গান গাইছিল কেশব। বইগুলি ঘরের ভেতর তুলে নিয়ে গেল। খাতাগুলি সাজিয়ে রাখলো। পোকায় কাটা লেখা, কাঁচা হাতের লেখা, বাজে কথার লেখা—কিছুই আজ ফেলবে না কেশব। সবই তার প্রয়োজন। সব চেয়ে কাঁচা হাতের লেখা সেই রুল-টানা কাগজের খাতাটা, সেটাও রইল, ফেলে দিয়ে লাভ নেই। কেশব জানে কী অপলাপ নিজের দুঃসাহসে ব্যক্ত হয়ে আছে তার মধ্যে, ষোল বছর বয়সের ছেলের লেখা এক চৌপদী কবিতায়। জংলী ফুলের সৌরভের মত ষোল বছর বযসের মন সে-দিনের ভোরের বাতাসকে ঠিক স্পষ্ট করে চিন্‌তে পারেনি, আপন হয়ে মিশে যেতে পারেনি, শুধু সলজ্জ সংকোচে কাছাকাছি এসে ছুঁযে চলে গেছে, ছন্দের ভুলে নানাদিকে ছড়িয়ে পড়েছে। গোপন শিলালিপির মত ছোট খাতাটাকে কাগজপত্রের ভিতর লুকিযে রাখলো কেশব। এই দুর্লভ প্রত্ন-রহস্য মান্দার গাঁয়ের মাটির নিচেই সত্য হযে থাক্, তাকে খুঁড়ে বাইরে এনে কোন লাভ নেই, আজ তার কোন মূল্যও নেই।

খাওয়া শেষ হলে পান চিবিয়ে ঘুরে বেড়াতে লাগলো কেশব। পুকুরপাড়ের কলাগাছের গোড়ার মাটিগুলি কঞ্চি দিয়ে খুঁচিযে পরীক্ষা করে দেখলো। উত্তরের বাগানটা লিচু-জামরুলের বিরস মূর্তিগুলির দিকে অনেকক্ষণ ধরে সহৃদযের মত তাকিযে রইল। বাগানের এই রৌদ্র-ছাযার মেলায কোন্ মনের তাগিদে ঘুরে বেড়ালো কেশব, তা সে নিজেই জানে না। শুধু বেড়াতে ভাল লাগছিল, রূপে রসে গন্ধে স্পর্শে তার অপহৃত পৃথিবী আবার মনের রেণুতে রেণুতে কাযামব হয়ে উঠছে। আবার

নতুন করে আলোর উত্তাপ, ছায়ার শীতলতা, পাখীর ডাক, মাটির গন্ধ, পাতার মর্মরধ্বনি একে একে মনের নিরনুভব ফাঁকিগুলিকে দূর করে পরিপূর্ণতার আস্বাদ বয়ে আনছে। মনটা কেমন ভার-ভার হয়ে উঠছে, মিস্টি মিস্টি বিষাদে ও বেদনায়।

সারদা দেবীরও ব্যস্ততার অন্ত ছিল না। সংসারের সব সম্ভার ঘরের ভেতর থেকে টেনে এনে রোদে মেলে দিলেন। তাঁর অন্তরের পাঁচ বছরের অবরোধ আজ সত্যিই সমাপ্ত হয়েছে। ঘরদোর পরিষ্কার করনেল, মহেশ কবিরাজের দেওয়া তেলের শিশিটাকে নানা আবর্জনার সঙ্গে আস্তাকুঁড়ের মধ্যে ফেলে দিলেন। ঐসব অলক্ষুণে ওষুধের আজ আর কোন প্রয়োজন নেই। মেটে ঘরের সিঁড়ি আর সারা আঙিনা গোবর দিয়ে নিকিয়ে ফেললেন। সারদা দেবীর ব্যস্ততার মধ্যে একটা নতুন সংসারের চাঞ্চল্য যেন উঁকি দিচ্ছিলো। যেন কোন উৎসবের দিন আসন্ন। সারদা দেবীরও থেকে থেকে মনে পড়ছিল—পাঁচ বছর পরে খোকা গাঁয়ে ফিরলো, আর মাধুরীও ফিরে এল, আশ্চর্য!

সারা দুপুর আর বিকেল বই পড়ে, গান গেয়ে আর সারদার সঙ্গে গল্প করে কেটে গেল কেশবের।

সন্ধ্যে হতেই আবার গম্ভীর হয়ে আসছিল কেশব, কিন্তু আজ আর বোধ হয় কোন নিশির-ডাক শোনা যাবে না। প্রত্যেক ঘরে প্রদীপ জ্বালিয়ে দিয়েছেন সারদা। সব অন্ধকারের ইঙ্গিত বাড়ির চতুঃসীমার বাইরে সভয়ে দাঁড়িয়ে থাকবে, প্রবেশ করার সাধ্য নেই।

পূজোর ঘরের ভেতর ঢুকলেন সারদা। টোল ঘরের দরজায় চুপ করে বসে বাইরের অন্ধকারের দিকে তাকিয়ে ছিল কেশব। মনে পড়ছিল ভজুর কথা। ভজুকে আজ আর ভয়াবহ মনে হয় না, কিন্তু তুচ্ছ করারই

বা কি আছে ? ভজু সত্যিই শ্রদ্ধার পাত্র নয়, কিন্তু ঘৃণাই বা কি করে করা যায় ? ভজুকে সুহৃদ বলে স্বীকার করা যায় না, কিন্তু তাকে শত্রু বলা যায় কোন্ নিয়মে ? কেশবের শুধু মনে পড়ছিল, কাল রাত্রে বিদায় নেবার সময় ভজু বোধ হয় কেঁদেছিল। অন্ধকারে কিংবা নিজের মনের অন্ধতায় সে দৃশ্য স্পষ্ট করে দেখতে পায়নি কেশব।

কেশবের হঠাৎ মনে পড়ে ভজুর বিরাট স্বপ্নের কথাটা। একদিন তার ঠাকুরমশাই হবেন এ-গাঁয়ের প্রেসিডেণ্ট, আর স্বয়ং ভজু হবে চৌকিদার। কাল রাত্রের অন্ধকারে ভজুর এই স্বপ্ন ব্যর্থ হয়ে গেছে, তাই কেঁদে চলে গেছে ভজু। আবার রেল-লাইন ডিঙিয়ে চলে গেছে ভজু, গেরস্থের ঘরের বেড়ার ফাঁকে উঁকি দিতে, ঘটিবাটি চুরি করতে। আবার পথে পথে সাপের ছোবল, শেয়ালের কামড় আর সজাগ গেরস্থের বন্দুকের গুলীর মুখে তার জীর্ণ প্রাণের আয়ু সঁপে দিয়ে ঘুরে বেড়াবে ভজু। ভূদেব চাটুয্যের অর্ডার যুগিয়ে গাঁজার পয়সা পেতে হবে।

কেশবের চোখ দুটো ঝাপসা হয়ে আসছিল। কেশব বুঝতে পারে, ভজুকে একেবারে উপেক্ষা করার সাধ্য বোধ হয় তার নেই। অন্য সকলের মত কেশবের কাছেও ভজু দিনের আলোতে মিথ্যে হয়ে থাকবে; কিন্তু প্রতি সূর্যাস্তের পর অন্ধকারের সঙ্গে সঙ্গে ভজু তার ভাবনার আশেপাশে ঘুরে বেড়াবে। ভজু তাকে ভয় দেখাতে পারলো না, গুরু হয়ে উঠতে পারলো না, সাথী হলো না; কিন্তু মনের কোন্ কোণে যেন দুঃখী ভজুর ছায়াটা এখনো লুকিয়ে আছে। এখনো সরে যায়নি।

রতন চৌকিদার এসে সামনে বসলো। কেশবের মাথার রক্ত ক্ষণিকের মত আক্রোশে ফুলে উঠলো। এক লাথি মেরে এই ঘৃণ্য মূর্তিটাকে এখনি

সরিয়ে দেওয়াই উচিত। এই লোকটাই মান্দার গাঁয়ের সমস্ত অধঃপতিত জীবনের দূত।

—তুমি আবার এলে কেন?

কেশবের রুক্ষস্বরের প্রশ্নে একটু অপ্রস্তুত হয়ে রতন বললো—

—আইজ্ঞা এমনি এলাম ভট্‌চায মশাই। একটু তামাক টেনে চলে যাব, একটু আগুন দেন ভট্‌চায মশাই।

রতনের স্পর্ধার স্বরূপ দেখে বিস্মিত হচ্ছিল কেশব। পাঁচ টাকা ঘুষ দিয়েও রতনের মত পাপের প্রতিনিধিকে দূরে সরিয়ে রাখা যায় না। প্রতি সন্ধ্যায় এইভাবে কালো রক্তের প্রাণীর মত আঙিনায় দেখা দেবে, অক্লেশে তামাকের আগুন দাবি করবে। তার মনুষ্যত্বের শুচিতাকে প্রতি মুহূর্তে অপমান করবে রতন চৌকিদার।

কেশব বললো—পাঁচটা টাকা নিয়েছ, তবু আবার কেন বিরক্ত করতে এসেছ?

রতন চৌকিদার জিভ্‌ কেটে বললো—ছি ছি ভট্‌চায মশাই, আপনি ভুল বুঝেছেন, আমি আবার টাকা চাইতে আসি নাই।

কেশব—কিন্তু তুমি আসবেই বা কেন?

রতন—মাঝেসাঝে এক-আধটু তামাকও কি খেয়ে যাব না ভট্‌চায মশাই?

কেশব—না, ওসব ভাল দেখায় না।

রতন—তবে রফা করে ফেলুন। আর মাত্র দু'টা টাকা গরীবের হাতে দিয়ে ফেলুন ভট্‌চায মশাই।

কেশব—কেন?

রতন—ইহা আমাদিগের দস্তুরি ভট্‌চায মশাই। সত্যিই তো, রোজ

রোজ যদি আপনার উঠানে বসে তামাক খাই, আপনার মান থাকে না ভট্‌চায মশাই। আপনি ভদ্রলোক, আপনি বড়মানুষ, আপনাদিগের ইজ্জতের ডর আছে। তাই বলছিলাম···।

কেশব—না, এক পয়সাও পাবে না।

রতন—আপনি বৃথা রাগ করছেন ভট্‌চায মশাই। আমি কোন অন্যায বলি নাই। পাঁচটা টাকা দিযেছেন, আমি হাঁক দেওযা বন্ধ করেছি। আপনি তো তামাকের দস্তুরি দেন নাই। পাঁচ টাকায় দু'দুটা বন্দোবস্ত হযে যাবে, এমন কথা ক্যানে বলেন ভট্‌চায?

কেশব—তুমি যদি আর একটা কথা বলেছ, এখান থেকে গলাধাক্কা দিযে নীচের ক্ষেতে নাবিযে দেব।

রতন চৌকিদার শঙ্কিত হযে একটা লাফ দিয়ে উঠে পড়ল। তার পেটি, বল্লম আর তামাকের কল্‌কেটা হাতে নিযে একরকম দৌড় দিযেই ক্ষেতের অন্ধকারে অদৃশ্য হযে গেল।

মাত্র ভোর হযেছে, সারা রাত্রির দুর্ভাবনার অন্ধকার সবেমাত্র প্রসন্ন আলোকের আভায স্বচ্ছ হযে উঠেছে। কেশব ঘুরে বেড়াচ্ছিলো। কখনো পুকুরের ধারে, কখনো কলাবাগানের আশেপাশে, কখনো নীচের ক্ষেতের নরম আলোর ওপরে, সারা রাত্রির বিষণ্ণতার বন্দীত্ব থেকে মুক্ত হয়ে কেশবের মনটাও যেন স্বচ্ছন্দ আনন্দের আবেগে প্রস্ফুট আলোকের মত চারদিকে ছড়িযে পড়ছিল।

শুধু তাই নয, অদ্ভুত এক বিস্মযেব পুলকে কেশবের চোখের দৃষ্টিটা চারদিকের দৃশ্যের মর্ম সন্ধান করে ফিরছিলো। এ কী দৃশ্য? এর অর্থ কি? কি হযেছে মান্দার গাঁযের জীবনে?

জীবনে এরকম দৃশ্য দেখেনি কেশব। সারা মান্দার গাঁয়ের মাটি কাঁপছে। সদ্যোজাগ্রত পৃথিবীর সহস্র অদৃশ্য উৎস থেকে যেন প্রাণের স্রোত ফুঁড়ে উঠেছে। মান্দার গাঁয়ের পথ, ক্ষেত, মাঠ ছাপিয়ে ছুটে আসছে জনতার স্রোত। দলে দলে তারা আসছে। নানা রূপে, নানা বর্ণে, নানা ছন্দে। কেশবের সমুখ দিয়েই একদল সাঁওতাল নর-নারী চলে গেল গেরুয়া মাটির পথ-চলা ধুলোয় তাদের পা হাঁটু পর্যন্ত রঙিন হয়ে গেছে। কতদূর থেকে এরা আসছে কে জানে? কত রাত থেকে উঠে, ঘুমের আরাম আর স্বপ্নের মাযা ছেড়ে দিয়ে এরা পথ চলতে আরম্ভ করেছে কে জানে? মেয়েদের পিঠে পিঠে পুঁটলি-বাঁধা শিশুরা তখনও অকাতরে ঘুমোচ্ছে। সদ্য ঘুম-ভাঙা পাখীর আলাপের মত জনতা আস্তে আস্তে কথা বলে, আস্তে আস্তে হাসে। নতুন দিনের প্রথম আলোকের সঙ্কোচের মত তারাও যেন ধীরে ধীরে সাড়া দিযে জাগছে।

এরা কোন্ গাঁযের লোক, ঠিক বুঝতে পারেনা কেশব। প্রত্যুষের বাতাসে যেন তারা দূরান্তর থেকে ভেসে চলে এসেছে। কিন্তু কেন? আজ হাটবার নয়, মান্দার গাঁযে কোন মেলা নেই, তবু কোন্ মহোৎসবের আহ্বানে এরা গাঁযের ভেতর কাতার দিযে ঢুকছে, অনেক চেষ্টা করেও কিছু বুঝতে পারেনা কেশব।

সাঁওতাল নরনারীর জনতা চলে গেল। কেশবের চোখে পড়লো, পশ্চিমের ডাঙা ধরে একটা ভাঙা হাটের জনতা যেন আবার একত্র হযে একমুখী আবেগে গাঁয়ের দিকে ছুটে আসছে। দূর তালবনের ঝড়ের মত তাদের হর্ষধ্বনি মাঝে মাঝে বেশ স্পষ্ট হযে শোনা যায। সারা ডাঙার ওপর পূবালী রোদের কুচি চিক্‌চিক্ করছে। সারা জনতার মূর্তিটাও অদ্ভুত রকমের বদলে গেছে। হাটের জনতার মত বিস্রস্ত মালিন্যের চিহ্ন

কোথাও নেই, যেন কোন নদীর জোয়ারের জলে স্নান সেরে সবাই ফিরে আসছে এক পথে।

কেশব বুঝতে পারে, জনতা ঠিক ফিরে আসছে না। তারা আসছে। এই মান্দার গাঁয়ের দিকেই তারা আসছে। তারা ভিন্ গাঁয়ের লোক, কিন্তু মান্দার গাঁযের জীবনের নদীতে কোন্ জোয়ার জেগেছে? কিসের আহ্বানে, কোন্ কারণে, কোন্ পুণ্যোদকের স্পর্শ নিতে তারা আসছে?

হাঁটতে হাঁটতে কিছুদূর এগিয়ে গেল কেশব। এখান থেকে গাঁযের কাঁচা হাঁটুরে রাস্তাটা আরও প্রসস্ত হয়ে দু'দিকে চলে গেছে, দীঘির ঘাটের দিকে আর স্কুলের মাঠের দিকে।

স্কুলের মাঠের দিকের পথটা হঠাৎ যেন বাঁশবনের যবনিকার আড়ালে গুম্‌রে উঠলো। প্রায হাজারখানেক মানুষের একটা অভিযান হইহই উচ্ছ্বাসে প্রমত্ত হযে পথের মোড়ে দেখা দিল। কেশব চিনতে পারে, এরা ভৈরবপুরের লোক, মুসলমান চাষী আর জোলার দল। বোধ হয় সমস্ত ভৈরবপুব উৎখাত হযে মান্দার গাঁয়ে চলে এসেছে। কেউ বাদ যায়নি, আশী বছরের বুড়োরাও আছে, তিন-চার বছরের ছেলেমেযেরাও আছে। জনতার মধ্যে মাঝে মাঝে দু'একটা দোলাযমান পাল্‌কি দেখা যায। হুঁকো হাতে দু'চারজন করে বুড়ো মাতব্বর পাল্‌কির ভেতর বসে আছে। তাদের মধ্যে কেউ বা সত্যিই পঙ্গু, কেউ বা জ্বরে ও ব্যাধিতে অশক্ত। কিসের এক আগ্রহ ও উল্লাসে, সারা জনতার মুখচ্ছবি যেন প্রতি মুহূর্তে রঙ বদলাচ্ছে, অস্থির হয়ে উঠছে।

সারা মান্দার গাঁযের মাথায তখন সকালবেলার রোদ ঝল্‌সে উঠেছে। কেশব আবার ঘরের দিকে ফিরলো। এখনো কোন চেনামুখের সাক্ষাৎ পাযনি কেশব। তা'হলে বরং একটা প্রশ্ন করে মান্দার

গাঁয়ের এই আকস্মিক আলোড়নের হেতুর একটা সন্ধান পেত, বিস্ময় দূর হতো।

দীঘির ঘাট কোন্ দিকে? সবার মুখে এই এক প্রশ্ন। এক একটি জনতা পথে দেখা দেয়, কেশবকে প্রশ্ন করে। পথের প্রহরীর মতই কেশব হাত তুলে দীঘির ঘাটের পথ চিনিয়ে দিয়ে এগিয়ে পড়ে।

সহজে এগিয়ে যেতে পারে না কেশব। লোকের ভিড় ক্রমেই বাড়ছে। ভিড়ের ব্যস্ততা আরও বাড়ছে। মান্দার গাঁয়ের কোন পথ আর নীরব নেই, কোন পথ শূন্য নেই। দলে দলে নানান্ গাঁয়ের নানা জাতের জনতা একে একে দেখা দিয়ে দীঘির ঘাটের পথে গাছপালার ভিড়ে অদৃশ্য হয়ে যাচ্ছে।

কেশব হঠাৎ চুপ করে উৎকর্ণ হয়ে দাঁড়ালো। বহু কণ্ঠের একটা মিলিত সঙ্গীতের স্বর বাতাসে শিহর জাগিয়ে এগিয়ে আসছে। ধীরে ধীরে তারা সামনে এসে পড়লো। একটা স্কুলের ছাত্রের দল, কোন্ গাঁয়ের তা ঠিক বুঝতে পারেনা কেশব। কেশব শুধু মনপ্রাণ সংযত করে সেই সঙ্গীতের অর্থ বুঝতে চেষ্টা করে। কিসের গান গায় ছেলেরা?

এই সঙ্গীতের অর্থ কেশবের চেতনায় স্পন্দিত হয়ে প্রতিধ্বনি তোলে। অর্থ বুঝতে কোন কষ্ট হয় না। কিন্তু বিশ্বাস করতে ভয় করে। সত্যিই কি এই গান আজ কোটী জীবনের কর্মে জ্ঞানে ও ধ্যানে সত্য হয়ে উঠেছে? সত্যিই কি হিন্দুস্থানের দুর্ভাগ্যের কুহেলিকা কেটে গেল? এক মহামানবের আবির্ভাব হয়েছে ভারতের মাটিতে, এ কি পঞ্জিকা আর জ্যোতিষীর গণনার মত একটা কথার কথা মাত্র, না সংসারের ঘটনার নিয়মে পরিণত এক সত্যের বাণী?

এতদিনে সত্যিই নতুন নিয়মে জেগে উঠছে মান্দার গাঁ। এ দৃশ্য

মান্দার গাঁয়ের প্রচলিত ইতিহাসের ব্যতিক্রম। কিন্তু কেশবের বিদ্রোহী চিত্ত এই নতুনত্বের দিকে শত্রুর মত তাকাতে পারে না। বাইরের পৃথিবী এক বিচিত্র ও অভিনব রূপে মান্দার গাঁয়ের ঘুমন্ত সত্তাকে আজ সকালে আক্রমণ করেছে, কিন্তু তবু রাগ করতে পারে না কেশব। কিসের আক্রমণ, কিসের অভিযান, তা'ও যে ঠিক বোঝা যায় না।

তবু না বুঝে আজ ঘরে ফিরবে না কেশব। আজ যেন মান্দার গাঁয়ের অবরোধ সমাপ্ত হয়ে গেছে। গাঁ-ভরা কাঁটার বেড়াগুলি আজকের ভোরের আলোর সঙ্গে সঙ্গে উপ্‌ড়ে গিয়েছে। মাঠের ফাটলগুলি জোড়া লেগে গেছে। আমবাগানের প্রবেশপথের সকল সংকীর্ণতা ঘুচে গেছে। কেশবের মনে হয়, গীতার বাণী বোধ হয় নিতান্ত মিথ্যে নয়। বড় বেশি গ্লানি জমেছিল মান্দার গাঁয়ে, তাই যুগের সন্ধিক্ষণে নিশ্চয় কোন মহামানব সম্ভব হয়েছেন।

বেলা বাড়ছিল। কোনখানে স্থির হয়ে দাঁড়াতে পারছিল না কেশব। চারদিকের বর্ণ ও শব্দের নতুন ইঙ্গিতের আকুলতা তাকে উতলা করে তুলছিল। ঘুরতে ঘুরতে স্কুলের মাঠের দিকে অনেকদূর এগিয়ে এল কেশব। নতুন স্কুলবাড়ির সামনে সেই মাঠের ঘাসে সেই পুরাতন সবুজ আজও ঠিক তেমনি আছে। নিশ্চিহ্ন আর্য পাঠশালা ধুলো হয়ে মিশে গিয়েছিল, কিন্তু আবার বোধ হয় মাটির আড়ালে অঙ্কুর হয়ে জেগে উঠছে।

কেশবের ধারণা ভুল হয়নি। দূরে দাঁড়িয়ে সেই দৃশ্য দেখছিল কেশব। ইংরেজী স্কুলের বাড়িটা যেন উদ্দাম শব্দের তাণ্ডবে চৌচির হয়ে যাচ্ছিল। হেডমাস্টার দিনমণি বিশ্বাস বেত হাতে বিদ্রোহের বাতাসকে সায়েস্তা করার জন্য চারদিকে ছুটাছুটি করছিলেন। স্কুলের চেয়ার টেবিল বেঞ্চ ব্ল্যাকবোর্ডগুলি যেন একটা হঠাৎ বিস্ফোরণে মাঠের উপর ছিট্‌কে এসে

পড়ছিল। এ-বি-সি-ডি শাসনতন্ত্রের যত সুগম্ভীর উপচারগুলিকে টেনে এনে ছাত্রের দল মাঠের ওপর জড়ো করে রাখছিল। থেকে থেকে জয়-ধ্বনি উঠছিল।

দৃশ্যটাকে স্বচক্ষে দেখেও বিশ্বাস করতে পারছিল না কেশব। সত্যিই কি পাপের ঘরে আগুন লাগলো এতদিনে? ইংরেজী স্কুলের অবাস্তর অস্তিত্ব আজ কিসের আঘাতে টলমল করে উঠলো? কার নির্দেশে? কোথায় লুকিয়েছিল এই আয়োজন? সারা মান্দার গাঁ ঘুরে এই আয়োজনের কোন আভাস কেন সে খুঁজে পায়নি এতদিন?

স্কুলের ছাত্রেরা একদল হয়ে মাঠের ওপর দাঁড়ালো। জয়ধ্বনি তুললো। একটা পতাকা দুলে উঠলো। মাঠের ওপর দিয়ে ছাত্রের দল দুল্‌তে দুল্‌তে এগিয়ে এল বারোয়ারী কালীতলার দিকে, পূবদিকে ঘুরে গেল, দীঘির ঘাটের পথ ধরে।

সকল অভিযান দীঘির ঘাটের দিকে, সকল আগ্রহ দীঘির ঘাটের দিকে, সকল পদধ্বনির লয় দীঘির ঘাটের দিকে। দীঘির ঘাটের দিকে কি হঠাৎ কোন তীর্থ পত্তন হলো?

এই প্রশ্নের উত্তরটুকু জানবার জন্য ছটফট করছিল কেশব।' আর একটু এগিয়ে দীঘির ঘাটের কাছে অনায়াসে পৌঁছে যেতে পারে, পথের ওপর এমন কোন বাধা নেই। সবাই অবাধে চলে যাচ্ছে। কিন্তু কেশব যেতে পারে না। তার মনের ভেতরই অজানা একটা বাধা নিজের অস্পষ্ট-তায় দুর্লঙ্ঘ্য হয়ে রয়েছে। এই রহস্য ভঞ্জন না হলে সে ঘরে ফিরতে পারে না, দীঘির ঘাটের দিকে যাবারও সাধ্য নেই। এই রহস্যের মর্ম অল্প অল্প চেনা যায়, আভাসে কিছুটা জানা যায়। কিন্তু এই জানা সত্য হলেই বা কি, মিথ্যে হলেই বা কি? কেশবের পথ এই পর্যন্ত এসেই ফুরিয়ে গেছে।

নন্দীবাবুদের পড়ো ভিটের ওপর একটা একচালায় একদল ভাগলপুরী গয়লা গরু মোষ নিয়ে বাথান খুলেছে। ক্লান্তভাবে ঘুরে ঘুরে পড়ো ভিটে-টার কাছে এসে দাঁড়ালো। ভিটেটার শ্রীহীন ধ্বংসের কাঁটাভরা জঞ্জালের মধ্যেও অজস্র নীলফুল ফুটে রয়েছে। অন্যদিন হলে শুধু কাঁটাবনের দৃশ্য-টাই বড় হয়ে চোখে পড়তো কেশবের। কিন্তু আজ বারবার নীলফুলগুলির স্নিগ্ধতার সঙ্গে তার বিস্ময়ভরা চোখের দৃষ্টি এক হয়ে মিশে যাচ্ছিল।

যা সুপ্ত দিন, তাই আজ জাগছে। যা সুপ্ত হয়েছিল, তাই আজ ব্যক্ত হয়েছে। আজকের সকালে মান্দার গাঁয়ের মাটিতে হঠাৎ কোন নতুনের আবির্ভাব হয়নি, আপন মাটির দিব্যগুণেই আজ নতুন সৌরভ ছড়াচ্ছে মান্দার গাঁ। মান্দার গাঁয়ের সহস্র নীলফুল কাঁটার আড়ালে শুধু চাপা পড়েছিল। আজ আড়ালের বাধা ভেঙে গেছে।

কেশব দেখলো, ভাগলপুরী গয়লারা ব্যস্ত হয়ে কাজকর্ম সেরে, হাতমুখ ধুয়ে নিলো। যত্ন করে মাথায় বড় পাগড়ী বাঁধলো, তারপর সবাই এক সঙ্গে রওনা হলো। সেই একই অবধারিত পথে, দীঘির ঘাটের দিকে।

রোদের তাপ বাড়ছে ক্রমশ, মধ্যদিনের খর উজ্জ্বলতায় মান্দার গাঁকে ঘিরে ধরেছে। দু'একটা ক্লান্ত পাখী এরই মধ্যে পাতার ছায়া খুঁজে বেড়াচ্ছে। কেশবও যেন অচল হয়ে গিয়েছিল। এখান থেকে কেউ যদি হঠাৎ দয়া করে তাকে টেনে নিয়ে না যায়, তা'হলে সে কোনদিনে যেতে পারবে না। ঘরেও না বাইরেও না।

অনেকক্ষণ হলো পথের সাড়াশব্দ নিঝুম হয়ে গিয়েছিল। সংসারের সকল ধ্বনি ও প্রতিধ্বনি মিছিল করে দিঘীর ঘাটের কাছে গিয়ে একত্রিত হয়েছে। এখানে শুধু শূন্যতা, আর সেই শূন্যতাকে একাকী বৃথা পাহারা দেবার জন্য কেশবের মন পড়ে রইল।

শেষ পথিকটিও চলে গেল। এক বৃদ্ধ, ঠুক্ ঠুক্ করে লাঠি ঠুকে হাঁপাতে হাঁপাতে আসছিল। কেশবের কাছে এসে প্রশ্ন করলো—দীঘির ঘাটে ?

—এই সোজা পথ, চলে যান।

বৃদ্ধ চলে যাচ্ছিল। কেশব হঠাৎ প্রশ্ন করলো—দীঘির ঘাটে কি ব্যাপার হচ্ছে মাত্‌বর ?

বৃদ্ধ ফিরে দাঁড়ালো, কষ্টে-সৃষ্টে ধীরে ধীরে ঘাড় তুলে কেশবের দিকে বিস্মিত হয়ে তাকিয়ে বললো—সভা হবে ?

দ্বিতীয়বার প্রশ্ন করার মত নির্লজ্জতা ও দুঃসাহস ছিল না কেশবের। নইলে সে নিশ্চয় আবার প্রশ্ন করতো—কিসের সভা ?

ঠুক্ ঠুক্ করে লাঠি ঠুকে বুড়ো মত্‌বরের মূর্তিটা হেঁটে চলেছিল। কেশব তাকিয়ে দেখছিল। এই শান্ত দৃষ্টির মধ্যে কিছুটা হিংসা কাতরতার আবছায়াও যেন উঁকি দিচ্ছিলো। এই বুড়োও ঠুক্ ঠুক্ করে এগিয়ে যেতে পারে, শুধু কেশব পারে না। সবাই পথ খুঁজে পাচ্ছে, শুধু কেশব পায় না।

চম্‌কে উঠে মুখ ফিরে তাকালো কেশব। কাঁধের ওপর কার একটা হাতের স্পর্শ ঘনিষ্ঠ হয়ে লুটিয়ে পড়েছে পেছন থেকে।

অজয় মিত্তির হেসে হেসে জিজ্ঞেস করলো—এখানে হাঁ করে কি দেখছিস্ ?

অজয়কে স্পষ্ট করে দেখেও সেই রূঢ় চমকের আকস্মিকতা কেশব কাটিয়ে উঠতে পারলো না। উত্তর দিতে পারলো না।

অজয় বললো—অজকের দিনেও তুই এখানে একা চুপ করে দাঁড়ায়ে আছিস্, আশ্চর্য !

কেশব উত্তর দিল না। আজকের দিনেও এখানে চুপ করে না

দাঁড়িয়ে থেকে আর কোন উপায় নেই কেশবের, সেই নীরব হতাশ্বাসের সত্যটুকুই কেশবের চোখে করুণ হয়ে ফুটে উঠছিল।

অজয় মিত্তির চোক নামিয়ে নিল। অন্যদিকে মুখ ঘুরিয়ে সান্ত্বনার সুরে বললো—চল, এখানে দাঁড়িয়ে থাকতে পারবি না।

কেশবের নতুন করে বার বার মনে হচ্ছিল, কাঁটাবনের চিহ্ন মুছে গেছে, শুধু নীল ফুল ফুটছে আজ।

দীঘির ঘাটে জনসভা। হাজারে হাজারে লোক সেই দুপুরের চণ্ড রোদ মাথায় নিয়ে বসেছিল। ধীর স্থির সংযত জনতা, কোন আলোড়ন নেই, উদাস হর্ষের উচ্ছ্বাস নেই, উত্তেজনা নেই, এক বিচিত্র শান্ত মানবতার অংশ। সকল কৌতূহল দু'চোখের কোণে চিকচিক করে। সকল আগ্রহ ধীর নিঃশ্বাসের ছন্দে স্পন্দিত হয়, সারা জনতা যেন একটি বিশেষ প্রাণের সূত্রে এসে গাঁথা পড়ে গেছে।

এই বিরাট জনতার কেউ বোধ হয় স্পষ্ট করে জানেও না কেন তারা এখানে এলো, কি কারণে ও কি উদ্দেশ্যে? তারা শুধু চলে এসেছে দুর্বার এক আহ্বানের ইঙ্গিতে, অজ্ঞাত এক পরিণামের মঙ্গল কুড়িয়ে নিতে। মাত্র দু'দিন হলো তাদের গাঁয়ে গাঁয়ে সন্ধ্যে সকাল কারা যেন কানে কানে ডেকে গেছে, চুপে চুপে বলে গেছে, আবার কখনও বা মাঝ বাজারে ঢোল পিটিয়ে গর্জন করে গেছে—কাল দুপুরে মান্দার গাঁয়ের দীঘির ঘাটে জনসভা, স্বরাজের লড়াই সুরু হবে।

দু'দিন ধরে গাঁয়ের বাতাসে এই প্রশ্নের ঝড় চলেছে—স্বরাজ কি জিনিস? কে লড়বে? কি ভাবে লড়তে হবে? এবং এই স্বরাজ পেয়েই বা কি হবে?

সাঁওতাল গাঁয়ের মাঝি মাঝিনরা এক রকম বুঝেছে। স্বরাজ হলে ঐ মঙ্গল দারোগাটা চিরদিনের মত বিদায় নিবে। লকড়ি ভাঙতে গেলে লাঠি নিয়ে তেড়ে আসবে না। শুকনো পাতা কুড়োতে গেলে গ্রেপ্তার করে সদরে চালান দেবার জন্য কোন ভয়ের দূত ওত পেতে আর বসে থাকবে না। রোদ জল বাতাসের মত গাছের পাতা আর কাঠের আগুন তাদের ভোগে সুখে ও তৃপ্তিতে সার্থক হবে। স্বরাজ হবে।

গফুরাবাদের চাষী আর জোলারা লাঠি নামিযে চুপ করে বসে আছে, তারা বিশ্বাস করে লাঠালাঠির একঘেয়ে দুঃখ এইবার ঘুচে যাবে। কেউ আর বাঁধের জল রুখতে পাইক বসাবে না। রাতারাতি আল ভেঙে ক্ষেতের মাপ চুরি করবে না। আর মালগুজারি নিতে হবে না। এক এক চকে লাগান জমি নিযে মনের সুখে লাঙল ঠেলবে সবাই। ধানের বখরা হিসেব কর্তে কোন রাজাবাবুর সরকার আর অসবে না! যার হাত তার লাঙল, যার লাঙল তার জমি। গফুরাবাদের চাষীরা জানে স্বরাজ হবে।

চাষী জনতার গাযে তবু দু'একটা গামছার অভিজাত্য ছিল। মাতব্বরদের মাথায মোটা মোটা পাগড়িও ছিল। কিন্তু জোলাদেরই সাজসজ্জার কোন জৌলুস নেই। ভযানক রিক্ততায ও নিরাভরণে ওরাই সবার চেযে বেশি দীন হযে পড়েছে। রোগা রোগা রুক্ষ কালো মূর্তি, আদুড় গা, পরনে ছেঁড়া ছেঁড়া গামছা। ঘরের তাঁত ওদের দেহের হাড়ের মত জিরজিরে, থেকেও নেই। ঐ হাড়ের জীবনকে বহন করা যায না। তাই জীবন ওদের কাছে বোঝা।

জোলারা জানে তিন চারদিন থেকে তাদের গাঁয়ের ভেতরে ও বাইরে একটা চঞ্চল বার্তা দৌড়ে ফিরে বেড়াচ্ছে। আবার নাকি

চরকা ঘুরবে, নাটাই ঘুরবে, মাকু নাচবে। বিলিতী কাপড় বিক্রি বন্ধ করে দিয়েছেন গান্ধী মহারাজ। সারা জীবনের ও সারা যুগের শত্রু- সস্তা বিলিতী কাপড়কে ঘরবার করে দিয়েছেন যিনি, কত শক্তিমান তিনি? অনাহারের রাত্রি ভোর হলো এতদিনে। আর হাটের সাধুজীর দুয়ারে গিয়ে ধর্ণা দিতে হবে না, খত লিখে সুতো কিনতে হবে না, সারা মাসের মেহন্নতের সৃষ্টিকে পুঁটুলি বেঁধে ঐ সাহুকারের লুব্ধ হাত দু'টির আশ্রয়ে জমা দিতে হবে না। এবার সত্যিই সুদিন আসবে, যারা এতদিন পরকে ঠকিয়ে সুখ করছে, তারাই মরবে, তারাই সায়েস্তা হবে। এবার জেগে উঠবে তারা, যারা এতদিন শুধু সহ্য করেছে। আবার আসবে সবাই, তাঁতী জোলার দুয়ারে দুয়ারে রাজা-গরীব সবাই ঘুরে বেড়াবে, সেধে দাম দিয়ে একখানা কাপড় কিনে ধন্য হয়ে ফিরে যাবে। জোলারা বিশ্বাস করে, এইবার স্বরাজ হবে।

জনসভার মাঝখানে একটা কাঠের মঞ্চ তৈরি করা হয়েছিল। মঞ্চের ওপর যারা বসেছিল, তাদের অনেককেই কেউ চেনে না। গাঁয়ের লোকেরা তাদের জীবনে এই প্রথম দেখলো, তাদের সবারই এক রকমের পোষাক, মুটিয়া কাপড়ের জামা গায়ে, মাথায় শাদা কাপড়ের টুপি। তরা কে কোন্ জাতের, হিন্দু না মুসলমান, গরীব না বড়লোক, পণ্ডিত না মূর্খ—এ সব কোন খবর রাখে না এই হাজার হাজার গেঁয়ো মানুষের জনতা। তবু আশ্চর্য, তাদেরই দু'টি দুঃখের কথা শুনতে বুকভরা আগ্রহ নিয়ে সবাই বসে আছে স্থির হয়ে। প্রকাণ্ড হ্রদের জলের মত জনতার মূর্তিটা বিনা উচ্ছ্বাসে নিঃশব্দ তরঙ্গের মত মাঝে মাঝে দুলে উঠছিল, দেখবার আগ্রহে। একটি যুবক মঞ্চের ওপর প্রকাণ্ড একটা ছবি নিয়ে এসে রাখলো, ফুলের মালা জড়িয়ে দিল ছবির গায়ে। হাজার

হাজার নরনারী যেন কোন অদৃশ্য সৈনাধ্যক্ষের ইঙ্গিতে এক সঙ্গে উঠে দাঁড়ালো, বিস্ময়ে ও শ্রদ্ধায় তাকিয়ে রইল ছবির দিকে—ঐ গান্ধী মহারাজের মূর্তি।

জীবনে তারা এই প্রথম দেখলো, মহারাজেব মূর্তি যে এই রকমের হতে পারে। এ একেবারে নতুন মহারাজা। মাথায মুকুট নেই, গাযে মণিমাণিক্য অলংকার নেই, এ রাজা সিংহাসনে বসেন না, হাজার হাজার দুঃখী গ্রাম্য কৃষকের চক্ষু আজ প্রথম দেখলো, ঠিক তাদেরই মত রূপ আর সাজ নিয়ে এই নতুন রাজা দেখা দিয়েছেন। ইনিই স্ব[illegible] আনবেন। ইনি বন্দুকের গুলির সামনে হাসতে হাসতে বুক পে[illegible] কাউকে আঘাত করবেন না, কাউকে হিংসে করবেন না। উনি একাধারে ঋষি ও রাজা, পীর ও আমির। এই গান্ধী মহারাজের কথা শোনাতে এসেছে তাঁর শিষ্যেরা। পূজারতির শান্ত আবেশ নিয়ে, নমাজের মত শুদ্ধ সংযম আর নিষ্ঠা নিয়ে জনতা প্রতীক্ষায বসেছিল।

সভার কাজ আরম্ভ হলো। লক্ষ নরনারীর সকল দুঃখের সমস্যাকে আজ নিকাশ করা হবে। সভায মঞ্চটি যেন তাদেরই জীবনের এক পরম নাটমঞ্চ। সকল দৈন্য, অপমান ও ক্লেশের পাপকে আজ এই নাটমঞ্চে উচ্চারিত বাণী নিশ্চিহ্ন করবে, সেই সুর জাগছে—ধীরে ধীরে ক্রমেই স্পষ্ট হয়ে শোনা যাচ্ছে।

একটি ছেলে নাটমঞ্চের ওপর দাঁড়িয়ে গান গাইল—জয় জয় জাগ্রত স্বদেশ।

গানের সুরটা যেন জনতার ভেতর সাঁতার দিয়ে বেড়াতে লাগলো। এ সঙ্গীতের সব কথার অর্থ বোঝা যায না, কিন্তু সুরটা বুঝতে দেরি

হয না। একেবারে হৃদযের সুর, এক অবনত জীবনেব গ্লানি বিরাট এক পুণ্যস্রোতের ছোঁযায ধুযে মুছে যাচ্ছে, কঠোর কর্মের পবীক্ষায় সকল বেদনা পুড়ে যাচ্ছে। এত করুণ হযেও এ গানে হতাশা নেই, এ গানে কোন হুংকার নেই, আছে নির্ভয আত্মদানের আহ্বান।

দববেশ গোছেব চেহাবা আব একজন উঠে দাঁড়ালেন মঞ্চের ওপব। একটা চাবণ সঙ্গীত গাইলেন। জনতা নিঃশ্বাস রুদ্ধ কবে অকল্প্য এক বেদনাব জ্বালা সহ্য কবতে লাগলো। দূব পাঞ্জাবেব এক শহবেব কোণে একটি উদ্যান, নাম জালিযানওযালাবাগ। আজকেব এই সভাব মতই সেখানে হাজাব হাজাব নবনাবী শিশু স্ববাজেব প্রতিজ্ঞা নিতে এক হযে বসেছিল। কামান ও বন্দুকেব মুখে আগুন ছুটিযে প্রার্থনাকে পুড়িযে দেওযা হযেছে। বাগানের গাছে গাছে বক্তেব ছিটা লেগেছে। বাগানেব মাটিতে এক একটি অসহায প্রাণ ছিন্নভিন্ন হযে মুখ থুবড়ে পড়েছে। পাঞ্জাবেব শোকের শিখা ছড়িযে পড়েছে চাবদিকে। আহুতিব সাড়া পড়েছে দেশময। দববেশ গাইছিলেন—আজ তোমাদেব সবাকার চিত্তে এই তাপ লাগুক, আহুতিব জন্য প্রস্তুত হও। জীবনপণে স্ববাজ নিতে হবে। মৃত্যুকে উপেক্ষা কবতে হবে। হিন্দু-মুসলমানেব ‘বেবাদাবী’ অটুট হযে যাক।

দববেশেব সঙ্গীতেব সেই অস্থিব শিখাব জ্বালা ধীবে ধীবে শান্ত হযে এল। গানেব সুবেব গুঞ্জন ধীবে ধীবে মিলিযে গেল। স্তব্ধ জনতার মধ্যে আব এক নতুন সুবেব গুঞ্জন শোনা গেল, ভোম্‌বাব গুনগুন শব্দেব মত।

জনতার দৃষ্টি চঞ্চল হযে উঠলো। এ আবাব কোন্‌ যাদুকরেব যন্ত্রের আওযাজ ?

মঞ্চের ওপর রোদের মধ্যে চোখমুখ লাল করে একটি অল্প বয়সের মেয়ে চরকা কাটছিল। এই মেয়েটিকে মান্দার গাঁয়ের লোকেরাই শুধু চেনে, সঞ্জীব চাটুয্যের মেয়ে মাধুরী।

সভার স্তব্ধতায় শব্দের শিহর জাগিযে, জযধ্বনি তুলে, পতাকা হাতে ঢুকলো ইংরেজী স্কুলের ছাত্রের দল। সমস্ত জনতা যেন এই হর্ষের আশাপথ চেযে মুহূর্ত গুণছিল। জযধ্বনির হর্ষে বাতাসের পরমাণু হাজার বিস্ফোরণে ফেটে পড়তে লাগলো। মহাত্মা গান্ধী কি জয, স্বতন্ত্র ভারত কি জয, হিন্দু-মুসলমানেব জয!

শঙ্কার পালা শেষ হযে গেছে, অপমান মানবাব দিন ফুরিযে গেছে, আজকেব লগ্নে সবাইকে শুধু উঠে দাঁড়াতে হবে, লড়তে হবে।

কিসেব লড়াই?

সভাপতি উঠে দাঁড়ালেন। সমস্ত জনতা হৃদযেব সমস্ত বিশ্বাস ও নিষ্ঠা দিযে শুনলো সেই প্রতিজ্ঞাব কথা—সরকারের সঙ্গে সকল সম্পর্ক চুকিযে দিযে আমরা স্বরাজ গড়ে তুলবো।

সভাপতি হাতযোড় কবে আবেদন করলেন—স্বাধীনতার নামে, স্বরাজের নামে, ভারতমাতার সন্তানেব নামে আপনাবা সবকাবী সংশ্রব ছাড়ুন।

ইংবেজী স্কুলের একটি ছাত্র এগিযে এসে জানালো—আজ থেকে আমরা ইংরেজী স্কুল ছাড়লাম।

জনতা জযধ্বনি তুলে অভিনন্দন জানালো।

কিন্তু আর কৈ? জনতার মধ্যে আর কোন সাড়া দেখা গেল না। সরকারী চাকুরির ঘৃণাকে দূরে ঠেলে ফেলে দেবে, আব কে কে আছে? আর কি কেউ নেই?

সত্যি আর কেউ ছিল না। এর মধ্যে ভূদেব চাটুয্যে ছিল না, দিনমণি বিশ্বাসও আসেনি। শুধু চাষী মুটে মজুর কারিগর আর সাঁওতালের দল, এর মধ্যে সরকারী চাকুরির তক্‌মা নেই কারও।

সভাপতি অনেকক্ষণ ধরে জনতার দিকে আগ্রহে তাকিয়ে রইলেন। জনতাও যেন অপ্রস্তুত হয়ে বসেছিল। আজকের এই শুভদিনে, তাদের মধ্যে এমন একজনও কি নেই, যে এই কলঙ্ক-বর্জনের গৌরব নিতে পারে?

জনসভার মাঝখান থেকে ধীরে ধীরে উঠে এল একজন। সভামঞ্চের কাছে এসে একটা নীল উর্দি আর একটা বল্লম সঁপে দিল। বুকে হাত দিয়ে প্রতিজ্ঞা জানালো—স্বারাজের নামে আজ থেকে আমার চৌকিদারী চাকরিতে ইস্তফা দিলাম।

রতন চৌকিদার। সারা জনতা যেন রতন চৌকিদারের নাম গান গেয়ে বাতাস মুখর করে তুললো। অভিনন্দনের ঝড় বেজে উঠলো—সাবাস্ রতন চৌকিদার।

রতন হাতযোড় করে বললো—চৌকিদার নই, আমি রতন।

হাজার হাজার গ্রাম্য নরনারী এই অঘটনকে স্বচক্ষে দেখলো। সত্যিই সেদিন আর নেই, এবার সবই নতুন রকম হয়ে যাবে। চৌকিদারও অক্লেশে হাসতে হাসতে উর্দি ঠেলে ফেলে, চাকরি ছেড়ে দেয়। আজ থেকে হাওয়া বইল অন্য দিকে। এই হাওয়া সবাইকে উড়িয়ে নিয়ে যাবে, স্বরাজ হবে।

বিকেল হয়ে আসছিল। জনতা বসে আছে, সৈনিকের ছাউনীর মত জনসভার রূপ। এ পর্যন্ত শুধু প্রতিজ্ঞার কথা শুনেছে তারা, এখনো লড়াইয়ের কথা ওঠেনি। গফুরাবাদের চাষীরা যদিও লাঠি নামিয়ে

রেখেছিল, কিন্তু হাতের কাছেই ছিল। কি জানি কিসের নির্দেশ আসে। কে জানে এই মুহূর্তেই হয়তো লড়াই সুরু করতে হবে। আজ কিছু একটা করবেই তারা, নইলে ছয় ক্রোশ পথ হেঁটে, ক্ষুধা তৃষ্ণা ভুলে গিয়ে কেন এসেছে তারা ?

সভাপতি বললেন—বিলিতী কাপড় কেউ ছোঁব না। এই অপবিত্র বস্ত্রটাই আমাদের জীবনের গোলামির সবচেয়ে বড় কলঙ্কের চিহ্ন। আজও আমরা লাঙল ঠেলে ক্ষেতে ক্ষেতে ফসল ফলাই। সেই রকম আজও আমরা আবার চরকা তাঁতে কাপড় বুনবো। আমাদের নিজের তৈরি মোটা ভাত-কাপড়ে আমরা স্বরাজ আনবো। বিলিতী কাপড় দূর কর।

ছাত্রের দল গায়ের জামা খুলে ফেললো। এক জায়গায় স্তূপাকার করে রাখলো। আগুন ধরিয়ে দিল।

সত্যি করেই আরম্ভ হলো বহ্ন্যুৎসব। আর কোন সংশয় নেই। জনতা চঞ্চল হয়ে উঠছিল। তাদের অনুভবের স্তরে স্তরে এই বহ্ন্যুৎসবের দীপ্তি ছড়িয়ে পড়েছে। তারা শুধু বুঝতে পারে, লড়াইয়ের নিশানা হয়ে গেল। এইবার আরম্ভ হবে। এই লড়াই যেমন তেমন লড়াই নয়। এইভাবে সকল অসার সাধ পুড়িয়ে দিয়ে শুদ্ধ হতে হবে।

সভাপতি বললেন—এই যে আগুন জ্বললো আজ, সে-আগুন নিবে না, যতদিন না স্বরাজ হয়।

জনতা তাই ভাবছিল। আগুনের খেলা থামবে না সহজে। তার জন্ম প্রস্তুত হতে হবে। এ-আগুনে কত ঘরের সুখ পুড়ে যাবে, কে জানে। তবু স্বরাজ হবে। তাই ভয় পেলে চলবে না। যা বলেছেন গান্ধী মহারাজ, তাই সত্যি হবে, তাই করতে হবে। অনেক দূর থেকে

তারা হেঁটে এসেছে, অনেক দিন থেকেই তারা পথে পথে হাঁটছে, কাঁটা ফুটছে পায়ে। তাই আজ এ-আগুনকে বরণ করে নিতেই হবে, সকল কাঁটা পুড়ে যাবে।

বহ্ন্যুৎসবের সাড়া দিল সবার আগে সাঁওতাল জনতার মনে। আগুনের উৎসবে তাদের আরণ্যজীবন চিরদিন অভ্যস্ত। জঙ্গলের সকল হিংসাকে তারা আগুন দিয়ে তাড়ায়। শত পুরুষ ধরে তারা আগুনের সামনে নেচে আসছে। আগুনের সম্মুখেই তাদের জীবনের প্রেম নৃত্যপর হয়ে ওঠে, মাদল বাজে। কত অমঙ্গলের ডাইন-ডাইনী পুড়ে ভস্ম হয়েছে এই আগুনের কুণ্ডে। আগুনের ব্রত করে কত রোগ মারী উপদ্রব তারা সংসার থেকে দূর করেছে। শত পুরুষের বীরগাথা তারা আজও গান গেয়ে স্মরণ করে। তাদের সংগ্রামের পুণ্য প্রতীক এই আগুন, জয়ের আনন্দ এই আগুনের শিখায়।

সাঁওতাল নরনারী হঠাৎ উঠে দাঁড়িয়ে এক সুরে নেচে নেচে গান গাইতে, সুরু করে দিল—আগুন জেলে জঙ্গলের সকল কাঁটা দূর কর, পথ পরিষ্কার কর, আগুনের আলো জ্বাল, গান্ধী মহারাজ এসে আমাদের রাঙা পলাশের গাছ দেখতে পাবেন।

জনতার জয়ধ্বনির মধ্যে গফুরাবাদের মাতব্বরেরা এসে মাথার বিলিতী কাপড়ের পাগড়ী খুলে আগুনে ফেলে দিল।

সভাপতি বললেন—আদালতে কেউ যেও না। নিজেদের ঝগড়া নিজেরা মেটাবো। ভগবান ছাড়া, আমাদের পঞ্চায়েতের চেয়ে বড় কোন আদালত সংসারে নেই।

সাড়া পড়ে গেল জনতার মধ্যে। হাঁ, আর কেউ আদালতে জানাব না। আইনকে তারা ভাল করে চিনেছে। আর আইনের বিচার নেই।

ছোট ছোট বৈঠকে জনতা ভিন্ন ভিন্ন হয়ে আলোচনা করলো। সব সুদ্ধ এগারটি গ্রামের পঞ্চায়েৎ তখুনি তৈরি হয়ে গেল। স্বরাজের নামে শপথ নিল সবাই, পঞ্চায়েৎকে তারা জীবনের সকল কাজে স্বীকার করবে যতদিন না স্বরাজের আদালত হয়।

সভাপতি বললেন—এই ইউনিয়ন বোর্ডের কি প্রয়োজন? গ্রামের কোন্ উন্নতি হয়েছে? কিছু না। জনতা একবাক্যে উত্তর দিল। দুঃখের বোঝা আরও বেড়েছে। চুরি-ডাকাতি আরও বেশি হয়েছে। ভিখিরীর সংখ্যা বেড়েছে। গাঁজা-আফিমে গ্রামের বুক ভরে গেছে। প্রত্যেক হাটে বেশ্যে বসেছে। জুয়ার দোকান লাইসেন্স পেয়েছে। পুল বাঁধা হয় না, সাঁকো ভেঙে গেছে, পথ টুকরো টুকরো হয়েছে, বাঁধের জল শুকিয়েছে, আর ট্যাকসো বেড়েছে। মানুষ মরলেও ট্যাকসো দিতে হচ্ছে।

সভাপতি বললেন—ইউনিয়ন বোর্ডের সংস্রব ছাড়তে হবে। ওর মধ্যে কোন মঙ্গল নেই। যাঁরা দেশকে ভালবাসেন, যাঁরা দেশ-ভাইয়ের মুখে হাসি ফোটাতে চান, তাঁরা ইউনিয়ন বোর্ড ছেড়ে পঞ্চায়েৎ গড়ে তুলেন। এই পঞ্চায়েৎ আমাদের গ্রামের বুকের হাড়। ভেঙে গিয়েছিল, আবার তাকে জোড়া দিতে হবে।

একে একে নয় জন বোর্ডের সদস্য উঠে এলেন। জনতার সামনে শপথ করলেন—আমরা বোর্ডের সদস্য-পদে ইস্তফা দিলাম।

সভাপতি বললেন—গাঁজা-আফিমের পাপ আমরা স্পর্শ করবো না। এই বিষ আমাদের অমানুষ করছে। পৃথিবীতে কোন সভ্যদেশে এই অনাচার নেই। স্বাধীন দেশের আবগারী বিভাগ গাঁজা-আফিমের বিষ দমন করে। আমাদের সরকারের আবগারী বিভাগ আফিমের বিষ বেচে

পয়সা করে। আজ থেকে আমরা এই অন্যায়কে আর সইব না। গাঁজার দোকানের পথ আটক করে আমরা দাঁড়িয়ে থাকবো, আমার ভাইকে আমি বিষ খেতে দেব না। এই আমাদের লড়াইয়ের পথ। লাঠির মারে আমরা হটবো না, বন্দুকের গুলিতে আমরা নড়বো না, সঙিনের খোঁচায় আমরা সরবো না।

জয়ধ্বনির মধ্যে, প্রতিজ্ঞা ও প্রতিশ্রুতির কলরবের মধ্যে, বিলিতী কাপড়ের টাটকা ছাইয়ের গরম হাওয়ার মধ্যে সভা ভঙ্গ হলো। সন্ধ্যে হয়ে আসছিল।

জনতা ফিরে চললো। আবার দল বেঁধে মান্দার গাঁয়ের পথ-মাঠ ছাপিয়ে জনতা চললো। সারাদিনের চাঞ্চল্যে ও উপবাসেও তাদের শরীরে কোন ক্লান্তি স্পর্শ করেনি। সাঁওতাল মেয়েদের পিঠে পুঁটুলি-বাঁধা শিশুরা তেমনি আরামে ও অকাতরে ঘুমোচ্ছে।

স্বরাজের হাওয়া লেগেছে ভারতের সংসারে। তারই ছোটখাট একটি ব্রত হয়ে গেল দীঘির ঘাটের জনসভায়। দুটি গান, দুটি প্রতিজ্ঞা, দু'চারিটি কথা। তবু জনতা যেন বুক ভরে নিয়ে গেল। অনেক কিছু পেল।

জনসভাটা যেন যজ্ঞের মত, কতকগুলি মন্ত্র-স্তব আর আরতির মধ্যে শেষ হয়ে গেল। স্পষ্ট করে কিছু বোঝা গেল না, স্পষ্ট ভাষায় কিছু নির্দেশ দিল না। গফুরাবাদের চাষীরা শান্তভাবেই আবার লাঠি কুড়িয়ে নিল।

কিন্তু সমস্ত জনসভায় মূর্তি আর রব ছাপিয়ে যেন আভাসে একটা বড় কথা ফুটে উঠেছে। সবাই যেন নিজের মনের দিকে তাকিয়ে দেখতে পায়, যত বেদনা লুকিয়ে আছে এইখানে, তারই সমাপ্তির লগ্ন এসেছে ঘনিয়ে। তারই জন্য লড়াই।

কেশবের হাত ধরে টানাটানি করছিল অজয়; কিন্তু কেশব তবু উৎসাহের সঙ্গে সাড়া দিযে এগিয়ে যেতে পারল না। কেশবের মন সত্যি করে প্রসন্নতায় ভরে উঠেছে, চারিদিকের ইঙ্গিতের অর্থ খুবই স্পষ্ট করে বুঝতে পারছে, কিন্তু তবু একটা সঙ্কোচ। এখনো একটা আড়ালে লুকিয়ে থাকতে চায় কেশব, অজয় বুঝতে পারে, কেন এই সংকোচ।

অজয় বললো—আমার ওপর খুব রাগ করে আছিস্ তুই।

কেশব—সেটা কি সত্যই বুঝতে পেরেছিস্?

অজয়—হ্যাঁ।

কেশব—কি, বল্‌তো?

অজয় হেসে ফেললো—পৈতে আন্দোলন।

কেশবও হাসছিল—না, আমি আব বাগ করবো না, যত পাবিস্ পৈতে আন্দোলন কর্।

অজয়—না, আর পৈতে আন্দোলনেব দরকাব নেই, তার চেযে বড় ঝড় এসে গেছে।

এতক্ষণে কেশব যেন অজযের হাতটা গভীর সৌহার্দ্যেব আগ্রহে চেপে ধরলো।—সত্যি করে বলতো অজয, যা যা শুনছি, এসব কি সত্যি?

অজয়—কি শুনছিস্?

কেশব—এই যে এইমাত্র বললি, ঝড় এসে গেছে।

অজয—হ্যাঁ, নইলে মাধুরীর মত মেযেও কলেজ ছেড়ে দেয?

কেশবের চোখের দৃষ্টিটা হঠাৎ প্রদীপ্ত হযে ওঠে, অজযের মুখের ওপর ভোরের তারার মত জ্বলজ্বল করতে থাকে, যেন বহু জিজ্ঞাসা একসঙ্গে আকুল হযে উঠেছে।

কেশব—মাধুরী সত্যিই কলেজ ছেড়ে দিল?

অজয়—তাই তো স্বচক্ষে দেখলাম। সঞ্জীব চাটুয্যে ঠিক করেছিলেন, মাধুরীও নাকি বিলেত যাবে।' হঠাৎ হাওয়া ফিরে গেল।

চুপ করে রইল কেশব। ক্ষণিক স্তব্ধতার মধ্যে কেশব যেন তার হৃদয়ের সকল বাতায়ন খুলে দিয়ে সেই অদ্ভুত ঝড়ের বেগময় গুঞ্জন শুনছিল। এই ঝড় মান্দার গাঁয়ের সকল বিকার ও ভ্রান্তিকে নিঃশেষে উড়িয়ে নিয়ে যাবে। শুধু তাই নয়, যা কিছু হারিয়ে গিয়েছিল, তাকে ফিরিয়ে দিয়ে যাবে। অজয় মিত্তির ফিরে এসেছে, তার গলায় পৈতে নেই। মাধুরী ফিরে এসেছে, মাধুরী আর কলেজে পড়ে না। হযতো দেবুও শীগ্‌গির ফিরে আসবে বিলেতের মায়া কাটিয়ে।

অজয়—না, এখানে আর দাঁড়িয়ে থেকে লাভ কি? চল্।

আবার কেশবের হাত ধরে আগ্রহে টান দিল অজয়। কেশব একটু অপ্রস্তুত হয়ে বললো—না, ওদিকে যাব না। চল্ আমার বাড়িতে।

অজয়—না তোমাকে যেতেই হবে।

কেশব—পারবো না ভাই।

অজয—কেন?

কেশব—আমার ভয়ানক অস্বস্তি লাগবে।

অজয আশ্চর্য হয়ে কিছুক্ষণ কেশবের মুখের দিকে তাকিয়ে রইল। কেশবের আচরণে তার সঙ্কোচের কারণটা খুবই স্পষ্ট হয়ে ধরা যাচ্ছে। কিন্তু চিরকালের মুখ-খোলা ও মন-খোলা কেশব ভট্‌চাযের আচরণে আজ হঠাৎ এত কুণ্ঠা কেন? সেই নির্ভীক ও অহঙ্কারী সকল হাঙ্গামার পাণ্ডা কেশব ভট্‌চায আজ আড়ালে লুকিয়ে থাক্‌তে চায়, জনসভা ও জনতার দিকে পেছন ফিরে সরে থাকতে চায, কেন?

কেশবের মুখের দিকে তাকিয়ে মনে মনে নানা প্রশ্নের আলোড়নের

মধ্যে অজয় তার বক্তব্যের খেই হারিয়ে ফেলছিল। একটু কেমনতর হয়ে গেছে কেশব। সেই পাঁচ বছর আগে আসামীর কাঠগড়ায় দাঁড়িয়ে যেমন জজের রায় শুনেও ঐ প্রখর চোখের প্রতিজ্ঞা একটুও ঝাপসা হয়নি, আজ যেন সেই চোখে একটা বিসদৃশ অভিমানের ছায়া পড়েছে। পাঁচ বছর পরে কেশব ফিরেছে, আজ সব দিক দিয়ে ফিরে পাওয়ার লগ্ন পূর্ণ হয়ে উঠেছে, তবু কেশবের এই সঙ্কোচ কেন?

অজয় মিছামিছি চেঁচিয়ে উঠলো—কি বললি? অস্বস্তি লাগবে?

কেশব আরও অপ্রস্তুত হয়ে একটু দ্বিধাগ্রস্তভাবে জবাব দিল—হ্যাঁ।

অজয়—অস্বস্তি লাগবার মত কাজ করেছিলে কেন? তখন মনে ছিল না? এখন সে-কথা তুললে চলবে কেন? হাজার অস্বস্তি লাগুক, সব সহ্য করতে হবে। চল।

কেশব চারদিকে একবার যেন সলজ্জ ভয়ে উঁকিঝুঁকি দিয়ে তাকালো।

অজয় বললো—ওরকম করছো কেন? কেউ শুনে ফেলবে, এই ভয় হচ্ছে বুঝি?

কেশব—কেন এত বৃথা চেঁচিয়ে কথা বলছিস অজয়?

অজয়—দরকার বুঝলে দশজনের সামনে চেঁচিয়ে বলবো।

সন্ত্রস্ত হয়ে উঠলো কেশব। অজয়কে বুঝিয়ে বলার মত ভাষা সে খুঁজে পায় না। কি করে বোঝাবে কেশব, আজ আর ওসব কথার কোন অর্থ হয় না। আজ অবশ্য নতুন করে এ-সব কথা বলছে না অজয়, বহুবার বলেছে। তবু আজ সবই কেমন প্রগল্ভ বাচালতার মত মনে হয়, কোন সুর নেই। সবই ফিরে পাওয়া যেতে পারে, কিন্তু এই সুরের শেষ রেশটুকুও বোধ হয় মুছে গেছে, নইলে সে নিশ্চয়ই

সবার আগে তার কাছে একবার আসতো, একটা চোখের দেখাও দিয়ে যেত।

কিন্তু এ কথা অজয় বোঝে না। কি করেই বা বোঝানো যায় যে, যে-মেয়ে কলেজে পড়ছে, কলেজ ছেড়েছে, স্বদেশী মন্ত্রের প্রচারিকা হয়েছে, জানতা ও জনসভার সম্মুখে দাঁড়িয়ে এক নতুন ঝড়ের নিশান দুলিয়ে ফিরছে, তার সঙ্গে আজ কেশব ভট্‌চাযের কি সম্পর্ক থাকতে পারে? অজয় বৃথা চেঁচিয়ে কেশবকে অপ্রস্তুত করে একটু তলিয়ে বুঝতে পারে না। মান্দার গঁয়ের মাটি ও মানুষকে ফিরে পেলেই সব পাওয়া হলো না। ঐ তো সামনেই রয়েছে মান্দার গাঁয়ের সেই বুড়ো অশথ্‌ গাছ, কিন্তু কই সেই ঝুরু ঝুরু হাওয়ার সুর? যতক্ষণ তা না পাওয়া যায়, ততক্ষণ কিছুই পাওয়া হোল না।

অজয় বললো—তাই বলছি, যদি ভাল চাও তো আমার সঙ্গে এস।

কেশব বিমর্ষভাবে বললো—না তুমি যাও, তোমার কাছেই সব কথা শুনবো পরে।

অজয়—আমার যাবার অপেক্ষায় সেখানেও কেউ বসে নেই।

কেশব হাসলো—আমারও অপেক্ষায় কেউ বসে নেই।

অজয়—কি করে জানলে?

কেশব—তুমিই বা কি করে জানলে যে, সত্যিই কেউ অপেক্ষায় বসে আছে?

অজয়—না থেকে পারে না।

অজয় জোর গলায় যেন একটা অবিচল সত্যের সিদ্ধান্ত ঘোষণা করলো, জীবনের কোন ঘটনায় ও ইতিহাসের কোন ওলটপালটের মধ্যেও যেন এই সত্যের নড়চড় হতে পারে না। এ বিষয়ে অজয়ের

কোন সংশয় নেই যে, জনসভার সহস্র ব্যস্ত চক্ষুর মধ্যে অন্ততঃ একজোড়া চোখ মাঝে মাঝে অন্যমনা হয়ে নিকটে ও দূরে ও আশেপাশে কাউকে খুঁজছে, তারই বন্ধু কেশব ভট্‌চাযকে। না খুঁজে পারবে না মাধুরী। নিশ্চয় সে জানে, কেশব জেল থেকে খালাস হয়ে গাঁয়ে ফিরেছে। না জানলেই বা কি? না খুঁজে সে থাকতে পারে না। অজয়ের আজও সে দৃশ্য মনে পড়ে। মীরগঞ্জ থেকে গাঁয়ে ফিরছিলো অজয়, পাঁচ বছর আগে, সেসন জজের আদালতে সেই মামলাব বায় শুনে। সন্ধ্যেবেলা এই দীঘির ঘাটের পথের উপরেই দাঁড়িয়েছিল মাধুরী, আলো হাতে নিয়ে। কেউ সঙ্গে ছিল না। মাধুরীর সেদিনের চেহারাটি আজও অজয় স্পষ্ট মনে করতে পারে। সন্ধ্যার জোনাকীর মতই যেন অন্ধকাবের মধ্যে একা একা ছটফট্ করছিল ঐটুকু মেযে মাধুরী। অজযেব কাছে খবর শুনলো—কেশবের পাঁচ বছরের জেল। চুপ কবে চলে গেল মাধুরী। অজযের আজও স্পষ্ট করেই মনে আছে, গাঁযের পথের সান্ধ্য নিঃশব্দতা মাধুরীব কান্নায কী করুণ হযে উঠেছিল।

নিজের নিজের চিন্তায ডুবেছিল দু'জনে, সমযেব দিকে কারও লক্ষ্য ছিল না। তাই একটু চমকে উঠে দু'জনেই বুঝতে পাবলো—সভা ভঙ্গ হযেছে। সহর্ষে ছোট ছোট জনতা আবাব পথ ধবে এগিযে আসছে। সাঁওতাল নরনারীর দল ঝুমুরের সুরে গান গাইতে গাইতে চলে গেল। গফুরাবাদের মাতবরদের পাল্কী চলে গেল। কালীতলার দিকে ছাত্রদের জয়ধ্বনি শোনা যায। কাকের দল কলরব করে গাছের মাথায় মাথায় উড়ে বেড়ায।

অজয় বিরক্ত হয়ে বললো—বেশ হলো। তোমার জেদ সার্থক হলো।

কেশবের হাত ছেড়ে একটু দূরে সরে দাঁড়ালো অজয়।

কেশব সঙ্গে সঙ্গে এগিয়ে গিয়ে অজয়ের হাতটা জোরে চেপে ধরে দাঁড়িয়ে রইল। বললো—আমার ওপর আর রাগ করতে পারবে না অজয়, খবরদার।

সেই কোন্ কিশোরকালের সৌহার্দ্যের দোহাই আবার যেন হঠাৎ নতুন করে কাগের মতই ছেলেমানুষী ভাষায় ধ্বনিত হলো। এ দোহাই উপেক্ষা করার মত শক্তি নেই অজয়ের।

অজয় বললো—রাগ করতে পারবো না ঠিকই, কিন্তু তুমি আমার কথাটা একটু মন দিয়ে শোন।

কেশব—হ্যাঁ শুনবো।

অজয়—চল মাধুরীদের বাড়ি।

কেশব—ছি ছি। কি অদ্ভুত কথা বলছো।

আবার চুপ করে রইল অজয়। কোথায় যেন কাঁটা বিঁধে আছে কেশবের মনে।

অজয়—তা'হলে বল তুমি মাধুরীর সঙ্গে দেখা করবে না।

কেশব—না।

অজয়—মাধুরীও কি তোমার সঙ্গে দেখা করবে না।

কেশব—সেটা আমি কি করে বলি?

অজয় কিছুক্ষণ সন্দিগ্ধভাবে কেশবের দিকে তাকিয়ে আভাসে যেন একটা তথ্য বুঝে নিল। অজয় বললো—মাধুরীর উচিত তোমার সঙ্গে দেখা করা।

কেশব—উচিত বৈকি।

অজয় হেসে ফেললো—ওঃ, এই কথা। এইজন্যে এত অভিমান।

হাসতে হাসতে কেশবের হাত ছাড়িয়ে অজয় পথ ধরে এগিয়ে গেল। কেশব সেখানেই দাঁড়িয়ে একবার অনুরোধ করলো—শোন্, তুই কথাটা ভালভাবে না বুঝেই…।

না থেমে, যেতে যেতেই অজয় বললো—কাল শুনবো, আজ আমার অনেক কাজ আছে।

সে-রাত্রে সঞ্জীববাবুও মীরগঞ্জ থেকে গাঁয়ে ফিরেছেন। তিনি এখনও ওকালতি ছাড়তে পারেন নি, কিন্তু ছেড়ে দেবেন বোধ হয়। প্রতিবেশীরা দলে দলে এসেছে, সঞ্জীববাবুর মত লোকের মুখে ও স্বকর্ণে এক অদ্ভুত বার্তা শুনে গেছে। ইংরেজের আদালতে আর প্রয়োজন নেই, এবার স্বরাজের আদালত হবে, নতুন করে পঞ্চায়েৎ গড়ে উঠবে। মাসে হাজার রোজগারের লোভ অবহেলায় দূরে ঠেলে দিয়ে, সঞ্জীববাবুর মত বিষয়ী লোকেও আজ এত বিহ্বল হয়ে পড়েছে কিসের জন্য, কোন্ পরম লাভের আশায়? মনে মনে এই প্রশ্নের বিচার ক'রে সন্দেহ আর থাকে না যে; সব দিক্ দিয়ে আজ এক নতুন হাওয়া বইতে সুরু করেছে। একটা নতুন পরিণাম এগিয়ে আসছে। আর চুপ করে বসে থাকার উপায় নেই। চুপ করে বসে থাকাও সুবুদ্ধির কাজ হবে না। যারা সাড়া দেবে, তারাই এই নতুন হাওয়ার বেগে এগিয়ে যাবে। যারা সাড়া দেবে না, তারা ভেঙে পড়বে, তারা আর উঠতে পারবে না।

ইংরেজী স্কুলের ছেলেরা এসে নিঃসংশয় হয়ে গেল, কাল থেকেই নতুন করে তোড়জোড় করতে হবে, জাতীয় বিদ্যাপীঠের প্রতিষ্ঠা হবে। সঞ্জীববাবু পাঁচশো টাকা দেবেন, প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন।

স্কুলের ছেলেরা মাধুরীর সঙ্গে আলোচনা করলো—নতুন জাতীয় বিদ্যা-

পীঠের শিক্ষক কে হবেন ? শুধু ছাত্র নিয়েই স্কুল হবে না, শিক্ষক চাই। দিনমণি বিশ্বাসের ষড়যন্ত্রে কোন শিক্ষক সাড়া দেবে না। জাতীয় বিদ্যা--পীঠের জন্য উপযুক্ত শিক্ষক চাই।

মাধুরী বললো—আপাততঃ পড়াবার মত একজন আছে, কেউ না আসে সে একাই কাজ আরম্ভ করে দেবে।

ছাত্রেরা কিছুক্ষণ কৌতূহল চাপা দিয়ে চুপ করে রইল। আভাসে তারা যেন খানিকটা বুঝতে পেরেছে, কে এই একা একজন। তাঁর নামে অনেকদিন থেকে অনেক কাহিনী শুনেছে তারা, তাঁকে অনেকদিন আগেই তারা দেখেছে, আজও তাঁকে মনে পড়ে। শোনা যাচ্ছে, সেই মাস্টার-মশায় নাকি ফিরে এসেছেন, আবার পাঁচ বছর পরে।

ছাত্রদের কৌতূহল আর প্রশ্নের জবাব দিয়ে মাধুরী বললো—আপাততঃ আমিই পড়াবো।

ছাত্রেরা মনে মনে অপ্রস্তুত হয়ে পড়লো। তাদের অনুমান সত্য হলো না। তবু ভালো, তবু নিঃসন্দেহে এটা অনেক গর্বের বিষয় যে মাধুরীদি পড়াবেন। এবারে নতুনের চেয়েও নতুন এই প্রস্তাব। কী মোহ, কী সুন্দর রূপ নিয়ে আসছে তাদের নতুন জাতীয় বিদ্যাপীঠ। ছেলেদের আনন্দ আর হর্ষের সীমা ছিল না।

প্রতিবেশীরা চলে গেল, ছাত্রেরা চলে গেল। সমস্ত দিনের উত্তেজনার পর্ব যেন এতক্ষণে শান্ত হলো। এতক্ষণ পরে মাধুরী বুঝতে পারলো, শুধু শরীরটা নয়, তার মনটাও কত ক্লান্ত হয়েছে। এতক্ষণে গাঁয়ের বাড়ির শান্তি যেন একটা জ্বরের বিকারের মধ্যে লুপ্ত হয়েছিল। ধীরে ধীরে ঝিঁঝিঁর ডাকের সুরে এক পরিচিত স্তব্ধতার আস্বাদ আবার চার দিক থেকে সত্য হয়ে উঠেছে। হঠাৎ মনে হয়, আজকের সারাদিনের চাঞ্চল্য

আর উত্তেজনা যেন একটা অভিনয়ের মত পার হয়ে গেছে। যেন মিছা-মিছি অনেক কথা জোর করে চেঁচিয়ে বলা হয়েছে, একটু নির্লজ্জ হয়েই অনেক কিছু করা হয়েছে। এতটা না হলেই ভাল ছিল।

কিন্তু এতটা লজ্জিত হবার কোন কারণ নেই মাধুরীর। কেউ তাকে আজ প্রশ্ন করবে না, কেউ ত্রুটি ধরবে না, কেউ তার ভুল ধরিয়ে দিতে আসবে না। সবাই মুগ্ধ হয়ে গেছে। সারা মান্দার গাঁয়ের লোক শতমুখে প্রশংসা করছে। মাধুরীকে উপদেশ দেবার মত লোক আজ আর মান্দার গাঁয়ে কেউ নেই, সবাই তারই উপদেশ শুনছে। মাধুরীর স্বদেশীপনার দিকে ভ্রূকুটি করে আসবার মত দুঃসাহস রাখে, এমন কোন লোক নেই। সমালোচনা করার মত সাহস রাখে, এমন কেউ নেই। কাজেই কোন সঙ্কোচের কারণ নেই মাধুরীর। দ্বিধা করা, সঙ্কোচ করার কোন প্রশ্ন আসে না। তার জীবনে হঠাৎ এক নতুন অধ্যায়ের পাতা খুলে গেছে। সঞ্জীব চাটুয্যের মেয়ে বলে, তার ব্যক্তিত্ব আজ আর কোন গৃহকোণে বা পাড়ার পথে আবদ্ধ নয়। অফুরন্ত সুযোগে, অবাধ অভিনন্দনে আর সম্ভ্রমে আজ তারই কাছে হাজার মানুষের কাজের পথ দেখাবার দায় চলে এসেছে।

মাধুরী নিজেই আশ্চর্য হয়, পাঁচ বছর আগে সে কল্পনাও করতে পারেনি, জীবনের পথ এভাবে সমতল ছেড়ে এক বিচিত্র আদর্শের খাড়াই ধরে পাহাড়ের দিকে এগিয়ে যাবে উঁচু হয়ে। বোধ হয় অনেক দূর এগিয়ে এসেছে মাধুরী, তাই একটু ভয় হয়। এ শুধু ওঠার পথ, এ পথে নামবার কোন নিয়ম নেই, সুযোগ নেই। ভুল করলে, দ্বিধা করলে, ফিরে তাকালে শুধু পতনের ভয়টাই সুনিশ্চিত। কিন্তু পাঁচ বছর আগে···।

বাইরের বারান্দায় সঞ্জীববাবুর সঙ্গে একটি পরিচিত গলার স্বরের আওয়াজে সত্যিই ভয় পেয়ে চম্‌কে উঠলো মাধুরী। অজয়দার গলার স্বর। আজকের রাতের অন্ধকার এক পাশে সরিয়ে রেখে পাঁচ বছর আগের ঘটনাগুলির দূত হয়ে যেন অজয়দার মূর্তিটা পৌঁছে গেছে। মাধুরী শুনছিল, অজয়দা তেমনি আগের মত হেসে হেসে চেঁচিয়ে কথা বলছেন। একটুও পরিবর্তন হয়নি। পাঁচ বৎসরের মধ্যে সঞ্জীববাবু কত বড়লোক হয়ে গেছেন, সে খবরও যেন রাখে না অজয়দা। বোধ হয় কোন খবরই রাখেন না। নইলে এত নিঃসঙ্কোচে ঠিক পাঁচ বছর আগের সাহস, সজীবতা আর অধিকার নিযে আজ আলাপ করতে পারতেন না। সমস্ত ব্যাপারটা কেবল বিসদৃশ মনে হয়। জীবনে কোন ব্যতিক্রমকে গাঁয়ের লোকেরা যেন মানতে চায না। কেমন একটা অন্ধ মোহ নিযে, মনের জিদের নেশায় অতীতের সত্যকে আঁকড়ে ধরে এরা কেমন একটু অদ্ভুত রকমের কঠিন ও অটুট হয়ে থাকে। আজ যা ভুলে যাওয়া উচিত, বার বার যেন অতীতের দেহাই আর সাক্ষ্য দিযে এরা স্মরণ করিযে দেয যে—না, ভুল যাওয়া উচিত নয।'

হঠাৎ মাধুরীর মনে হয়, গাঁয়ে ফিরে আসাই তার ভুল হয়েছে।

সঞ্জীববাবু ডাক দিলেন—এদিকে একবার এস মাধুরী।

কিছুক্ষণ চুপ হয়ে থেকে মাধুরী যেন মনে মনে তার ক্ষণিকের বিভ্রান্তি ও বিচলতাকে অহংকারের জোরে শান্ত করে নিল। সঙ্কোচ করে কোন লাভ নেই। ভয পাবার কোন দরকার পড়ে না। সে এগিযে যাবে, অজয়দার সামনে দাঁড়াবে, প্রতিটি প্রশ্নের তেমনি করে উত্তর দেবে। অজয়দা বুঝবে, পাঁচ বছরের ঘটনায় একেবারে বদলে যাওয়া নতুন একটি মেয়ের সঙ্গে তিনি আজ আলাপ করছেন। এত হেসে হেসে চেঁচিয়ে

কথা বলার অন্তরঙ্গতা আজ ঠিক আর খাপ খায় না। এই সত্য যদি অজয়দা না বুঝে থাকে, তবে আজ বুঝে যেতে হবে।

মাধুরী এগিয়ে যেতেই অজয় চেঁচিয়ে অভিনন্দন জানালো—এই যে, কেমন আছ? কী ভয়ঙ্কর লীডার হয়ে গেছ।

সেই মুহূর্তে মনে মনে ছোট হয়ে, যেন মাথা হেঁট করে দাঁড়িয়ে রইল মাধুরী। অজয়দার কথার প্রতিধ্বনিতে পাঁচ বছরের ঘটনায় মনে নতুনত্বের উচ্ছ্বাস যেন হঠাৎ চাপা পড়ে গেল। মাধুরীকে টেনে এনে দাঁড় করিয়ে দিল, পাঁচ বছর আগের এক সন্ধ্যায় দীঘির ঘাটের পথে।

অজয় বললো—শুনেছ বোধ হয়, কেশব জেল থেকে ছাড়া পেয়েছে। সঞ্জীববাবু একটু ব্যস্ত হয়ে উঠলেন—কেশব ছাড়া পেয়েছে? কবে?

অজয়—এই তো ক'দিন হলো?

সঞ্জীববাবু—কেমন আছে কেশব?

অজয়—ভাল আছে। ঠিক সেই রকমই আছে। আপনি তো ওকে ভাল করেই চেনেন ও চিরকাল ভালই থাকবে। অদ্ভুত মানুষ ঠিক তেমনি স্ফুর্তি হাসি আর উৎসাহ। ঠিক তেমনি সাহস।

সঞ্জীববাবু একটু গম্ভীর হয়ে বললেন—হুঁ।

অজয় বললে—আচ্ছা, আমি উঠি এবার।

পরমুহূর্তে মাধুরীর দিকে একবার তাকালো অজয়। এই ইঙ্গিতের অর্থ বুঝতে দেরি হয়নি মাধুরীর। লণ্ঠনটা হাতে তুলে নিয়ে অজয়ের সঙ্গে বারান্দা থেকে কিছু দূর এগিয়ে এল মাধুরী।

অজয় বললো—কেশব ভাল নেই মাধুরী।

মাধুরী কোন উত্তর দিল না।

অজয—কি রকম যেন হযে গেছে। ওব মুখের দিকে তাকাতে পাবি না।

মাধুরী দাঁড়িযে পড়লো।

অজয—তোমার কাছেই কথাটা জানতে এসেছিলাম। কেশবেব সঙ্গে তোমাব একবার দেখা করা উচিত।

অনেক চেষ্টা করেও কোন কথাব উত্তব দিতে পাবলো না মাধুরী। তাব পাঁচ বছবেব শহুবে শিক্ষাদীক্ষাব গর্ব যেন হঠাৎ ব্যর্থ হযে গেল। আজ অজযদাব অনুবোধেব উত্তবে যা বলা উচিত ছিল, তার একটিও বলা হলো না। শুধু অজয চলে যাওযাব পব মাধুবী বুঝতে পারলো, তাব সঙ্কোচেব ভুলে কী ভযানক একটা পবাভব ক্ষণিকেব জন্য সে স্বীকার কবে নিল। একেবাবে ভুল বুঝে, এক অসম্ভবেব আশ্বাস নিযে অজযদা চলে গেল।

অকাবণে ঘব আব বাবান্দাব চাব দিকে ছটফট কবে ঘুবে বেডাচ্ছিলো মাধুবী। সঞ্জীববাবু বাব বাব জিজ্ঞেস কবছিলেন—কাল কি প্রোগ্রাম আছে মাধুবী ?

গুছিযে কোন উত্তব দিতে পাবছিল না মাধুবী। কালকেব প্রোগ্রামেব যেন শেষ নেই, স্বরূপ নেই। পিকেটিং হবে আফিমেব দোকানে, জাতীয বিদ্যাপীঠেব প্রতিষ্ঠা হবে, চবকা বিলি হবে। আবাব জনসভা হবে। আবাব গান, পতাকা-বন্দনা আব বিলিতী বস্ত্রেব বহ্ন্যুৎসব। যেন অনন্তকাল এই প্রোগ্রাম চলবে। তাবপব কি আছে বা কি হবে, মাধুবী তা জানে না। তাব পবেব কথা ভাববাব মত শক্তি নেই তাব। মাধুবী শুধু জানে, এই বিচিত্র কাজেব চাঞ্চল্য মদিবতা আব মুক্তিব প্রতিধ্বনিময এক পথেব ওপর সে তাব সত্তাকে কোন এক আবেগের

লগ্নে ছেড়ে দিয়েছে, এখন শুধু তাকে চলতে হবে। থামতে বা ফিরে যেতে তার আর সাধ্য নেই।

এতটা উতলা হবার কি কারণ ছিল মাধুরীর? ক্ষণে ক্ষণে থেমে যাবার, ফিরে যাবার কথা মনে জাগে কেন? একা পথ চলার এই উদ্দীপনার মধ্যে বৃথা কেন অবসন্নতার ইঙ্গিত অলক্ষ্যে ভেসে আসে?

সকল জয়ধ্বনির পুরোভাগে দাঁড়িয়ে তবু রিক্ততার রেহাই পায় না, এ মনস্তত্ত্বের কোন মীমাংসা পায় না মাধুরী। শুধু এক একবার মনে হয় জীবনের যে কোন কাজের পথে একা চলার মধ্যেই রিক্ততার অভিশাপ আছে। সকল তৃপ্তি উৎসাহ আর বিশ্বাসের ঐশ্বর্যে মন ভরে উঠতে পারে, যদি এই পথচলার আগে আগে একটি শ্রদ্ধেয় মূর্তি পথ দেখিয়ে চলে, হৃদয়ের সকল নিষ্ঠা দিয়ে যাকে উপাসনা করতে পারা যায়; সকল ভাবনা করার দায় সঁপে দেওয়া যায়; নিজেকে আর কষ্ট করে কিছু ভাবতে হয় না, বিচার করতে হয় না, নিশ্চিন্ত বিশ্বাসে শুধু তারই পেছনে সারা জীবন ধরে চলা যায়—এমন একটি নায়কের মূর্তিকে আজ আবাহন করতে ইচ্ছে করে।

শুধু ইচ্ছে করে, তা নয়। মাধুরীর মনের পাঁচ বছরের সংস্কারেব গর্ব চূর্ণ হয়ে যায়। মাধুরী সেই মূর্তিকে তার মনের অগোচরের একান্তে আজ আবার আবিষ্কার করতে পারে। সে আজও রয়েছে। পাঁচ বছর ধরে নির্বাসনের আড়ালেও সে নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়নি। সে আবার ফিরে এসেছে। এই মাত্র অজয়দা বলে গেলেন, সে নাকি ঠিক তেমনিই আছে, তেমনই উৎসাহী হাসিখুশি ও দুঃসাহসী। সে চিরকাল এমনিই ভাল থাকবে, চিরকালের ভাল দিয়ে তার অদৃষ্ট গড়া। তার তুলনা হয় না।

মাধুরীর মনের দুর্বলতা ছাপিয়ে সকল স্মৃতির অভিমান প্রগল্‌ভ হয়ে

ওঠে। আর্য পাঠশালাব অঙ্গিনায সাব বেঁধে দাঁড়িযে নামতা পড়ার গুঞ্জবণেব মধ্যে সেই কিশোব গুরুর মূর্তি আজও স্পষ্ট হযে ওঠে। সকল খেলাধূলায, মেলায, উৎসবে ও দীপালীতে তারই ইঙ্গিতে ও অনুশাসনে, কানে কানে বলা শত কথাব পুলক একদিন যে কাহিনীকে সত্য কবে তুলেছিল, তাব আবেদন যেন নহাৎ লুকোচুবি খেলার ছলে কোথাও দূবে সরেছিল। সমযেব ব্যবধানে, অদেখার অবহেলার মধ্যেও সেই অর্বাচীন দিনেব সত্য-মিথ্যা আজও এত প্রখর হযে বেঁচে থাকবে, এ-ধাবণা মাধুবী কবতে পাবে নি। কিন্তু আবাব হাব মানতে হয। মান্দাব গাঁযেব আলো-বাতাস যেন প্রতিশোধ নেবাব জন্য তৈবী হয়ে উঠছে। নইলে, ঠিক সময বুঝে আজ তার নির্বাসনেব পালা শেষ হব কেন ?

সঞ্জীববাবুব ডাকাডাকিব উপদ্রবে মাধুরী কিছুক্ষণের জন্য আন্মনা আবেশ থেকে মুক্ত হযে আবাব কাজেব ব্যস্ততাব মধ্যে ছুটাছুটি করে বেড়ালো।

সঞ্জীববাবু এক কাপ চা খাবাব জন্য তাগিদ দিচ্ছিলেন। একটা কাজেব অবলম্বন পেযে আধ ঘণ্টাব মত তবু এই তীব্র চিন্তার বেদনা থেকে একটা বেহাই পেল মাধুবী।

তাবপব ? আব কোন কাজ না পেলে আবাব বিপদে পড়তে হবে। মনে হয চিন্তাগুলি আশেপাশেই, এই ঘরেব আনাচেকানাচে গা-ঢাকা দিযেছে। একটু স্থিব হযে বসলেই, এক বিভ্রান্তিব জ্বালা ছড়িযে তাবা আবাব দেখা দেবে। সারাদিনেব এই অভিনযেব উন্মাদনার পব একটু ঘুমেব শান্তিও দুরাশা হযে উঠবে। আজকেব মত যেন আব তাকে ভাবতে না হয। কাল আবাব কেটে যাবে। আবার কাজের প্রোগ্রাম শত

জয়ধ্বনির মধ্যে সহর্ষে দেখা দেবে। অজয়দার ভয়াবহ অনুরোধ আবার সেই হর্ষের বেগে দূরে সরে যাবে।

ঘরের ভেতর চাকরটার দিকে নজর পড়লো মাধুরীর। মনটা খুশি হয়ে উঠলো। ওর মধ্যে একটা শান্তির মন্ত্র আছে, সকল ভ্রান্তি ও উত্তেজনার মধ্যে এক পরম প্রসন্ন আশ্রয়। গান্ধীজী বলেছেন, এই ক্ষুদ্র যন্ত্র চরকা তোমার ধ্যানের সাথী। সকল বিকার বন্ধ হবে, সকল ধাঁধা ঘুচে যাবে, মনের অন্ধকারে জ্যোতি ফুটে উঠবে—ঐ চরকায় একবার হাত দাও। সকল অনুতাপ থেকে মুক্ত হবে, সকল গ্লানির আবরণ ঘুচে যাবে, চরকার গুঞ্জরণের ছন্দে তোমার চিন্তাকে সঁপে দাও।

হাত মুখ ধুয়ে, কাপড় ছেড়ে, চরকাটাকে আন্তরিক আগ্রহে কাছে টেনে নিল মাধুরী।

পাশের ঘর থেকে সঞ্জীববাবু একবার বিরক্ত হয়ে অনুযোগ করলেন—আবার এত রাতে চরকা নিয়ে পড়লি কেন মাধুরী? সারাদিন হইচই করে তবু তোর একটু ক্লান্তি আসছে না, আশ্চর্য!

মাধুরী উত্তর দিল—বেশিক্ষণ নয়, এক্ষুনি রেখে দেব। কিছু ভাল লাগছে না।

সঞ্জীববাবু সাগ্রহে জিজ্ঞেস করলেন—কেন রে?

মাধুরীর কথা শুনে যেন একটু চমকে উঠেছেন সঞ্জীববাবু, তাঁর গলার স্বরে সেই রকম একটা চাপা আতঙ্কের ধ্বনি মিশিয়েছিল।

মাধুরী নিজেই লজ্জিত হয়ে আর কোন উত্তর দিতে পারলো না। সঞ্জীববাবুর ব্যাকুল প্রশ্নের সাড়াও চাপা পড়ে গেল চরকার একটানা ঘর্‌ঘর্‌ শব্দের উচ্ছ্বাসে।

কতক্ষণ ধরে চরকা চালিয়েছে, সেই হিসাব জানে না মাধুরী। মনটা

বেশ লঘু হয়ে গেছে। গভীর রাত্রি সারা মান্দার গাঁকে ঘুম পাড়িয়ে রেখেছে। মাধুরীর মনে পড়লো, আজ এক্ষুনি চিঠিটা শেষ করে রাখা উচিত, নইলে আবার এক সপ্তাহের মধ্যে বিলেতের ডাক পাওয়া যাবে না। এক মাস আগে এসেছে তার চিঠি, আজও নানা কাজের চাপে চিঠির উত্তর দেওয়া হয়নি। মনে মনে যেন ক্ষমা প্রার্থনা করলো মাধুরী।

সব কথা আজ তাকে খুলে লিখতে হবে। কেন কলেজ ছেড়ে দিলাম, বার বার এই প্রশ্ন করে সে লিখেছে। বার বাব এই প্রশ্নের উত্তর এড়িয়ে গেছে মাধুরী। আজ আর সঙ্কোচ করে লাভ নেই। দেবুদা বিলেত থেকে ফিবে আসবে আর এক বছরেব মধ্যে, কিন্তু তার ফিরে আসতে আবও তিন বছব। সেই প্রবাসী হৃদযেব শূন্যতাকে সান্ত্বনায ভরে বাখার কাজে যেন কোন ত্রুটি না আসে। সময মত চিঠি দেওযা উচিত। অতীতেব কোন প্রতিজ্ঞাব মুখ চেযে তার বর্তমানের সব চেযে সজীব সত্যকে সে অস্বীকার কবতে পারে না। যে আশ্বাস নিযে পরিতোষ বিলেত চলে গেছে, সেই আশ্বাস নিযেই সে ফিরে আসবে। তার এক তিল ব্যতিক্রম কববার পাপ যেন মাধুবীকে অর্জন করতে না হয়। নিভযে নিবাপদে সে আবার ফিবে আসুক, হোক্ না তিন বছর দেরি, তাতে কিছু আসে যায না। শুধু সে যেন বদলে না যায। জীবনের সাথীরূপেই তাকে যেন আবাব ফিবে পাওযা যায।

নিজেকে ঠকাতে চায না মাধুবী। আজ মাধুবী মর্মে মর্মে বুঝতে পাবে, তাব জীবনেব পথে গুরুব চেযে সাথীব দবকাব সব চেযে বড়। গুরু না হলেও চলতে পারে, সাথী ছাড়া চলতে পারে না, জীবনে প্রথম যাকে সাথীত্বে ববণ কবে নিযেছে সে তার বিশ্বাসের দুযারে কোন অপমান যেন না পৌছায।

দোয়াত ও কলম নিয়ে চিঠি লিখতে বসলো মাধুরী। আজ প্রাণমন দিয়ে সে তার নূতনকেই আপন করে ধরে রাখতে চায়। পিছিয়ে যাবার সামর্থ্য তার নেই। অতীত তার কৃতঘ্নতার দিকে তাকিয়ে অভিশাপ দিক, শান্ত মনে সকলই সহ্য করবে মাধুরী। কিন্তু বর্তমানের চোখের জল সে সইতে পারবে না।

বিদায় দেবার আগের দিন তার শেষ চোখের জল মাধুরী নিজের হাতেই মুছে দিয়েছিল। দেবু আর পরিতোষের বিলেত যাত্রার পথে বোম্বাই পর্যন্ত সঞ্জীববাবু গিয়েছিলেন, মাধুরীও গিয়েছিল। জাহাজ ছাড়ার আগের দিন এলিফ্যাণ্টা দ্বীপে বেড়াতে গিয়েছিল সবাই মিলে। কি মোহময় আবেশে, চাঞ্চল্যে, পুলকে ও বেদনায় সারা দিনটা কেটে গিয়েছিল।

পরিতোষ আর মাধুরী দু'জনে চুপ করে বসেছিল বড় গুহার বিরাট মূর্তিটার পায়ের নীচে। ত্র্যম্বক সদাশিব মূর্তি। কী বিরাট সান্ত্বনার আশ্বাস ভরে আছে সদাশিবের সুগম্ভীর মুখচ্ছবির মধ্যে। নিখিলের কল্যাণের ভার নিয়ে সদাশিব জাগ্রত প্রহরীর মত বসে আছেন, তাকিয়ে আছেন সম্মুখের আরব সমুদ্রের দিকে। এই সমুদ্রের জলে কাল সকালে পরিতোষের জাহাজ ভেসে চলে যাবে। কিন্তু সদাশিবের চক্ষে সেই আশ্বাস আছে, কাল যে চলে যাবে, চার বছর পরে তিনিই তাকে সকল দুঃখ বিপদ থেকে বাঁচিয়ে দেশের মাটিতে ফিরিয়ে আনবেন। কিছু ভয় করার নেই মাধুরীর। মাধুরী পরিতোষের চোখের জল নিজের হাতে মুছে দিয়েছিল।

পুরনো কথা ভাবতে গিয়ে কিছুক্ষণ চিঠি লেখা বন্ধ ছিল মাধুরীর। কিন্তু আর দেরি করা উচিত নয়, রাত অনেক হয়েছে। সঞ্জীববাবু জানতে পারলে ধমক দেবেন।

তাড়াতাড়ি চিঠিটা শেষ করলো মাধুরী।

সূর্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে মান্দার গাঁয়ের প্রাণ এক বিচিত্র উন্মাদনার হর্ষ ও কলরবের মধ্যে জেগে উঠলো। দূরে ও নিকটে নানা সুরের জয়ধ্বনি শোনা যায়। তার প্রতিধ্বনি গুম্‌রে ওঠে চারিদিকে। তরুবীথিকার শীর্ষ ছাপিয়ে সেই শব্দের উচ্ছ্বাস আকাশের পথে ছড়িয়ে পড়ে। এক অভিনব উৎসবের রূপে শত যুগের সঞ্চিত আগ্রহ যেন এক পবিত্র সুযোগের লগ্নে বর্ণে শব্দে ও চাঞ্চল্যে আত্মপ্রকাশ করেছে। শুধু মান্দার গাঁ নয়, ক্রোশ ক্রোশ দূরের গাঁ বস্তি ও ডিহির প্রাণে প্রাণে একই সুরের সাড়া জেগেছে, ঠিক একই মুহূর্তে। দূর গফুরাবাদের মাঠে চাষীদের জনতা, দূর মস্তরবাড়ির শালবনে ঘেরা ডিহিতে সাঁওতাল নরনারীর মেলা, জেলা বোর্ডের সড়কে বড় বড় গাছের মাথায় এক একটি জাতীয় পতাকা ত্রিবর্ণের বৈভবে আকুল হয়ে উড়ছে। মান্দার গাঁয়ের কালীতলার প্রাঙ্গণে ছাত্রদের সভা বসে গেছে, সেখান থেকে সদলবলে তারা রওনা হবে এই মুহূর্তে, দক্ষিণ কুঠির পতিত মাঠের দিকে। সব আয়োজন পূর্ণ, জাতীয় বিদ্যাপীঠের প্রতিষ্ঠা হবে সেইখানে।

শেষরাত্রির অন্ধকার প্রভাতফেরীর গানের আলোড়নে যেন ভেসে চলে গেছে দূর দিগ্‌বলয়ের দিকে। আর এই অন্ধকার ফিরে আসবে না, সেই সঙ্গে মান্দার গাঁয়ের শত বছরের ভীরুতা যেন দূরে পালিয়ে গেছে।

জেলা বোর্ডের সড়কের দিকে তাকালে দেখা যায়, বিচিত্র এক একটি জনতার অভিযান চলেছে। কোন্ দিকে যায়, কেন, কি উদ্দেশ্যে কিছু বোঝা যায় না। শুধু মনে হয়, সবাই যেন নিজের নিজের অন্তরের ইঙ্গিতে কর্তব্যের দিশা পেয়ে গেছে। সবাই ছুটেছে। বক্ষে সাহস, চক্ষে উৎসাহ

আর সারা মুখে নিঃশঙ্ক প্রতিজ্ঞার দীপ্তি নিয়ে তারা চলেছে এক কীর্তির প্রেরণায়।

এরই মধ্যে খবর এসে গেছে, গফুরাবাদের মাঠে এক খণ্ডবিপ্লবের আগুন জ্বলে উঠেছে। সাত শো লাঙল নিয়ে চাষীরা নেমে পড়েছে বিশ বিঘা আন্দাজ এক পড়ো মাঠের উপর। কেউ তাদের শিখিয়ে দেয়নি, তবু চাষীরা বুঝে ফেলেছে, সেই চিরকেলে ইতিহাসের সত্যকে, এ জমি তাদেরই জমি। এত উর্বর সুফলা মাটির ক্ষেতকে অনাবাদী করে রাখার অধিকার নেই জমিদারের। জমি ভগবানের জিনিস। সবারই তার উপর সমান অধিকার। পৃথিবীতে যখন বৃষ্টিদার, আলোদার, রৌদ্রদার ও হাওয়াদার নামে কোন বাবুর দল নেই, তখন জমিদার কেন হবে? জমিকে অনাবাদী করে রাখা পাপ, এ-পাপ তারা দূর করবে, এ-জমি তারা চাষ করবেই।

লাঠি হাতে জমিদারের পাইক আর দারোযানেরা দাঁড়িযেছিল মাঠের সীমানা আগলে। কোন ভ্রূক্ষেপ না করে চাষীরা লাঙল নিযে মাঠে নেমে পড়েছে।

মাত্‌বর মালিক মিঞা হাতযোড় করে জমিদারের সরকারকে জানিয়ে দিয়েছে—রাজাবাবুকে আমাদের আরজি জানিয়ে দেবেন সরকার মশাই, হয় তিনি নিজে এ-জমি চাষ করুন, নয় আমাদের চাষ করতে দিন। এ-জমি তো পড়েই রযেছে, আমরা যদি চাষ করি, তবে রাজাবাবুর কোন ক্ষতি নেই।

সরকার মশাই প্রশ্ন করলেন—খাজনা?

মালিক মিঞা উত্তর দিল—আমাদের সেলাম জানাবেন রাজাবাবুকে, এই আমাদের খাজনা। এর বেশি কিছু এখন বলতে পারি না।

ছোট একটি টাট্টু-ঘোড়ায় চড়ে তড়বড়িয়ে একটি লোক মান্দার গাঁয়ের ভেতর ঢুকলো। এ-পাড়া ও-পাড়া ঘুরে, কি এক গোপন বার্তা শুনিয়ে চলে গেল।

আজ সকাল থেকে এইভাবে নানা গ্রাম থেকে এক একটি বার্তা দৌড়ে দৌড়ে ছুটে আসছে মান্দার গাঁযে। আবার দৌড়ে চলে যাচ্ছে।

মস্তরবাড়ির সাঁওতালদের খবর চলে এসেছে এরই মধ্যে। শালবনের ধারে টাঙ হাতে শত শত সাঁওতাল দাঁড়িয়েছে। আজ আর কোন নিষেধ শুনে পিছিয়ে যাবার কথা তারা ভাবে না। কোন ফরেস্ট গার্ডের মূর্তি তাদের আর সন্ত্রস্ত করে না। এই জঙ্গলের শাল মহুয়ার ছায়া আর ডাল-পালার মালিক আবার কে? এর মালিক ধরিত্রী। সেই ধরিত্রীর দান বন্ধ করবে কেন রেঞ্জার সাহেব? কেন খাজনা চাইবে? কেন এক বোঝা শুকনো কাঠ কুড়োতে লাইসেন্স নিতে হবে? কি অদ্ভুত বিধি!

না, আজ আর সেদিন নেই। কত লক্ষ বছর ধরে তারা এই বনের আগুনে নেচে গেয়ে পূজো করেছে। সেই যখন আকাশ মেঘে ঢাকা ছিল, সূর্য দেখা দিত না, তখন থেকেই বোঙ্গার আশীর্বাদে বনের আগুনে তাদের শীত দূর হযেছে, পথের কাঁটা পুড়ে ছাই হয়ে গেছে।

সাঁওতালেরা দলে দলে বিজার্ভ জঙ্গলে কাঠ কাটছিল, মেয়েরা গান গাইছিল। নতুন এক জাতীয় উৎসবের পুলকে তাদের সারা অন্তর উথলে পড়ছিল। ফরেস্ট গার্ডেরা চুপ করে দূরে দাঁড়িয়ে দেখছিল এই উৎসব।

আম বাগান পার হয়েই জেলা বোর্ডের সড়কের মোড়ে সাত-আটটা গরুর গাড়িকে আটক করে দাঁড়িয়েছিল একটি জনতা। সংখ্যায় প্রায় সাত শত। স্বতন্ত্র ভারত কি জয়! মহাত্মা গান্ধী কি জয! সাত শত

কণ্ঠের গভীর নির্ঘোষে এক নতুন সংগ্রামের বাণী মান্দার গাঁয়ের বুকে প্রকম্প সৃষ্টি করছিল। এই সংগ্রামের বর্ণ-শব্দ-রূপ সবই অভিনব। লাঠির আস্ফালন নেই, দন্তঘর্ষণ নেই, রুদ্র কটাক্ষ নেই—এক রূঢ়তাহীন গঞ্জনাহীন, নিরভিশাপ সংগ্রাম। কোন অমঙ্গলের পসরাকে আজ গাঁয়ের পথে ঢুকতে দেওয়া হবে না। বাধা আজ দিতেই হবে। বহু যুগ ধরে, নেহাৎ তাদেরই আলস্যের পাপে, গাঁয়ের নির্বাধ পথে বহু পাপ ঢুকে পড়েছে। বিলিতী লবণে বোঝাই এই সাতটি গরুর গাড়িকে আজ আর সেই সুযোগ দেওয়া চলে না। সাত শত জনতা গরুর গাড়িব পথরোধ করে দাঁড়িয়েছিল।

গাড়োয়ানদের চীৎকারে আর লবণের মালিক সাহু মহাজনের ধিক্কারে বৃথা সকালবেলার বাতাস অপরিচ্ছন্ন হযে উঠছিল। বেলা বাড়ছিল, রোদের তাপে জনতার মুখ ঝলসে উঠছিল।

এক সাহু মহাজন হঠাৎ গাড়ি থেকে নেমে লাঠি তুলে সামনের লোকটির মাথায সরোষে একটি আঘাত জমিবে দিল। একজন ভলান্টিয়ার আর দু'চারজনে মিলে আহত লোকটিকে তুলে নিযে গাছতলায় শুইযে দিল।

কযেকটি মুহূর্তের মত জনতা শুধু স্তব্ধ হযে দাঁড়িযে রইল। এক নিদারুণ ভ্রান্তি হিংসার রূপে মুহূর্তের মত তাদেব চিন্তা ও কর্তব্যকে পথ ভুলিয়ে দেখার ছলনা নিযে দেখা দিল। সাতটি গাড়োযানের মূর্তির দিকে জনতা একদৃষ্টি দিয়ে তাকিযেছিল।

কিন্তু ভলান্টিয়ার ছেলেটি জযধ্বনি করলো—সত্যাগ্রহ কি জয়!

জনতার মুখশ্রী মুহূর্তের মধ্যে বদলে গেল। জেলা বোর্ডেব সড়কের ধূলোয শত শত মানুষের শরীর লুটিযে শুযে রইল। বিলিতী লবণের

গাড়ি যদি গাঁয়ে ঢুকতে চায়, ঢুকুক্, তাদের বুকের ওপর দিয়ে চলে যাক্। চাকার দাগ পড়ুক্ তাদের পাঁজরে।

সারা গাঁয়ের মাটির আড়ালে যেন এই ঘটনা আর দৃশ্যগুলি বীজের মত লুকিয়ে ছিল শত যুগ ধরে। এই হর্ষ, এই নির্ভয়, এই শক্তি। আইন আদালত পুলিশ—যে যেখানে ছিল, আজও সবই অটুট আছে। কিন্তু গ্রামের জনতার মনের মধ্যে তারা আজ বাতিল হয়ে গেছে। আজ শুধু ভয়ভাঙার পালা। ভয়ই জীবনের পথে সব চেয়ে বড় বোঝা। এই ভয় ভাঙতেও কত আনন্দ!

মান্দার গাঁয়ের দিঘীর ঘাটের কিনারায় আবার বহ্ন্যুৎসব জেগেছে। প্রতি ঘর থেকে ভাঙা কুলোয় ভরে ভরে যত বিলিতী আবর্জনা আর কাপড় এনে স্তূপাকার করা হয়েছে। ইউনিয়ন বোর্ডের প্রেসিডেণ্ট ভূদেব চাটুয্যে আর হেড-মাস্টার দিনমণি বিশ্বেস চলে গেছেন সদরে।

ঘুম ভাঙতে একটু দেরি হয়েছিল মাধুরীর। সঞ্জীববাবু বললেন—চারদিকে একটা হাঙ্গামা বেধেছে মনে হচ্ছে।

মাধুরী ব্যস্ত হয়ে বললো—আমি যাই।

বেশি দূর যেতে হয়নি মাধুরীর। কালীতলা পার হয়ে দক্ষিণ কুঠির দিকে যেতে যেতে কোন হাঙ্গামার চিহ্ন দেখলো না মাধুরী। শুধু এক একটা গাছের মাথায় জাতীয় পতাকা দুলছে। বড় বড় গাছের বাকলের ওপর খড়ি দিয়ে স্বাধীন ভারতের আহ্বান মন্ত্র লেখা আছে। নিজের মনের কৌতূহলের নেশায়, এক বিচিত্র কীর্তি-চারিণীর উন্মাদনায় মাধুরী শুধু ব্যস্তভাবে ছুটে পৌঁছলো দক্ষিণ কুঠির মাঠে।

জাতীয় পতাকার নীচে প্রতিজ্ঞাপাঠ করে বিদ্যাপীঠের প্রতিষ্ঠা হলো।

জাতীয় পতাকার ছায়ায় বসে মাধুরী প্রথম ছাত্রদলের ক্লাস নিল। প্রথম পাঠ শুনলো ছাত্রেরা—ভারতীয় সভ্যতার প্রথম নেতা গৌতম বুদ্ধের জীবনী।

হঠাৎ একটি লোক এসে খবর দিল—সত্যিই হাঙ্গামা বেধেছে। খুনোখুনি বেধে গেছে গাঁজার দোকানের সামনে। যারা পিকেটিং করছিল, তাদের তিন জনের মাথা ফেটেছে, আর···।

মাধুরীর মুখ কালো হয়ে উঠলো। ছাত্রেরা ব্যস্ত হয়ে উঠে দাঁড়ালো।

একটা এলোমেলো চিন্তার আবর্তের মধ্যে যেন অজ্ঞাতসারে ছাত্রদলের সঙ্গে হেঁটে হেঁটে মাধুরী যখন গাঁজার দোকানের সামনে পৌঁছলো, তখন দুপুরের রোদ গাঁয়ের বাতাসে জ্বালা ধরিয়ে দিয়েছে। শত শত লোক আতঙ্কিত হয়ে একটা কুস্বরের হুল্লোড় সৃষ্টি করেছে। দশ বারোজন ভলান্টিয়ার গাঁজার দোকানের পথ রুখে দাঁড়িয়েছিল। সামনে মাটির ওপর ফোঁটা ফোঁটা রক্তের দাগ লেগেছিল। নিকটে অনেকগুলি লোক বৃত্তাকারে ঘিরে আহত ভলান্টিয়ারদের দিকে তাকিয়েছিল। কেউ বা আপশোষ করছিল, কেউ বা উপদেশ দিচ্ছিলো, কেউ বা একটু বিদ্রূপ করেই বলছিল—যেমন কর্ম তেমনি ফল।

কিসের হাঙ্গাম? কে এই হাঙ্গামা বাধালো? এই হাঙ্গামা থেকে পরিত্রাণের উপায়ই বা কি?

হাঙ্গামা বাধিয়েছে ভজু বাউরী। মদ খেয়ে মাতাল হয়ে এসেছে ভজু। ভজুর মত অমানুষের সত্তা শুধু মদের রসে তৃপ্তি পায় না, এক ভরি গাঁজার ধোঁয়ার জ্বালায় তার হৃদ্‌পিণ্ড ভরে না নিলে ভজু কখনো শান্ত হতে পারে না। সেই ভজুকে ভলান্টিয়ারেরা বাধা দিয়েছে।

ভজু তখনো হুঙ্কার দিয়ে লাঠি আস্ফালন করছিল—আমার পয়সা

দিয়ে আমি গাঁজা কিন্‌বো, তোরা বাধা দেবার কে রে, বেইমান ভদ্রলোকের বাচ্চা···।

গাঁজার দোকানের রেলিংয়ের আড়ালে বসে ভেণ্ডার রামচরণ ফিক্ ফিক্ করে হাসছিল।

—যে শালা আমার সামনে আসবি, একটি বাড়িতে নাক-মুখের চেহারা বিগড়ে দেব।

ভজু আবার হুঙ্কার দিল। সারা জনতা বিমূঢ় হয়ে দাঁড়িয়েছিল। সেই অস্বাভাবিক নিস্তব্ধতার মধ্যে শুধু থেকে থেকে বিরক্ত দাঁড়কাকের ডাক আর আহত ভলান্টিয়ারের আর্তনাদ শোনা যাচ্ছিল।

চুপ করে দাঁড়িয়ে কাঁপতে কাঁপতে মাধুরী দেখলো, ধীরে ধীরে জনতা ভেদ করে ভজুর দিকে এগিযে আসছে একটি ভদ্রলোক। আজ পাঁচ বছর পরে মাধুরী তাকে দেখলো।

কেশব ভট্চায একেবারে ভজুর সম্মুখে এসে ডাক্‌লো—এসব কি হচ্ছে ভজু?

মাতাল ভজুর লাঠিতে ও চীৎকারে যে গর্বের আস্ফালন ছিল, কেশব ভট্চাযের গম্ভীর স্বরে তার চেযে কিছু কম আস্ফালন ছিল না। মান্দার গাঁযের সকল মাঙ্গলিকের পুরোহিত, সকল শিক্ষাদীক্ষার মাষ্টারমশাই, সকল উদ্যম আর ষড়যন্ত্রের মোড়ল কেশব ভট্চায যেন পাঁচ বৎসর পরে ঠিক প্রযোজন বুঝে অকুস্থলে দেখা দিযেছে। একটি ধমক দিয়ে ভজুকে সরিযে দিতে পারে, ভজুর সব মাতলামি শান্ত হবে যেতে পারে, এমন ক্ষমতা যদি কারো থাকে, তা কেশব ভট্চাযেরই আছে। মাতাল ভজুকে সবাই ভয করে, তার কারণ অমাতাল শান্ত সুবাধ্য দিনমজুর ভজুকে সবাই অনাযাসে তুচ্ছ করে। সারাদিন ধরে দুযারে দুযারে কাজের ধন্না

দিয়ে ভজু যে অবজ্ঞা, কৃপণ কৃপা, ধমক ও চোখ রাঙানী সহ্য করে বেড়ায়, এক আধ বোতল মদের সাহায্যে তারই যেন সে প্রতিশোধ নেয়। মান্দার গাঁয়ের শুদ্ধ বুদ্ধ ভদ্রলোকেরাও যেন মাতাল ভজুর সকল গালিগালাজ হাসিমুখে সহ্য করে, নিজদেরই হীনতার প্রায়শ্চিত্ত করে। এই ভয় দিয়েই সবাই ভজুর ঋণ শোধ করে। ভজুর মজুরীর দু'পয়সা যারা ঠকাতে পারে, তারা ভজুর থেকে দুটো কুকথার আঘাত চুপ করেই সহ্য করবে। আজও সবাই চুপ করে দাঁড়িয়ে ভজুর হুঙ্কার ও ধিক্কার সহ্য করছিল।

কিন্তু এইবার কেশব ভট্‌চায সামনে এসে দাঁড়িয়েছে, আর কেউ নয়। তিন তিনটে ফৌজদারীর আসামী কেশব ভট্‌চায। এমন দিন ছিল, এই ধরণের ভজুর মত এক একটা গুণ্ডামিকে কান ধরে গাঁয়ের সীমানা পার করে দিয়েছে কেশব ভট্‌চায। সে কোনদিন কারও ধার ধারে না, ভজু কোন্ ছার।

জনতা সাগ্রহে তাকিযাছিল, ভজু এইবার কত হুঙ্কার দিতে পারে দেখা যাবে।

ভজু সত্যই লাঠির আস্ফালন থামিয়ে তর্জন গর্জন বন্ধ করে, ঘোলাটে চোখের দৃষ্টি তুলে, কিছুক্ষণের জন্য কেশব ভট্‌চায়ের মূর্তির দিকে তাকিয়ে রইল। কেশব ভট্‌চাযের চোখের দৃষ্টিটা তীব্র হয়ে জ্বলছিল। একটি আহত ভলাণ্টিয়ারের আর্তনাদ তখনও আস্তে আস্তে জনতার কলরব ভেদ করে শোনা যাচ্ছিল। কেশবের মনেও বিস্ময়ের অবধি ছিল না। কোথা থেকে ভজু পেয়েছে এই দুঃসাহস? শত লোকের ভীড়ের বিরক্তি আর ঘৃণাকে তুচ্ছ করে, শত লোকের এক পবিত্র সংগ্রামের আয়োজনকে অবজ্ঞা করে, বীভৎস অভিশাপের দূতের মত দেখা দিয়েছে ভজু। আরও

আশ্চর্য, ভজুকে বাধা দেবার মত কোন শক্তি নেই কারও। যেন কারও অধিকার নেই। সবাই দাঁড়িয়ে দেখছে।

কেশব ভট্‌চায কঠোরভাবে ডাক দিল—এদিকে উঠে এস ভজু, বড় বেশি বাড়াবাড়ি হচ্ছে, সাবধান।

ভজু উত্তর দিল—চুপ রও ঠাকুর, সরে পড়।

ভজুর ঘোলাটে চোখে যেন হঠাৎ রক্ত ফুটে উঠলো। ভজুর ভাঙা-গলার স্বরে একটা বিদ্রূপ আর উপেক্ষার স্পর্শ ছিল।

জনতা একটু আশ্চর্য হয়েই বুঝতে পারলো, অজকের ঘটনা যেন নিয়মের মাত্রা ছাড়িয়ে গেছে। কেশব ভট্‌চায আর সেই কেশব নেই, ভজুও আর সেই ভজু নয়। কেশব ভট্‌চাযের এই শানিত সাবধান বাণী উপেক্ষা করে পাল্টা হুঙ্কার দিতে পারে, ভজু যেন সব পার্থিব নিয়মের বাইরে চলে গেছে।

ভজুর মাতলামির উচ্ছ্বাস স্তব্ধ হয়নি। বরং স্তব্ধ হয়ে গেল কেশব ভট্‌চায। এই আঘাতের জন্য প্রস্তুত ছিল না কেশব। চিরদিনের যে আশ্বাসের কঠিন মাটির চরের ওপর সে দাঁড়িয়েছিল, সেই ঠাঁই যেন চোরাবালির মত শিথিল হয়ে জলের নীচে তলিয়ে যাচ্ছে। তার কঠোর গলার স্বরে আজ আর কেউ চম্‌কে ওঠে না, তার হাঁকে আজ আর কেউ সাড়া দেয় না। তার নেতৃত্বের সৌধ ধূলিসাৎ হয়ে গেছে, মান্দার গাঁয়ের মাটিতে তার কোন চিহ্ন পাওয়া যায় না। পাঁচ বছরের অন্তর্ধানের সুযোগে নানা নূতন ঝড় এসে সেই ধুলোটুকু পর্যন্ত উড়িয়ে নিয়ে গেছে।

ভজু আবার নিজের বীভৎস আত্মার প্রেরণায় যেন উৎসাহে প্রমত্ত হয়ে উঠলো। লাঠি ঘুরিয়ে অঙ্গভঙ্গী করে, সমবেত জনতাকে যেন শ্লেষবিদ্ধ করে

ভুললো।—আমি শালা তো মরতেই আছি, কিন্তু তুদিগে মেরে তবে মরবো। তোর স্বদেশীর মাথায় লাঠি!

গাঁজার দোকানের রেলিংযের আড়ালে বসে ভেণ্ডাব রামচরণ উচ্চস্বরে হেসে উঠলো।

সারা জনতার গায়ে যেন একটু একটু করে অপমানের কাঁটা বিঁধছে। যারা নিস্পৃহভাবে দৃশ্যটা উপভোগ করছিল, তাদের মধ্যে একটা অস্বস্তি জেগে উঠছিল। মাথা হেঁট করে একটু দূরে দাঁড়িয়েছিল মাধুরী। জনতা যেন সমবেদনা দিয়ে মাধুরীর অপমান ও লজ্জা বুঝতে পারছিল। স্বদেশী করতে এসে বেচারী হতভম্ব হয়ে গেছে।

কেশব ভট্‌চাযের মুখের দিকে তাকিয়ে তার একটু করুণা হচ্ছিল। বেচারা ভজুব মত ছোটলোকের একটা ধমকে কেমন ঠাণ্ডা হয়ে গেছে।

উদ্ধব সামন্ত বলছিল—না হে, আর বেশি সহ্য করা উচিত নয়। বড় বাড় বেড়েছে ভজুর। এস বেটার ঘাড় ধরে সরিয়ে দিই।

হবি গোঁসাই বললো—কিন্তু ক্যানে ও এমন করেছে? কে ওকে শিখায়ে দিল? প্রেসিডেণ্ট চাটুয্যা ওকে কিছু শিখায়ে দিয়েছে, নিশ্চয়।

শতু মাহাতো বললো—না হে না, ওর নিজেব জেদ। কেউ ওকে শিখায় নাই, কেউ ওকে গুণ্ডোমি করতে ভাড়া লাগায় নাই। বেটা নিজেই হাড়পাজী বদমাস।

কান্ত তেলি ফিসফিস করে বললো—না হে একটা ব্যবস্থা করতে হয়। ভজুকে এদিকে ডেকে নিয়ে এস, একটা টাকা হাতে ধরিয়ে দাও। এখানে হাঙ্গামা না করে, অন্য গাঁয়ে গিয়ে করুক।

ভিখু পোদ্দার বললো—না, ওকে ক্ষমা করে লাভ নাই। তিনি তিনজনের মাথা ফাটিয়েছে, চল থানায় ডায়েরী করে আসি।

ভিখুর কথায় গম্ভীর জনতার মুখে যেন হাসির ঝড় মেতে উঠল। কেউ বা ঠাট্টা করে উত্তর দিল—সাবাস্ ভিখু এতক্ষণে একটা কথার মত কথা বলেছ।

দোকানের রেলিংয়ের আড়াল থেকে ভেণ্ডার রামচরণ ইসারা করে ভজুকে ডাকলো। এগিয়ে চললো ভজু।

মুহূর্তের মধ্যে একটা লাফ দিয়ে এসে কেশব ভট্চায ভজুর পথরোধ করে দাঁড়ালো। ভজু চীৎকার করে বললো—তুমি সামনে এসো না ঠাকুর। এখানে তুমিও সি ক্লাস। আমিও সি ক্লাস। তুমি আমার পথ বাঁধাব কে হে ভট্চায ?

কেশব—না তুমি গাঁজা কিনিতে পারবে না, কিছুতেই না।

ভজু—বেশ, তবে তুমি কিনে দাও।

আবার জনতার মধ্যে একটা হাসির ঝড় জেগে উঠলো।

কেশব—আমার কথা শোন ভজু।

ভজু, কি যে বল ঠাকুর, তোমার কথা শুনে আমি শেষে প্রাণটা হারাবো ?

কেশব—না, তোমার প্রাণ হারাবে না ?

ভজু যেন বিড় বিড় করে বললো—আর তোমার কথায় কোন বিশ্বাস নাই ঠাকুর। তুমি ভয়ানক চালাক লোক। তোমাকে বিশ্বাস তো করেছিলাম, কিন্তু তুমি আমাকে মারতে এসেছিলে।

ভজুর ক্লেদাক্ত লাল চোখটাও কেমন যেন করুণ হয়ে উঠছিল।

কেশব একটু অপ্রস্তুত হয়ে বললো—তুমি ভুল বুঝেছ ভজু।

ভজু—থাক্ থাক্, ঐ সব কথা এখানে ভাল লাগে না ঠাকুরমশাই।

কেশব—তুমি ভেবে দেখ, কি অন্যায় কাজ করছো।

ভজু যেন ঘুম থেকে জেগে উঠে হঠাৎ একটা অদ্ভুত বিস্ময়ে বিকৃত স্বরে উত্তর দিলো—অন্যায় ? আমি ?

কেশব—হাঁ্যা।

ভজু—আমি কি অন্যায় করলুম ঠাকুর ?

কেশব—তুমি সত্যাগ্রহী ছেলেদের মাথা ফাটিয়ে দিয়েছ। এরা তোমার গায়ে হাত দেয় নাই, তবু তুমি···।

ভজু চারিদিকে তাকিয়ে বললো—সত্যাগ্রহী ? কে উহারা কোথায় ?

কেশব আহত ভল্যান্টিয়ার কয়টির দিকে আঙ্গুল তুলে দেখিয়ে দিল—ঐ তো।

ভজুর মাতলামি যেন আবার উগ্র রকমের খোঁচা খেয়ে লাফিয়ে উঠলো। চীৎকার করে ভজু বললো—ফাজিলগুলাকে কেন মারবো না ঠাকুর ? আমি ওদের বাবার বয়সী, আমার সঙ্গে রঙ করতে এসেছে ?

জনতা আবার হেসে উঠলো। কেশবের ধৈর্যও ফুরিয়ে আসছিল। আজ হঠাৎ যেন মনের ভুলে এখানে চলে এসেছে কেশব। মাধুরী এখানে আছে, এ সংবাদ জানা ছিল না কেশবের। জানা থাকলে, নিশ্চয় সে আসতো না। কিন্তু সকাল থেকে লোকমুখে একটা হাঙ্গামার কথা শুনে আসছে কেশব। গাঁয়ের হাঙ্গামায় কোনদিন যে দূরে সরে থাকেনি, সে আজও দূরে সরে থাকতে পারেনি।

কেশব এসেছিল, শুধু তার আবির্ভাবকে মান্দার গাঁয়ের জীবনে স্মরণ

করিয়ে দিবার জন্য। লোকে জানুক, কেশব ভট্চায মরে যায়নি। সে আজও অক্ষয় অটুট হয়ে আছে। সুদিনের শিথিল অবসরের প্রগল্ভতায় যাকে সবাই ভুলে গেছে, আবার এক দুর্দিনের জ্বালায় সবাই তাকে মনে করতে বাধ্য হবে। সে সুযোগ আসবেই। কেশব যেন সেই সুযোগের প্রতীক্ষায় ধৈর্য ধরে বসেছিল।

আজ সেই সুযোগ এসেছে। মাত্র একটি সাধারণ ঘটনার আক্রমণে বিমূঢ় হয়ে গেছে মান্দার গাঁ। ভজুর মত নগণ্য এক দুর্বৃত্তের বাধায় মান্দার গাঁয়ের স্বদেশী, মান্দার গাঁয়ের নতুন জাগৃতি থমকে গেছে, ভাবতে হাসিও পাচ্ছিল কেশবের।

কিন্তু ঘটনার সম্মুখে দাঁড়িয়ে আর হাসি পাচ্ছে না কেশবের।

ভজু লাঠি তুলে ইঙ্গিতে যেন একটি ভলান্টিয়ারের পরিচয় চিনিয়ে দিয়ে বললো—ঐ, ও হলো পূর্ণ স্যাকরার ব্যাটা। ওর বিয়েতে আমাকে বলদের মত খাটিয়ে নিয়েছে ঠাকুরমশাই। মাটি কেটেছি, জল তুলেছি, বোঝা বয়েছি—চারটি দিন লাগাড় খেটেছি। কিন্তু, আজ পর্যন্ত একটি পয়সাও দিলে নাই গো স্যাকরার গুষ্টি। কী অধর্ম। দু'বেলা দুটা ভাত খেতে দিয়েছে, তারপর বলে কি না, আর কত লিবি ?

ভজু একটু চুপ করে হাঁপাতে লাগলো। ভজুর মূর্তিটাও পাগলের মত দেখাচ্ছিল। কেমন বেযাড়া খাপছাড়া সব কথা। কখনো হুংকার, কখনো কান্নার মত আক্ষেপ, কখনো বা কঠোর হিংসার নিক্কনের মত টুক্‌রো টুক্‌রো প্রতিজ্ঞা, প্রতিশোধের কথা। ক্লান্তভাবে লাঠি ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে কেশবের দিকে তাকিয়ে যেন অবসন্নের মত চুপ করে রইল ভজু। পর মুহূর্তে আবার তার সারা অন্তঃকরণ একটু গাঁজার ধোঁয়ার আনন্দের জন্য ছট্‌ফট করে ওঠে। ভজু আবার হুল্লোড় সৃষ্টি করে।

আর একটি ভলান্টিয়ারের দিকে তাকিয়ে ভজু চীৎকার করে বললো—কটমট করে কি দেখছিসরে শিবু নাপিতের বেটা, জুয়োচোর। দে আমার ছাগলের দাম। আমার পাঁচ টাকার ছাগল ভুকে তিন টাকায় দিয়েছি, তাও দামটা আজও দিলিনাই কেন রে ঠগ? তোর কান ছিঁড়বো না তো, কার কান ছিঁড়বো।

ভজুর প্রমত্ত প্রলাপের অর্থ খুবই স্পষ্ট হয়ে ধরা পড়ছিল। কেশব শুধু দু'কান দিয়ে শুনে হতভম্ব হয়ে যাচ্ছিল। মান্দার গাঁয়ের স্বদেশী ব্রত পণ্ড করতে ভজু হঠাৎ আকাশ থেকে অভিশাপের মত নেমে আসেনি। মান্দার গাঁয়ের পাপের স্তূপ ভেদ করে ভজু আজ ফুঁড়ে উঠেছে। কেশবের ভাবনায় ক্ষণে ক্ষণে ভুল হয়ে যাচ্ছিল। এ কোন্ সখের সত্যাগ্রহ? কে সত্যাগ্রহী? ভজুর নির্যাতিত জীবনের বীভৎসতা আজ এই সত্যাগ্রহের ছদ্মবেশকে রূঢ় হাতে ছিড়ে দিতে উদ্যত হয়েছে। ভজুর প্রতিদিনের সাধুশ্রমের প্রাপ্যকে প্রবঞ্চনায় ভরে দিয়েছে যারা, আজ তারা কোন্ মহৎ আদর্শের অজুহাতে ভজুর পথে সত্যের আবেদন নিয়ে দাঁড়াতে সাহস করে? এ যে নিছক মিথ্যার আগ্রহ। ভজু এতে ভুলবে না। জীবনের জয় দিয়ে নয়, জীবনের ক্ষয় দিয়ে ভজু যে সত্যকে চিনতে পেরেছে, তাকে ধোঁকা দিয়ে ভোলাতে এসেছে আজকের জয়ধ্বনি, শঙ্খধ্বনি আর সত্যাগ্রহ।

মাতাল ভজুকেই মাঝে মাঝে প্রকৃত সত্যাগ্রহীর মত দেখাচ্ছিল। তাকে ঘিরে শত লোকের জনতা দাঁড়িয়ে আছে। এই জনতার ঘৃণা ও ধিক্কার আর ভ্রূকুটির কোন শঙ্কা রাখে না ভজু। এই জনতা এই মুহূর্তে ইচ্ছা করলে ভজুর জীর্ণ শরীরটাকে চূর্ণ করে দিতে পারে। কিন্তু সকল জনতার শক্তি দম্ভ আর ভয়াবহতাকে তুচ্ছ করে ভজু তার চণ্ডালী-সাধনায়

গর্বে বুক ফুলিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। সেও আজ প্রস্তুত। মার, কাট, লুণ্ঠ করে দাও—তবু সে নড়বে না।

অদ্ভুত এক ঘটনায় সঙ্কটে পড়ে কেশব তার কর্তব্যের খেই খুঁজে পাচ্ছিল না। কি করা উচিত? কি করে ভজুকে বাধা দেওয়া যায়? ধমকে কোন ফল নেই। ধমক দেবার অধিকারও কারও নেই। মিষ্টি কথায় অনুরোধের ফাঁকিতে ভজু আজ ভুলবে না।

ভজু শেষ পর্যন্ত কেশবের দিকে তাকিয়েই বললো—তুমিই বা কি ঠাকুর? তোমাকেও চিনে নিয়েছি। যাও, সর এইবার, পথ ছাড়।

পথ ছেড়ে সরে গেল কেশব। ভজুকে শান্ত করবার, ভজুর হৃদয়কে আপন করে অন্তরঙ্গ আশ্বাসে কাছে টেনে আনবার কোন কৌশল জানে না কেশব।

হ্যাঁ, একটি কাজ সে করতে পারে। ভজুর হাতের লাঠি কেড়ে নিয়ে, এই মুহূর্তে···। হ্যাঁ সে তা করতে পারে। সেই রাত্রে অন্ধকারে ভজুকে এইভাবেই স্তব্ধ করে দিয়েছিল কেশব। কিন্তু আজ দিনের আলোকে সেই অন্ধকারের জীব ভজু কী রুদ্ররূপে দেখা দিয়েছে! তবু কেশব এই মুহূর্তে ভজুব জীর্ণ রুক্ষ মূর্তির মায়াটা একটি আঘাতে দু'ভাগ করে দিতে পারে, একবার গলা টিপে ধরলে ভজুর ঐ প্রকট পাঁজরার হাড়গুলির স্পন্দন এখুনি থেমে যাবে। এই নির্মম দুঃসাহস কেশব ভট্চার্যের আছে।

কিন্তু ভাবতে গিয়ে শিউরে ওঠে কেশব। সকল দুঃসাহস শীতল হয়ে যায়। শহীদ হয়ে যাবে ভজু। তা'হলে ভজুর মৃত্যু মহনীয় হয়ে উঠবে, সকল বীভৎসতার ঊর্ধ্বে এক মুহূর্তে ভজুর আত্মা পরম রূপময় লোকে

চলে যাবে অনন্তকালের জন্য। ভজুর হার হবে না। ওভাবে ভজুকে পরাভূত করা যায় না।

চুপ করে দাঁড়িয়েছিল কেশব। তার সকল নেতৃত্বের কৌশল ব্যর্থ হয়ে গেছে, আজকের ঘটনাকে সুপথে টেনে নিয়ে যাবার শক্তি তার নেই।

ভজু এগিয়ে চলেছিল গাঁজার দোকানের দিকে।

আস্তে আস্তে এগিয়ে এসে ভজুর সম্মুখে দাঁড়ালো মাধুরী। ভজু চকিতে দু'পা পিছিয়ে সরে দাঁড়ালো।

মাধুরী বললো—আমাদের মাপ কর ভজুদাদা। কিন্তু গাঁজা আর স্পর্শ করো না।

মাধুরী হাতযোড় করে দাঁড়িয়েছিল। ভজু যেন সন্ত্রস্তের মত দাঁড়িয়ে দেখছিল।

একবার পিছনের দিকে তাকিয়ে দেখলো ভজু। মাধুরীর দিকে তাকিয়ে তেমনি ভয়ে ভয়ে বিড়বিড় করে বললো—এঃ, আপনি আমার উপর পাপ টেনে আনছেন গো দিদি। এ কি কাণ্ড! ছি ছি!

জনতার পাশ কাটিয়ে ভজু এক লাফে দোকানের পথ ছেড়ে মাঠের দিকে সরে এল। তারপর দিঘীর কিনারা ধরে এক দৌড়ে পালিয়ে গেল।

মাতাল ভজু দৌড়ে পালিয়ে যাচ্ছিল। কিন্তু আশ্চর্য, একটুও তার পা টলছিল না।

আজকের রৌদ্রালোকে শত লোকের প্রত্যক্ষে মান্দার গাঁয়ের জীবনের নাটমঞ্চে যেন প্রমাণিত হয়ে গেল যে, মাধুরীই একমাত্র নায়িকা। মান্দার গাঁয়ের জীবনে নতুন ঘটনার সাড়া সৃষ্টি করতে,

সকল অপঘটনার উপদ্রবকে শাসনে সংযত রাখতে একমাত্র শক্তি রাখে মাধুরী। কেশব ভট্‌চাযের নায়কত্ব বাতিল হয়ে গেছে। পাঁচ বছরের কালের সমাধিতে কেশব ভট্‌চাযের সেই প্রতিভা লুপ্ত হয়ে গেছে। মান্দার গাঁয়ের পথঘাট বদ্‌লে গেছে, কেশব ভট্‌চায স্বচক্ষে দেখেছে এই পরিবর্তন। তবু এই নতুন পথে দাঁড়াবার রীতিনীতি সে জানে না।

ভজু পালিয়ে চলে যেতেই জনতা উল্লাসে জয়ধ্বনি করছিল। বিদ্যাপীঠের ছেলেরা আরও হুল্লোড় সৃষ্টি করছিল। জয়ধ্বনির উচ্চরোল মাঝে মাঝে কর্কশ হয়ে গর্জনের মত শোনাচ্ছিল। গাঁজার দোকানের ভেণ্ডার রামচরণ তাড়াতাড়ি কপাট বন্ধ করে দিল।

তবু জনতার ছত্রভঙ্গ হবার কোন লক্ষণ দেখা গেল না। যেন ঘটনার নেশায় পেয়েছে তাদের। আজ শুধু পথ রুখে দাঁড়াবার দিন। সকল অবাঞ্ছিতের বিরুদ্ধে আজ দাঁড়াতে হবে। সকল অনাহূতকে আজ গাঁয়ের সীমার বাইরে ঠেলে নিয়ে যেতে হবে। ইষ্ট এবং অনিষ্টকে চেনবার একটি নিয়ম তারা জেনে ফেলেছে। গাঁযের আগ্রহকে উপেক্ষা করে, গাঁয়ের সম্মতি না নিযে যা কিছু এসেছে সবই অনিষ্ট। ইংরেজী স্কুল, গাঁজার দোকান আর বোর্ড অফিস— কোনদিন তাদের কাম্য ছিল না। আজও তারা ভাল করে এই সব আবির্ভাবকে চিনতে পারে না। তবু মনে হয়, এই সবই এক ভয়াবহ ষড়যন্ত্রের সূত্রে বাঁধা। জেলা বোর্ডের সড়কের নতুন পুলটাকেও আজ শত্রু বলে মনে হয়। ঐ সেতু গাঁয়ের অবাধ স্বাচ্ছন্দ্যকে যেন ইঁটপাথরে গেঁথে বন্দী করে রেখেছে। গাঁয়ের স্বাধীন মন পথ চলতে চলতে ঠিক ঐখানে এসে বাধা পায়। পুলবাবু দাঁড়িয়ে আছেন খাতা

হাতে নিয়ে। কোন হাটুরে একবোঝা কুমড়োর ডাঁটাও বিনা মাশুলে পার করতে পারে না। বোঝা প্রতি দু'পয়সা মাশুল। গরু প্রতি এক পয়সা মাশুল। পাল্কি আর গরুরগাড়ির এক আনা। এই সেতু গাঁয়ের কোন কল্যাণের আগমন সহজ করে তুলতে পারেনি, শুধু একবার লাট সাহেবের মোটর দৌড়ে গিয়েছিল। কিন্তু আজও মাশুল আইন অমান্য করার অভিযোগে একুশটি মোকদ্দমা দায়েব আছে। এর আগে দশ টাকা থেকে আড়াই টাকা পর্যন্ত জরিমানাও অনেকের হয়ে গেছে। আজ কারও মনে আর কোন সংশয় নেই। সকল পাপের ছদ্মবেশ আজ সুস্পষ্ট ধরা পড়ে গেছে। নেহাৎ অসমাধানেব ভুলে বহু পাপকে প্রশ্রয় দিয়েছে তারা, কিন্তু আর নয়।

সারা হিন্দুস্থানের খবর আজ বাতাসের স্রোতে মান্দার গাঁযের কানে এসে পৌছায়। সারা হিন্দুস্থানের মাটি কাঁপছে। এই ভূকম্পে সকল অন্যাযের উদ্ধত শৃঙ্গ ভেঙে পড়বে। বোম্বাই, কলকাতা, মাদ্রাজ, দিল্লী—গাঁয়ে, গঞ্জে, বন্দরে, বনমরুকান্তারে—আজ একই জাগরণের হর্ষ, একই শৃঙ্খলা ভঙ্গের ধ্বনি। দেশ জোড়া এই ব্রতের প্রধান পুরোহিত মহাত্মা গান্ধী। মন্দিরে ও মসজিদে আজ সকল প্রার্থনার মধ্যে মুক্তির ঘোষণাই সব চেয়ে বড় সুরে শোনা যায়।

জনতা যেন আবেগে চঞ্চল হযে নতুন রণাঙ্গন খুঁজছিল। মহাত্মা গান্ধী কি জয়! ধ্বনির আলোড়ন তুলে একদল দৌড়ে চলে গেল জেলা বোর্ডের পুলের দিকে। আজ সাবা দিন ধরে তারা গরু মোষ নিযে পুল পারাপার হবে। একটি পযসাও মাশুল দেবে না। বিদ্যাপীঠের ছেলেরা একটা পাল্কি যোগাড় করলো। পাল্কির ভেতর মহাত্মা গান্ধীর ছবি ফুলের মালা দিয়ে সাজিযে রাখলো। এই পালকি তারা নিজেদের কাঁধে

বযে পুল পার হবে, এক পযসাও মাশুল দিবে না। যদি কেউ বাধা দেয তবে সত্যাগ্রহ হবে। সত্যাগ্রহ কি জয! বিদ্যাপীঠের ছেলেরা বোর্ডের সড়কে পুলের দিকে চলে গেল।

জনতার আব এক দল হঠাৎ দেখতে পেল, বোর্ড অফিসের অঙিনায একদল দূব গাঁযেব চাষী এসে বসে বযেছে। দু'একজন করে আরও আসছে—বকেযা ট্যাক্স মিটিযে দিতে।

কেউ ট্যাক্স দিওনা! জনতা এই দুঃসাহসের আবেদন সমস্বরে ধ্বনিত করে, বোর্ড অফিসেব দিকে দৌড়ে গেল। চাষীদের চারিদিকে ঘিবে দাঁড়ালো।

দীঘিব ঘাটেব আসব শূন্য। আব কেউ সেখানে ছিল না। শুধু কেশব ভট্চায আর মাধুবী। কেশব ভট্চায যেন আজ মনে মনে প্রস্তুত হযে এসেছে। তাব কাজ এখনও শেষ হয নি। তা না হলে, এখনও দাঁড়িযে থাকার কোন অর্থ হয না।

মাধুবীব আপাততঃ আব কোন কাজ নেই। বাড়ি ফিবে যাওযাই এখন এক মাত্র কাজ। কেশব সেখানে না থাকলে, মাধুবী অনাযাসেই ঘবে ফিবে যেতে পাবতো। কিন্তু কেশবেব নিস্তব্ধ অস্তিত্ব যেন একটা বাধা হযে মাধুবীব পথ আটক কবে বেখেছে। একটা অপ্রস্তুত ও অস্বস্তিকর অবস্থাব মধ্যে নিঃশব্দে অন্যদিকে তাকিযে মাধুবী দাঁড়িযেছিল। কথা বলাব জন্যই মাধুবীব দিকে চোক তুলে তাকালো কেশব।

কিছুক্ষণ ধবে একটা অস্বাভাবিক বিস্মযে কেশবের দৃষ্টি যেন স্তব্ধ হযে গেল। মাধুবীকে যেন ঠিক দেখতে পাওযা যাচ্ছে না। সে দেখছিল, মান্দাব গাঁযের নতুন জীবনের অভিনযে পুবোনাযিকার মূর্তি, মাধুরীর প্রতিচ্ছাযাব যেন লেশমাত্র এব মধ্যে নেই। বযসে, চেহাবায, সাজে ও

মুখাবয়বে সম্পূর্ণ এক নতুন মূর্তি। সেই গাঁয়ের মাটির পুতুলকে এর মধ্যে খুঁজে পাওয়া যায় না।

মাধুরী অনেক বড় হয়ে গেছে ; কিন্তু কেশবের বিস্ময় আরও দিশাহারা হয়ে পড়ছিল, সেই মাধুরী বড় হয়ে উঠেছে, না অন্য কেউ। এ যেন গ্রাম-ছাড়া ঐশ্বর্য বলেই সন্দেহ হয়। গাঁয়ের ঝুমকো কুঁড়ি বড় হয়ে কনকধুতুরা হয়ে যেতে পারে না। কেশবের সন্দেহ হয়, মাধুরীর মুখের ভাষাও আজ সে বুঝতে পারবে কিনা কে জানে। হয়তো সে ভাষার ব্যাকরণও একেবারে নতুন ধরণের। মাধুরীর খদ্দরের শাড়ি, শাড়ি পরার ভঙ্গী, খোঁপার ছাঁদ, ভুরু চিবুক গ্রীবা—সবই যেন নতুন ছন্দের গর্বে গড়ে উঠেছে। এত অভিনবত্ব অসহ্য।

মাধুরী হঠাৎ মুখ ফিরিয়ে বললো—জেঠাইমার সঙ্গে এখনও দেখা করতে পারি নি, যেন কিছু না মনে করেন। আমি যাব একদিন।

সকল চিন্তার বিভ্রান্তি থেকে নিজেকে যেন জোর করে মুক্ত করলো কেশব। এই অভিনবত্ব যতই দুঃসহ হোক সইতে হবে। মাধুরীকে চিনতে হবে। হয়তো চিনতে না পেরেই, সেই পুরাতন সত্যকে আজ এত অভিনব মনে হচ্ছে।

কেশব বললো—আজই চল।

মাধুরী কিছুক্ষণ চুপ করে, দূরে বোর্ড অফিসের আঙিনার জনতার দিকে তাকিয়ে রইল। তারপর যেন সঙ্কোচের সঙ্গে বললো—কবে ছাড়া পেলেন কেশবদা ?

কেশব—যে রাত্রে তুমি এলে, তার আগের রাত্রে এসেছি।

মাধুরী—আপনি কি করে জানলেন যে আমি রাত্রিবেলায় এসেছি।

কেশব—আমি দেখেছি।

মাটির দিকে মাথা হেঁট করে নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে রইল মাধুরী। মান্দার গাঁয়ের দিনের আলোক মুছে গিয়ে ঝাপসা হয়ে আসছে। ক্রমে অন্ধকার ঘনিয়ে উঠেছে। সেই অন্ধকারের মধ্যেই একজোড়া আগ্রহভরা দৃষ্টি যেন তাকে ঠাঁই ঠাঁই খুঁজে বেড়াচ্ছে। সে কাহিনী যেন মান্দার গাঁয়ের অন্ধকারে নির্বিকার সত্যের মত লুকিয়ে রয়েছে। পাঁচ বছরের দীর্ঘ ব্যবধানেও সেই মোহ একতিল ক্ষয় হলো না। এই অবিচলত্ব একেবারে অসহ।

মাধুরী—আমি শীগ্‌গির মীরগঞ্জ চলে যাব।

কেশব—কেন ?

মাধুরী—এখানকার কাজ হয়ে গেল।

কেশব—একটা কথা জিজ্ঞাসা করব মাধুরী।

মাধুরী—বলুন।

কেশব—তুমি কি সত্যই কলেজ ছেড়ে দিয়েছ।

মাধুরী—হ্যাঁ।

কেশব—এখন স্বদেশী করছো ?

মাধুরী হেসে ফেললো। কেশব একটু অপ্রস্তুত হয়ে জিজ্ঞাসুর মত তাকিয়ে রইল।

মাধুরী বললো—কি রকম প্রশ্ন করছেন কেশবদা !

কেশব—বোধ হয় আমার প্রশ্নের ভাষাটা···

মাধুরী—হ্যাঁ।

কেশব—আমি সে কথা জানি মাধুরী।

মাধুরী যেন আরও স্পষ্ট করে বুঝবার জন্য তাকালো। কেশব বললো,

আমি জানি, পাঁচ বছর কয়েদী হয়েছিলাম, আমার ভাষাটাও কি রকম হয়ে গেছে। শুধু তাই নয়, তোমার ভাষা এত নতুন হয়ে গেছে যে আমারও বুঝতে কষ্ট হয়।

মাধুরী—আপনি এখন কি করবেন?

কেশব—জানি না।

মাধুরী—আন্দোলনে যোগ দেবেন না?

কেশব—কিসের আন্দোলন?

মাধুরী—নন্‌-কো-অপারেশন।

কেশব—আমি ওসব কিছু বুঝি না।

মাধুরী—চেষ্টা করলেই বুঝতে পারবেন।

কেশব—তুমি কি সত্যিই আমাকে উপদেশ দিচ্ছ?

মাধুরী একটু বিড়ম্বিত ও বিরক্ত হযে বললো—না। অনুরোধ করছি।

কেশব—তোমার কাছে আমারও একটা অনুরোধ আছে।

মাধুবী—বলুন।

কেশব—তুমি এই আন্দোলন ছেড়ে দাও।

মাধুরী—অদ্ভুত অনুরোধ করছেন আপনি।

কেশব—এ-কাজ তোমাব ভাল লাগছে?

মাধুরী—এও আপনার অদ্ভুত প্রশ্ন।

কেশব—কেন?

মাধুরী—এব উত্তর হয না।

কেশব—আমার কি মনে হয জান? তোমার পক্ষে উত্তর দেওয়া কঠিন, তাই কিছু বলতে পারছো না।

মাধুরী—কি করে বুঝলেন?

কেশব—এ-কাজ তোমার মনে প্রাণে ভাল লাগছে না। জোর করে নিজেকে মাতিয়েছ। কিন্তু আমিও সত্যিই মাঝে মাঝে আশ্চর্য হই, তুমি কি ভেবে এই হুজুগে মাত্‌লে?

মাধুরী—আপনার কাছে হুজুগ হতে পারে, কিন্তু।...

কেশব—থাক্ সে কথা। আমি তোমাকে কোন অনুরোধ করবো না।

মাধুরী একটু বিমর্ষ হয়েই বললো—আপনি দু'দিন পরে আমারই অনুরোধ মেনে নেবেন, এ বিশ্বাস আমার আছে।

কেশব—কি?

মাধুরী—আমি জানি, আপনি আন্দোলনে যোগ না দিয়ে পারবেন না।

কেশব—তুমি ঠিকই বলেছ। যদি বুঝতে পারতাম, এই আন্দোলনটা কি? কিসের জন্য? এর শেষ কোথায়? আমার কি লাভ আছে এর মধ্যে?

মাধুরী—নিজের লাভ খুঁজলে এর মধ্যে পাবেন না।

কেশব—তা'হলে তোমার অনুমানও বৃথা হবে, কোন আন্দোলনে আমার দরকার নেই।

মাধুরী—আপনি আজও সেই রকম আছেন কেশবদা।

কেশব—কি রকম?

মাধুরী—কড়া কথা বলা আপনার চিরকালের অভ্যাস, আজও...

কেশব হেসে হেসে বললো—আমি কি সত্যিই সেই রকম আছি? তুমি বিশ্বাস কর?

মাধুরী—হ্যাঁ, পাঁচ বছরেও আপনার একটুও পরিবর্তন হয় নি।

কেশব—তোমার কাছে যেটা পাঁচ বছর মনে হচ্ছে, আমার কাছে সেটা শূন্য মাত্র।

মাধুরী অন্য দিকে মুখ ঘুরিয়ে নিল।

কেশব—তোমার জীবনে পাঁচ বছরে অনেক আশীর্বাদ এসেছে। তুমি বড় হয়ে উঠেছ, কলেজে পড়েছ, রাজনীতি শিখেছ। কিন্তু আমার পাঁচ বছর তো তা নয় মাধুরী। আমার কাছে একটানা রাত্রির মত এই পাঁচ বছর সময় কেটে গেছে। আমি কাউকে দেখতে পাই নি, কারও কথা শুনতে পাই নি। যা আগেই দেখা ছিল, যে কথা আগেই শোনা ছিল, তারই অনুভব নিযে আমার সময় কেটেছে। আমার কোন পরিবর্তন হযনি মাধুরী। যেমন গিযেছিলাম, তেমনি ফিরে এসেছি।

অনেকক্ষণ ধরে মাধুরী চুপ করে দাঁড়িযে রইল। মনের ভেতর যেন দুই ভ্রান্তির দ্বন্দ্ব চলছিল। কেশবের ভাষা সে বুঝতে পারে না, একথা চরম মিথ্যা।

মাধুরী বললো—কিন্তু তবুও তোমার এতদিনে বদলে যাওয়া উচিত কেশবদা। পৃথিবী বদলে যাচ্ছে।

কেশব আশ্চর্য হযে দেখতে পেল, মাধুরীর চোখের কোণে যেন একটা সজল আবেদন চিক্‌চিক্ করছে।

কেশব বললো—এখানে আর তোমার কোন কাজ নেই বোধ হয, চল, তোমায় বাড়ি পৌঁছে দিযে আসি।

মাধুরী—না, এখন আর কোন কাজ নেই। মনে হচ্ছে, এ গাঁযেও আর আমার কোন কাজ নেই।

কেশব আর মাধুরী ফেরার পথে গল্প করে চলেছিল। গাঁয়ের পথের দু'পাশের ঘাস আর গাছের পাতায় ধুলো ছড়িয়ে আছে। দু'দিন ধরে

জনতার ছুটাছুটিতে গাঁয়ের পথের চেহারাটা যেন বিভ্রান্ত হয়ে আছে। এক পশলা ঠাণ্ডা বৃষ্টি অঝোরে ঝরে না পড়লে এই ধুলো আর মিলিয়ে যাবে না। দূরে দীনুবাবুদের বাগানের ভেতর ছোট একটা ঝড় যেন বন্দী হয়ে ছটফট করছিল। কয়েকটা শিমুল যেন উৎসবের আনন্দে বিহ্বল হয়ে রাশি রাশি শাদা তুলো ছড়াচ্ছিল চারিদিকে। বাগানের কিনারা ঘেঁষে ছায়ার চিহ্ন ধরে চলেছিল দু'জনে।

কেশব বললো—এ গাঁয়ে আর কোন কাজ নেই, এর অর্থ বুঝলাম না।

মাধুরী—অর্থ খুব স্পষ্ট।

কেশব—আমার কাছে খুবই অস্পষ্ট।

মাধুরী—আপনি থাকতে এ গাঁয়ে আমি কোন কাজ করতে পারি না।

কেশব—তা'হলে আমিই তোমাকে বড় অসুবিধায় ফেললাম।

মাধুরী—ফেললেন বৈকি।

কেশব—আমার জেল থেকে খালাস পাওয়াই বোধ হয় অন্যায় হয়েছে।

মাধুরী চুপ করে রইল। ঠিক এতটা স্পষ্ট করে মাধুরী হয়তো বলতে চায়নি।

কেশব আবার বললো—আমি যদি এ গাঁয়ে না থাকি, তবে তোমার কোন অসুবিধা নিশ্চয় হবে না।

মাধুরী—এটা তোমার গাঁ কেশবদা এখানে তুমি থাকবে না, এটা অস্বাভাবিক।

কেশব—তোমার গাঁ নয়?

মাধুরী—আজ আপনাকে একটা সত্যি কথা বলবো কেশবদা।

কেশব—বল।

মধুরী—গাঁয়ে ফিরে এসেছি, কিন্তু চিরদিনের জন্য এসেছি ভাবতে গেলে···।

কেশব হেসে ফেললো—সেই কথাই আমি তোমাকে বলতে চেয়েছিলাম।

মাধুরী—কেন এরকম হলো কেশবদা?

কেশব—তোমার দোষ নেই।

মাধুরী—এক এক সময় মনে হয়, এ সবই তোমার দোষ।

কেশব—হ্যাঁ আমারই দোষ। বিলেত যাবার পথ খোলা পড়ে থাকতে জেলে চলে গেলাম, তাও আবার ফৌজদারী দায়ে।

সেইখানে থমকে দাঁড়িয়ে পড়লো মাধুরী। কেশব বললো—তুমি কিছু চিন্তা করো না মাধুরী। আমি তোমাকে চমকে দেবার জন্য কোন কথা বলছি না। তুমি বদলে গেছ, কোন অন্যায় করনি। মানুষ মাত্রেই বদলে যায়। আমিও বদলে যাব একদিন।

মাধুরী তবু চুপ করে দাঁড়িয়েছিল। কেশব যেন নিজের মনেই বলছিল—সবারই জীবন চুপ করে বসে থাকে না। পাঁচ বছর আগেও একথা আমি জানতাম। কিন্তু তখন সেই সঙ্গে আর একটা বিশ্বাস ছিল—যে তুমি আমি ভবিষ্যতে বদলে যাব একই নিয়মে। সেই পরিবর্তনে তুমি আমার কাছে পর হয়ে যাবে না। আমিও পর হয়ে যাব না।

মাধুরী—আজ কি সেই বিশ্বাসের কোন ব্যতিক্রম দেখছ?

কেশব—হ্যাঁ, তুমি বদলে গেছ, আমার অপেক্ষায় না থেকে।

মাধুরী—আজ আর আপনার সঙ্গে কথা বলার কোন পথ খুজে

পাচ্ছি না কেশবদা। বলতে গেলে, আমার কথা আরও দুর্বোধ্য হয়ে যাবে।

কেশব—তুমি কোনদিন আমার কাছে দুর্বোধ্য হবে না, হতে পার না। যাক সে সব কথা। আজ এইখানেই বিদায় নিলাম।

কেশব চলে গেল। মাধুরী দাঁড়িয়েছিল অনেক্ষণ। এতক্ষণ আলাপের মধ্যে একটা সত্য সকল বাধাবন্ধ ঠেলে যেন নিজের জোরে স্পষ্ট হয়ে ধরা দিয়ে গেল। কেউ কারও কাছে দুর্বোধ্য নয়, কেউ বোধ হয় বদলে যায়নি। প্রত্যেকের এক একটি কথার আভাসে প্রত্যেকেই অনায়াসে বুঝে ফেলতে পারে তার মধ্যে যা-কিছু অভাষিত ছিল। কিন্তু আজকের দুপুর শেষ হয়ে সন্ধ্যা নামবে, তারপর রাত্রি। সেই রাত্রিও কেটে যাবে গাঁয়েব অন্ধকারের নিঃশব্দ স্রোতে পাড়ি দিয়ে। কিন্তু তারপর? কাল সকালে উঠে আর কোন নতুন কাজেব খেই খুজে পাবে না মাধুরী। যতক্ষণ কেশব ভট্চায এ গ্রামে আছে, ততক্ষণ তার অস্তিত্বকে ভুলে থাকা মাধুবীব পক্ষে একেবাবে অসম্ভব। মাধুবীব প্রত্যেকটি কাজের স্বাধীন আবেগকে অদৃশ্য সূত্রে যেন পেছন থেকে টানবে কেশব ভট্চাযের নীরব আত্মগোপন। যেখানে কেশব ভট্চাযের চোখেব দৃষ্টি সজাগ হয়ে আছে, সেই আসরে গিয়ে দাঁড়াবার মত প্রহসন সৃষ্টি করতে চায় না মাধুরী।

হাঁ, সেই কথাও মনে পড়ে যায় হঠাৎ। কেশবকে বিলেত গিয়ে পড়বাব খরচ দিতে রাজী হয়েছিলেন সঞ্জীববাবু। যদি কেশব রাজী হতো। মাধুরী ভাবতে গিয়ে কোন পরিণাম কল্পনা করে উঠতে পারে না। ঘটনার গতি কোন্ দিকে মোড় ঘুরে চলে যেত কে জানে? পরিতোষের আবির্ভাব হতো না। কেশব নিজে ইচ্ছে করে একরোখা স্বভাবের দোষে সঞ্জীববাবুর প্রস্তাব অগ্রাহ্য করেছিল। তা না হলে

মাধুরীর কাছে আজ সম্মুখের জীবনের ক্ষেত্র, সম্মুখের পথ—কিছুই অস্পষ্ট ও সঙ্কুচিত হতো না। কোন দ্বিধাদ্বন্দ্বের বিড়ম্বনা দেখা দিত না।

সে কথা মনে পড়ে, কেন বিলেত যেতে চায়নি কেশব? বিলেত গিয়ে ম্লেচ্ছত্ব শিখবার ভয় আছে, সে জন্য নয়। বিলেত গিয়ে ইংরেজ-ভজনা শিখতে হবে, সেই অধঃপাতের আশঙ্কার জন্য নয়। কেশবের একমাত্র যা আশঙ্কা ছিল, মাধুরীর কাছে এসে হেসে নিজেই সে কথা জানিয়ে দিয়েছিল—বিলেত গিয়ে বদলে না যাই।

এ কিসের বদল, তা ভাষ্য করে বোঝবার কোন দরকার মনে করেনি কেশব। কারণ, যার কানে কানে একথা বলা হয়েছিল, সে সমস্ত হৃদয়ের আগ্রহ দিয়ে এ বাণীর অর্থ বুঝতে পেরেছিল একদিন। সব বদলে যাক্, শুধু যেন হৃদয়ের কোন বদল না হয়। যে আশ্বাসে ও নিষ্ঠায় আজকের হৃদয়ের অনুরাগ সত্য হয়ে রয়েছে, তার কোন পরিবর্তন হয় না। সেখানে পরিবর্তন অর্থই অধঃপতন, সকল বিশ্বাসের অসম্মান।

হঠাৎ যেন মাধুরীর অন্তর্লোক থেকে একটা ভয়ের শিহরণ ঠাণ্ডা আব-ছায়ার মত দৃষ্টি ঝাপসা করে আনে। বিলেত গিয়ে সত্যিই লোকে বদলে যায়। কি এমন মোহ আছে সেখানে। এত সুন্দর ভারতবর্ষের রূপে যারা লালিত, তারা বিদেশে বিলেতে গিয়ে ভুলে যাবে কোন্ ছলনায়? পরিতোষ বিলেতে রয়েছে। তার মনে কোনদিন এ দুর্বলতা ছিল না, মাধুরী সে কথা ভাল করে জানে। পরিতোষের প্রতিভায় সেই শক্তি আছে। শত কাজের ভিড়ে থাকুক পরিতোষ, শত রূপ আর নতুন বৈভবের মোহ তার সম্মুখ দিয়ে যাওয়া আসা করুক, কি করে সে ভুলে যাবে দূর স্বদেশের একজোড়া প্রতীক্ষাকুল দৃষ্টির অহরহ কামনা। পরিতোষও

বিলেত গেছে, বদলে যাবার জন্য নয়। যেমনটি সে গিয়েছে, তেমনি ফিরে আসবে।

মাধুরী বুদ্ধিমতী মেয়ে। তার সবচেয়ে বড় গুণ—সে নিজেকে বিচার করতে পারে। স্পষ্ট করে তার ইচ্ছা-অনিচ্ছার কথা বলতে পারে। যুক্তি না পেলে যুক্তি খুঁজতে চায় না। কেশব ভট্টচায সেই পাঁচ বছর আগেকার গাঁয়ের ছেলে হযে আজও রয়ে গেছে, এই অপরিবর্তনীয় নিষ্ঠাকে মাধুরীর ভাল লাগেনি, কিন্তু আজ সেই মাধুরী সকল মনের ভয় আশঙ্কা ও আগ্রহ দিয়ে কামনা করে, পরিতোষ যেন বদলে না যায়। অবিচল ও অপরিবর্তনীয হয়ে থাকুক পরিতোষ। আরও তিন বছর পরে সে ফিরে আসবে, কিন্তু এর মধ্যে যেন ব্যতিক্রম না হয়।

মাধুরী তার ভুল বুঝতে পারে। তার দুর্বলতা বুঝতে পারে। কেশব ভট্চায তার হৃদযের পরিধি থেকে দূরে সরে যাযনি, অবিচল হয়েই ছিল। কিন্তু মাধুরীই তাকে দূরে সরিযে দিযেছে। কেশব ভট্চাযের অপরিবর্তনীযতা তার কারণ নয। মাধুরী আজ মনে প্রাণে চায, যেন কেউ বদলে না যায। হৃদযের সাথীত্বে যেন পথ বদল না হয। তবু কেন যে কেশব ভট্চাযকে আজ ভয করে, পরিতোষের জন্য মায়া হয, কোন কারণ খুঁজে উঠতে পারে না মাধুরী।

বাড়ির দিকে এগিয়ে চললো মাধুরী। ভবিষ্যৎকে যদি সহজভাবে, সকল আনন্দে পেতে চায়, তবে এভাবে আর চলতে পারে না। সকল বিষযে স্পষ্ট হযে যাওযাই ভাল। নিজের মনের কামনাকে সত্য-মিথ্যা করার জন্য কোন অজুহাত খুঁজে লাভ নেই। যা মন চায়, তাকেই সে স্বীকার করে নেবে। নিজেকে সকল জটিলতা থেকে মুক্ত করতে হলে আজ এই সত্য বিনা দ্বিধায় ঘোষণা করার সময় এসে গেছে। কেশব

ভট্টচায পাঁচ বছর আগেকার কাহিনীর মধ্যেই কিশোর দিনের সেই নতুন আলোর প্রীতির শিখরে অটুট হয়ে থাকুক, কিন্তু শুধু এক স্মরণীয় ও বরণীয় কাহিনীর মধ্যেই। কোন দিক দিয়ে আজ আর সেই কাহিনীকে জাগিয়ে তোলবার ভরসা নেই, সেই নিয়মও নেই যেন। কেশব ভট্টচাযও জেনে শুনে নিশ্চিন্ত হয়ে যাক্, যেন পুরাতনের দাবী তুলে সে বর্তমানকে আর বিভ্রান্ত না করে। সুখে থাকুক কেশব, কোন দিন তার ওপর মাধুরীর কোন ঘৃণা না আসে। কেশবদা—হোক্ না গ্রাম্য নিরীহ বিশ্বাসী অবিকার প্রেমের উপাসক। কেশবদা বুঝুক, পৃথিবীতে অনেক ঘটনা আছে, যা বিনা কারণেই আসে, বিনা কারণেই ইতস্ততঃ উধাও হয়ে যায়। আবির্ভাব তিরোভাবের কোন ছন্দেবাঁধা নিয়ম নাই। এ সত্য বুঝতে পারলে কেশব ভট্টচাযেরও অনেক ভুল চুকে যাবে, অনেক ভ্রান্তি থেকে মুক্ত হবে। এতে কেশব ভট্টচাযের উপকারই হবে।

আর দেরি করা উচিত নয়। আর একটু পরেই খাওয়া-দাওয়া সেরে কেশবদার বাড়ি যাবে মাধুরী। জেঠীমার সঙ্গে দেখা করতে হবে। আজ আর মনের মধ্যে কোন সঙ্কোচ বয়ে নিয়ে যাবে না মাধুরী। পাঁচ বছর আগের স্বাভাবিক স্বাচ্ছন্দ্যে ও সরল আবেগে পাঁচ বছরের ঘোর দুর্জ্ঞেয় ব্যতিক্রমের সত্যটুকু ঘোষণা করে আসবে।

ঘরে ফিরে নানা কাজের ব্যস্ততার মধ্যেও কিন্তু নিশ্চিন্ত হতে পারছিল না মাধুরী। জীবনের একদিকের বাধা ও ভ্রান্তিকে আজ অস্বীকার করবার প্রতিজ্ঞা সে নিয়েছে। সেই সাহস তার আছে। কিন্তু তবু কেন সে নিশ্চিন্ত হতে পারে না? একদিকের দ্বন্দ্ব মিটে গেলে, আর একদিকে কোন দ্বন্দ্ব থাকে না। সেদিকে মিলনের পথ আপনিই খুলে

যায়। কেশব ভট্চায যদি বিনা বেদনায়, বিনা অনুশোচনায়, বিনা চোখের জলে আজ তার জীবনে অস্বীকৃত হয়ে যায়, তবে পরিতোষ তার কাছে আর কোন সমস্যাই নয়। পরিতোষের আবির্ভাব না হলে কেশব ভট্চাযও তার জীবনে কোন সমস্যারূপেই দেখা দিত না। অঙ্কের মত যে-নিয়মকে সত্য বলে মনে হয়, পর মুহূর্তে সেই সত্যে সংশয় আসে কেন? আবার পরিতোষের কথা ভাবতে হয় কেন?

সঞ্জীববাবু বলছিলেন—কালই ফিরে যাব মীরগঞ্জে। এখানে তোর তো আর কোন কাজ নেই মাধু?

মাধুরী অন্যমনস্কভাবে উত্তর দিল—না।

সঞ্জীববাবু—সবার সঙ্গে দেখা হয়েছে?

মাধুরী—হ্যাঁ।

সঞ্জীববাবু—কেশবের মা'র সঙ্গে একবার দেখা করতে ভুলিস্ না।

মাধুরী—হ্যাঁ, আজ দেখা করবো।

সঞ্জীববাবু কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বললেন—যদি কেশবের সঙ্গে দেখা হয়, তবে আমার কাছে একবার আসতে বলিস্।

মাধুরী—বলবো।

সঞ্জীববাবু একটু আশ্চর্য হলেন। তিনি হয়তো মাধুরীর কাছে একটু আপত্তির কথা শোনার জন্যই প্রস্তুত ছিলেন। এসব কথার উত্তরে একটু আপত্তি করাই মাধুরীর পক্ষে স্বাভাবিক। কিন্তু কেশবের প্রসঙ্গে মাধুরীর কোন বিচলতার লেশ মাত্র নেই। সঞ্জীববাবু মনের বিস্ময় চেপে নিয়েই যেন তাকিয়েছিলেন। মাধুরীর এতটা সপ্রতিভ নির্লেপ হয়তো তিনি আশা করেন নি। হয়তো তিনি ভেবেছিলেন, এ অনুরোধ শুনে মাধুরী একটু বিরক্তই হবে।

সঞ্জীববাবু চুপ করেই রইলেন। মাধুরী ঘরের মধ্যে ঢুকে একটা চরকা নিয়ে টানাটানি করছিল, সঞ্জীববাবু যেন বিরক্ত হয়ে ডাক দিলেন—কালই মীরগঞ্জে ফিরবো মাধু।

মাধুরী—বেশ।

সঞ্জীববাবু—বড় বেশি হাঙ্গামা বাধছে চারদিকে। না বুঝেসুঝে কোন কাজে হাত দিও না। এসব কাজ তাদেরই সাজে যারা···।

মাধুরী হাসতে হাসতে প্রশ্ন করলে—কাদের এসব কাজ সাজে বাবা?

সঞ্জীববাবু—আন্দোলন চলাবার মত মাত্র একটি মানুষ আছে এ গাঁয়ে।

মাধুরী—কিন্তু সে এইসব আন্দোলন পছন্দ করে না।

সঞ্জীববাবু—তুই একথা বললেও আমি বিশ্বাস করবো না। তুই যে সব কাণ্ড করছিস্, এইসব হইচই হয়তো সে পছন্দ করে না।

মাধুরী মনে মনে ক্ষণিকের জন্য যেন পরাভূত হয়ে চুপ করে গেল। এই কথাই সে আজ কিছুক্ষণ আগে স্বয়ং তারই মুখ থেকে শুনেছে। কে জানে, হয়তো এই কথাই সত্য।

তার জন্য কোন দুঃখ নেই মাধুরীর। অনায়াসে এই স্বদেশীয়ানার অভিনয় ছেড়ে দিয়ে মীরগঞ্জে চলে যেতে পারে সে। যে সব চেয়ে উপযুক্ত, যে সত্যিকারের অধিকারী, সেই গ্রহণ করুক সকল কর্তব্যের দায়। তবু মাধুরী আর ভুল করবে না। আর নতুন করে কোন দ্বন্দ্ব ডেকে আনবে না জীবনে। আজ এখুনি পরিতোষকে চিঠি লিখতে হবে।

একই ডাকে দু'দুটো চিঠি লেখা হলো পরিতোষকে। কাল রাত্রে একখানা লেখা হয়েছিল, আবার আজ আর একটি। একই সঙ্গে দুটো চিঠি পাবে পরিতোষ, চিঠি পেয়ে সে কি বুঝবে কে জানে। শুধু নিশ্চয়

এইটুকু বুঝতে পারবে, মাধুরী একা পড়ে আছে। তার চারিদিকে শঙ্কটের ঢেউ ক্রুষে উঠেছে। এমন সময় আর দূরে সরে থাকা উচিত নয়।

চিঠি লেখা শেষ হলে মাধুরী নিজেই আশ্চর্য হযে বুঝলো পরিতোষকে সে পত্রপাঠ দেশে ফিরতে লিখেছে।

লেখা শেষ করেও তার হাত কাঁপছিল। যেন ঘোর বিপদে পড়ে ভযার্তের মত চিঠির লেখাগুলি পরিতোষকে আহ্বান করেছে।

হেড মাষ্টার দিনমণি বিশ্বাস গাঁয়ে ফিরে এসেছে। বোর্ডের প্রেসিডেণ্ট ভূদেব চাটুয্যও এসেছে। আজ সকাল থেকে গাঁয়ের বাতাসে একটা গোপন ঘটনার আভাস যেন অস্ফুট শব্দে ছুটোছুটি করে বেড়াচ্ছে। মান্দার গাঁয়ের অন্তঃকরণও যেন ক্লান্ত হয়ে পড়েছিল। নতুন একটা ঘটনার আক্রমণের স্পর্শ পেয়েও সাড়া দিতে পারছিল না। হঠাৎ একটু হতভম্ব ও একটু বিমূঢ় হয়ে গেছে মান্দার গাঁ। দিঘীর ঘাটের ধারে মাঠের ওপর অনেকগুলি উর্দিপরা মূর্তি দেখা যায়। মীরগঞ্জ থেকে পুলিসদল এসেছে। এখানে দাঁড়িয়ে দূর জেলা বোর্ডের সড়কের দিকে তাকালে দেখা যায, একটি মোটার গাড়ি চুপ করে দাঁড়িয়ে আছে। গাঁযের শান্ত মনের দুয়ারে আজকে ভোরেই যেন একটা রঙীন বাঘ থাবা পেতে বসে আছে। মোটর গাড়ির রঙচঙে মূর্তিটা সকালবেলায রোদে চক্‌চক্ করছিল। সদরে যাদের আনাগোনা আছে, দিঘীর ঘাটে প্রাতঃস্নান সারতে এসে তারাই সবার আগে এই গাড়িটিকে চিনেছে—খুব সম্ভব এস. ডি. ও সাহেবের গাড়ি।

ইউনিযন বোর্ড অফিসের মাথায় একটা বিবর্ণ ইউনিয়ন জ্যাক উড়ছিল। গাঁয়ের তিনটি পথের মোড়ে লেঠেল পুলিসের ছোট ছোট

এক একটি দল দাঁড়িয়েছিল। বোর্ড অফিসের বারেন্দায় একটা কম্বলের ওপর একটা প্রকাণ্ড দড়ির বাণ্ডিল, গোটা পঞ্চাশ হাতকড়া এবং একটা তুলো ব্যাণ্ডেজের ফাস্ট-এড্ বাক্স পড়েছিল। পুলিস ফৌজের লোকেরা মাঠের ঘাসের ওপর শরীর এলিয়ে শুয়েছিল। সঙীন লাগানো বন্দুকগুলি একসঙ্গে তিন চারটি করে চুড়ো বাঁধা হয়ে মাটির ওপর দাঁড় করানো ছিল।

কালকের আর আজকের সকালে কত প্রভেদ! আজ সারা মান্দার গাঁ এখনো নিঃশব্দে ঘুমোচ্ছে। সারা গ্রামের হর্ষ যেন আড়ালে লুকিয়ে রয়েছে। নিত্যদিনের মত জাগরণের নিয়ম ভুলে গেছে সবাই। হঠাৎ মনে হতে পারে, মান্দার গাঁ ভয় পেয়ে গেছে। এই আক্রমণের জন্য যেন প্রস্তুত ছিল না মান্দার গাঁ।

না, তা নয়। মধ্যরাত্রির অন্ধকারের মধ্যেই সারা গাঁয়ের কানে কানে এই খবর পৌছে গিয়েছিল। দিঘীর ঘাটের মাঠে কড়া বুটের শব্দের প্রথম আগমনের বার্তা সবাই জানে। প্রতি ঘুমন্ত ঘরের কানে কানে রতন চৌকিদার এই খবর জানিয়ে দিয়েছে। উর্দিহীন রতন চৌকিদার জীবনে এই প্রথম নতুন ধরণের পাহারা দিয়েছে। এই তো সেই রতন যে চিরকাল পুলিস ফৌজের আগে আগে পথ দেখিয়ে এসেছে, গাঁয়ের হৃৎপিণ্ডকে সদরের হাতের মুঠোয় তুলে দিয়েছে। আজ সব চেয়ে বেশি সতর্ক ও সশঙ্ক হয়ে আছে রতন। সারারাত ঘুমোতে পারেনি রতন। শুধু মান্দার গাঁ নয়, রাত্রির অন্ধকারে দৌড়ে দৌড়ে গফুরাবাদ পর্যন্ত চলে গেছে রতন। কারও জানতে বাকি নেই, এ কার চরম বোঝাপড়ার লগ্ন ঘনিয়ে এসেছে নিকটে। সদর থেকে দণ্ডধরের আবির্ভাব হয়ে গেছে গাঁয়ের মাটিতে। চরম কৈফিয়ৎ দিতে হবে।

এস. ডি ও রায় সাহেব কে. কে বাসুও প্রস্তুত হয়ে এসেছেন। মান্দার গাঁয়ের বিদ্রোহী আত্মাকে স্তব্ধ না করে তিনি ফিরবেন না। কিন্তু ক্রমেই বেলা বাড়ছিল। ছটফট করছিলেন কে. কে. বাসু। মাঝরাত্রি থেকে একটা রণক্ষেত্র প্রস্তুত করে অপেক্ষায় বসে আছেন। কিন্তু শত্রুর দেখা নেই।

ঠিক মধ্যাহ্নে মান্দার গাঁয়ের পথের মোড়ে মোড়ে ঢোল বাজাতে আরম্ভ করলো। এস. ডি. ও সাহেবের ঘোষণা চেঁচিয়ে শোনানো হলো—সমস্ত গ্রামের লোককে এই মুহূর্তে অর্ডার করা হলো, যেন প্রত্যেকে বিকেলের মধ্যে এসে ইউনিয়ন বোর্ড অফিসের সামনে দাঁড়িয়ে সরকারী পতাকাকে সেলাম জানিয়ে যায়, নচেৎ···।

ঢোলওয়ালা পুলিস জোরে চেঁচিয়ে একটা ফিরিস্তি পড়ে শোনাচ্ছিল—যাদের এই সেলামবাজীর কষ্ট থেকে রেহাই দেওয়া হলো। যারা পর্দানশীন স্ত্রীলোক, তাদের আসবার দরকার নেই। যারা সরকার পক্ষের লোক তাদের আসবার দরকার নেই।

কে. কে. বাসু আর একটা ফর্দ তৈরি করে দিয়েছিলেন—কারা সরকার পক্ষের লোক।

ঢোলওয়ালা পুলিস সারা গাঁয়ের পাড়া-পাড়া ঘুরে জানিয়ে দিয়ে গেল, সরকার পক্ষের লোকদের, গরহাজিরা মাপ করা হলো। বোর্ডের যারা মেম্বার আছে, তাঁদের আসতে হবে না। হেড মাষ্টার দিনমণি বিশ্বাস ও তাঁর বড়ির কাউকে আসতে হবে না, প্রেসিডেণ্ট ভূদেব চাটুয্যে ও তাঁর বাড়ির কোন লোককে আসতে হবে না। আর যাদের দাগীর খাতায় নাম আছে, তাদের কাউকে না আসলেও চলবে। এ ছাড়া যারা আছ, সবাই অবিলম্বে চলে এস, সরকারী পতাকাকে সেলাম জানিয়ে যাও, নইলে···।

এস. ডি. ও কে কে বাসু শুধু একজনকে গ্রেপ্তার করতে চায়,—রতনকে। গ্রামের আর সবারই কসুর তিনি মাপ করে দেবেন। ঢোল-ওয়ালা পুলিস বার বার নিঝুম মান্দার গাঁয়ের ঘরে ঘরে বার্তা শুনিয়ে গেল।

এক একটি মুহূর্ত গুণতে গুণতে ক্লান্ত হয়ে পড়ছিলেন কে. কে. বাসু। পুলিসেরা গাছের ছায়ার নীচে ঘুমোচ্ছিল। গাঁজার দোকানের শীর্ণ বারান্দার এক কোণে টুলের ওপর বসে কে. কে. বাসু এক একবার চমকে উঠছিলেন, চারদিকের নিস্তব্ধতায়। বিকেল হয়ে আসছে, তবু কোন অনুতপ্ত ক্ষমাপ্রার্থী বিদ্রোহীর দেখা নেই। দিঘীর ঘাটের পথে একটা ছায়ার সাড়াও দেখতে পাওয়া যায় না। রতনকে যারা গ্রেপ্তার করতে গিয়েছে, তারাও এখনো ফিরলো না।

পুলিস ইনস্পেক্টরকে কাছে ডেকে একবার পরামর্শ করলেন কে. কে. বাসু। কিছুক্ষণ পরে আবার গাঁয়ের পথে নতুন নির্দেশ ঢোলের সঙ্গে বেজে উঠলো—যারা সরকারের পক্ষে আছে, যারা হাঙ্গামার বিরুদ্ধে, তাদের সবাইকে বোর্ড অফিসের প্রাঙ্গণে জমা হতে হবে। শান্তি সভা! শান্তি সভা! এস. ডি. ও কে কে বাসু সবাইকে ডাকছেন!

বিকেল হয়ে মান্দার গাঁয়ের গাছের ছায়া পূর্বদিকে লুটিয়ে পড়ছিল। মাছরাঙার দল দিঘীর জলের ওপর লাফঝাঁপ শেষ করে গাছের পাতার আড়ালে লুকিয়ে পড়ছিল। একটি একটি করে সরকার পক্ষের লোকেরা এসে বোর্ড অফিসের আঙিনায় ভিড় করছিল। হেড মাষ্টার দিনমণি সপরিবারে এসেছেন, দুগ্ধপোষ্য শিশুদেরও তিনি সঙ্গে নিয়ে এসেছেন। ভূদেব চাটুয্যের বাড়ির সবাই এসে পৌঁছে গেছে। আরও অনেকে আসছে একে একে—দাগী চণ্ডী তেলী, রঙ্গিম বেদে, ভজু বাউরী…।

কে. কে. বাসু বিমর্ষ ভাবে বললেন—সরকার পক্ষে মাত্র এই ক'জন ? আর যোগাড় করতে পারেন না ?

ইনস্পেক্টর বললেন—হাঁ, আরও দু'জন হতে পারে, তার বেশি নয়। কে. কে. বাসু বললেন—শীগ্‌গির করুন।

ইনস্পেক্টর তাঁর হাতের ফাইল একবার ঘাঁটাঘাটি করলেন। একজন কনস্টেবলকে বললেন—দাগী গোবিন্দ কুরমিকে ডেকে নিয়ে এস।

জনতার মাঝখান থেকে ভজু উত্তর দিল—গোবিন্দ বুড়ো আসতে পারবে না হুজুর। উহার চলবার ক্ষমতা নাই। আজই মরবে।

ইনস্পেক্টর—কি হয়েছে ?

ভজু—বুড়া দু'দিন হতে রক্ত-বমি করছে।

ইনস্পেক্টর একটু বিব্রতভাবে তাকালেন কে. কে. বাসুর দিকে। কে. কে. বাসু সত্যই মুসড়ে পড়ছিলেন। সমস্ত ঘটনাটা যেন কি একটা ধূর্ত কৌশলে তাঁর সকল আয়োজনের সাগ্রহ নিষ্ঠাকে ফাঁকি দিয়ে ধরাছোঁযার বাইরে সরে রয়েছে। যুদ্ধে মারখেযে পরাজযের ক্ষতচিহ্ন নিযে সদরে ফিরে যাওযা ববং তাব চেযে বেশি কাম্য, তাতে মর্যদার হানি নেই, পদ ও খেতাব তাতে বাড়বে বই কমবে না। কিন্তু এভাবে শুধু নিছক প্রতীক্ষায একেবাবে বাতিল হযে গেলে, তাঁর ভবিষ্যৎ কোন্‌ অন্ধকারে দিশাহারা হযে যাবে, কিছুই বুঝতে পারেন না তিনি, তাই হঠাৎ চারিদিকের নিস্তব্ধতায চমকে ওঠেন।

ইনস্পেক্টরের দিক একটু অসহাযভাবে তাকালেন কে. কে. বাসু।

—মাত্র এই কয়টি মানুষ দিযে শান্তিসভা হয না। সদরে ফিরে গিযে কি রিপোর্ট দেব বলুন ? অন্ততঃ আরো কিছু লোক চাই।

ইনস্পেক্টর কিছুক্ষণ চিন্তা করে নিযে দু'জন কনস্টেবলকে নির্দেশ

জানালেন—যাও, গোবিন্দ কুরমিকে কাঁধে তুলে নিয়ে এস। নিয়ে আসতেই হবে।

কনস্টেবল দু'জন চলে যাবার পর জনতার মধ্যে ভজু আবার উস্‌খুস করতে লাগলো। কি যেন একটা কথা তার বলবার আছে। ইনস্পেক্টর সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে তার দিকে তাকাতেই ভজু বললো—আর একজন নতুন দাগী আছে হুজুর, তাকে খবর দিলেই আসতো।

ইনস্পেক্টর—কে?

ভজু—ভট্‌চাযদের ছেলে, কেশব ভট্‌চায; হালে খালাস পেয়ে গাঁয়ে এসে রয়েছে।

ইনস্পেক্টর একজন কনস্টেবলের দিকে তাকালেন। নির্দেশ দিলেন—যাও কেশব ভট্‌চাযকে ডেকে নিয়ে এস।

সারা মান্দার গাঁ চুপ করে আছে। সঞ্জীববাবু চুপ করে বসেছিলেন। মাধুরী চুপ করে বসেছিল। শুধু চুপচাপ এক একটি খবর আসছে। গফুরাবাদে খুব জোর হাঙ্গামা বেধেছে। দলে দলে গ্রেপ্তার হয়েছে। সাঁওতালেরা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে পুলিসের লাঠির মার খাচ্ছে। তীর ধনুক টাঙি ফেলে দিয়ে তারা চুপ করে শালবনের ছায়ায় দাঁড়িয়ে আছে। ডাকলে কাছে আসে না, মারলে নড়ে না। জেলা বোর্ডের সড়কে নতুন পুলের ওপর তিন গাঁয়ের লোক জমা হয়েছে। পুলের দু'দিকে দু'সার পুলিস দাঁড়িয়ে আছে। অনেকে গ্রেপ্তার হয়েছে। ভিড় না হঠে গেলে, এবার মার আরম্ভ হবে।

এক একটি খবর শুনে সঞ্জীববাবু মাধুরীর দিকে তাকিয়ে দেখেন। মাধুরী মুখ নামিয়ে নেয়। চারদিকে ঝড় মেতে উঠেছে, তবু মাধুরী যেন

ঝাপ্টা থেকে নিজেকে এড়িয়ে এক কোণে মুখ গুজে পড়ে থাকতে চাইছে। সঞ্জীববাবুর মুখের ভাব ক্রমেই মলিন ও বিমর্ষ হয়ে আসছিল। তাঁর মনের শঙ্কা ও সন্দেহটা যেন আজকের পরীক্ষার দিনে সত্য প্রমাণিত হতে চলেছে।

সঞ্জীববাবুর এতটা চিন্তা করার কোন কারণ ছিল না, যদি তিনি দেখতেন প্রতিদিনের মত একটি উৎসাহের শিখা হযে মাধুরী আজও ঘরের বাইরে গাঁয়ের পথে নেমে পড়েছে। ঘরের সবাইকে ডাক দিচ্ছে, ঝড়ের মুখে গাঁয়ের সকল প্রতিজ্ঞার কাঠিন্যকে দাঁড় করিযে দিয়েছে। পুলিস ফৌজের আবির্ভাব গ্রামকে চুপ করিযে দেবে না, বরং ঘরে ঘরে শঙ্খ বেজে উঠবে। প্রতিদিনের মত মাধুরী আবার জনতার পুরোভাগে দাঁড়াবে। এই রকম একটা সুদৃশ্যের আশা হযতো মনে মনে কামনা করেছিলেন সঞ্জীববাবু। কিন্তু সংশয ছিল, শেষ পর্যন্ত মাধুরী ·।

মনে মনে একটা যন্ত্রণা অনুভব করছিলেন সঞ্জীববাবু, বিবেকের ধিক্কারের মত। আজকের ঘটনার সঙ্গে সঙ্গে কেশব ভট্চাযের কথা যে বার বার মনে পড়ছে, তার কারণও তাই। কেশব ভট্চায বিলেত যায়নি। নাই বা গিয়েছিল, কিন্তু সেই জন্য কি··। পরিতোষ বিলেত গেছে, কিন্তু আজও মাধুরীর জীবনের ইঙ্গিতের সঙ্গে তার মত পথ কর্তব্য ও আদর্শের সূত্রটি অটুট আছে কি? বার বার সন্দেহ হয় সঞ্জীববাবুর। কেশব আজ অনেক দূরে সরে গেছে, পর হয়ে গেছে। তা না হ'লে আজ মাধুরী এভাবে অসহায় হয়ে পড়তো না। হাঙ্গামার খবর শুনে চুপ করে মাটির দিকে তাকাতো না।

সঞ্জীববাবু বললেন—তুই চুপ করে আছিস কেন মাধুরী?

মাধুরী—কিছু ভেবে পাচ্ছি না।

সঞ্জীববাবু—তুই পারবি না।

মাধুরী চম্‌কে উঠে প্রশ্ন করলো—কি পারবো না বাবা ?

সঞ্জীববাবু—আজকের সমস্যাকে সমাধান করা তোর শক্তিতে কুলোবে না।

মাধুরী—শেষ পর্যন্ত পেরে যাব আশা আছে।

সঞ্জীববাবু হাসলেন—আমি অপেক্ষায় আছি। দেখি কতদূর কি করতে পারিস।

বিদ্যাপীঠের ছেলেরা এসে খবর দিল—রতন চৌকিদার গ্রেপ্তার হয়েছে। কোমরে দড়ি বেঁধে বোর্ড অফিসের বারান্দায় একটা খুঁটোর সঙ্গে বেঁধে রেখেছে রতনকে।

মাধুরী ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে রইল। বিদ্যাপীঠের ছেলেরা আবার সাগ্রহে জিজ্ঞাসা করলো—এবার কি করতে হবে বলুন ?

গফুরাবাদের চাষীরা গাঁয়ের মান রেখেছে, প্রতিজ্ঞার মর্যাদা রেখেছে। দূর ডিহির সাঁওতালেরা তাদের শপথ ভোলেনি। কিন্তু সকল আন্দোলনের যে সঞ্চারিণী শিখা, সেই মাধুরী যেন ক্লান্ত হয়ে গেছে, নিরুজ্জ্বল প্রদীপের মত।

ছেলেরা আবার প্রশ্ন করলো—রতনকে কি এই ভাবে আমরা বিদায় দেব ? কি ভাববে রতন ?

ছেলেরা মর্মে মর্মে লজ্জিত হয়ে পড়ছিল। মাধুরীর অন্যমনস্কতা যেন কঠিন আবরণের মত তার সত্তার সকল চঞ্চলতাকে চেপে রেখেছিল। আজকের সঙ্কটে সত্যিকারের কাজের আহ্বান এসেছে। মাধুরীর জীবনের আদর্শের সব চেয়ে পরীক্ষা এসেছে। তবে স্বদেশীর দীক্ষাকে

আজ ইচ্ছে করলে সে চরমভাবে শুদ্ধ করে নিতে পারে। ইচ্ছে করলে ভুলও করতে পারে। সকলের জাগরণের ছন্দে আজ সুরের হাওয়া লাগতে পারে। সবই নির্ভর করে মাধুরীর ইচ্ছার ওপর।

মাধুরী জানে, তার মনের জড়তা এক্ষুনি নিঃশেষে উবে যাবে, যদি আজ তার একাকীত্বের গর্বকে আজ সে পরিহার করতে পারে। আজও যদি কেশবদার সামনে গিয়ে একবার দাঁড়ায়—একটি সহজ কথার দাবী জানায়—এস কেশবদা, তুমি ছাড়া গাঁয়ের কে মান রাখবে? মাধুরীর পৃথিবী বদলে যাবে সেই মুহূর্তে। সঙ্কটের ধাঁধা ঘুচে যাবে। আজকের কুযাশা এক ঝলক আলোকে ঝলসে যাবে। পথ দেখা দিবে। সেই পথে মাধুরী আর একা নেই। তার স্বদেশী ব্রতে আর আন্দোলনের ভৈরব পরিণামের মধ্যেও হাত বাড়ালেই একটি সাথীর হাতের নির্ভর সে খুঁজে পাবে। কিন্তু…।

মাধুরীরও কোন সংশয ছিল না। মান্দার গাঁয়ের স্বরাজের সঙ্কল্পে যে বাধা ঘনিযে এসেছে, তার চেয়ে বড় দ্বন্দ্ব ছিল তার নিজেরই অন্তরে। আজ কেশবদাকে ডাকলে, বিলাতের ডাকের চিঠি ব্যর্থ হয়ে যায়। এই পথে পা দিলে, আর এক পথ মুছে যাবে।

সঞ্জীববাবু ভুল বুঝেছিলেন মাধুরীকে। মাধুরীর স্তব্ধতাকে তিনি হয়তো ভীরুতা মনে করেছিলেন। কিন্তু কিসের ভীরুতা, সঞ্জীববাবু সেই ধারণা করতে পারেন নি।

পরিতোষের কাছে কালও চিটি দিয়েছে মাধুরী। ভোর হতে না হতেই যেন সেই লিপিকার প্রত্যেকটি আশ্বাস ও বাণীকে ব্যর্থ করে দেবার জন্য মান্দার গাঁযের দুযারে এক পরীক্ষার সশস্ত্র মূর্তি এসে দাঁড়িয়েছে। সারা মান্দার গাঁ প্রস্তুত হয়ে আছে। এই পরীক্ষার সকল

আঘাতের মুখে মান্দার গাঁ তার অদৃষ্টকে পেতে দিতে প্রস্তুত হয়ে আছে। শুধু একবার শাঁখ বাজালেই হলো।

বিদ্যাপীঠের ছেলেরা অধীর হয়ে উঠছিল। কিন্তু মাধুরী সাড়া দিতে পারছিল না। পুলিস এসে যদি সকলকে বাদ দিয়ে এক্ষুনি শুধু মাধুরীকে গ্রেপ্তার করে নিয়ে যায়, তবেই যেন মাধুরী মুক্তি পায়। মনে মনে তাই কামনা করছিল মাধুরী। সারা গাঁয়ের বিদ্রোহের ঝড়কে পরিচালনা করবার কৌশল ভেবে উঠতে পারে না, ভয়াবহ মনে হয় প্রতিপদে ভুল হয়ে যাবে।

জেলা বোর্ডের সড়কে ধুলো উড়ছিল। গফুরবাদের বন্দী চাষীর দল পুলিস পাহারায় সদরে চলেছে। তাদের সহর্ষ জয়ধ্বনি শোনা যায়। বিদ্যাপীঠের ছেলেরা আরো চঞ্চল হয়ে ওঠে।

দলে দলে গ্রেপ্তার হবে, লাঠি চলবে, গুলী চলতে পাবে— মান্দার গাঁয়ের মূক মুখে একটি ধ্বনি জাগতেই যে পরিণাম দেখা দেবে, মনে মনে সবই কল্পনা করতে পারছিল মাধুরী। এই ঝঞ্ঝার আবির্ভাবকে এড়িয়ে যাওয়ার একমাত্র পথ, যদি শুধু মাধুরীকে গ্রেপ্তার করে পুলিস চলে যায়।

মাধুরীর মনের দ্বিধা যেন নিঃশব্দে জপের মত গাঁয়ের হৃদয়ের উচ্ছ্বাসকে শান্ত করে রাখবার চেষ্টা করছিল।

মাধুরী বললো—কোন হাঙ্গামা করবার দরকার নেই। পুলিস যদি আমাকে গ্রেপ্তার করতে চায় করুক।

বিদ্যাপীঠের ছাত্রেরা আশ্চর্য হয়ে বললো—শুধু আপনাকে গ্রেপ্তার করলে কি লাভ হলো?

প্রশ্নের উত্তরে মাধুরীর মনের ভিতরই ধ্বনিত হলো, বিদ্যাপীঠের ছাত্রেরা তা জানে না। সব চেয়ে বড় লাভ হয়, মাধুরী আজকের সঙ্কট

থেকে মুক্তি পায়। কেশব ভট্চাযের সান্নিধ্য ছেড়ে সে সরে পড়তে পারে। এ ছাড়া আর কোন পথ নেই। মাধুরী স্বদেশীয় সম্মান আর বিলাতের ডাকের চিঠির আশ্বাস, দুই সত্য অটুট থাকে।

আর তা যদি না হয়, কেশব ভট্চাযের অস্তিত্বকে যদি আবার পাশে পাশে শহরের মত গ্রহণ করতে হয়, মাধুরী জানে, আর তার মুক্তি নেই। সেই পুরাতন দিনের দাবীগুলি আবার পরিপূর্ণ বাতাসের নিঃশ্বাসে জেগে উঠবে। মান্দার গাঁয়ের অস্থির বজ্র দিযে তৈরী কেশব ভট্চাযের নেতৃত্বের কাছে মাধুরী টিকে থাকতে পারবে না। আবার পেছু পেছু চলতে হবে, পথ চেযে থাকতে হবে। মাধুরী সব বুঝে নিয়ে আবার সে পথে পা দিতে পারে না।

আর এক পথ ছিল। যা ইচ্ছে করুক বিদ্যাপীঠের ছেলেরা। হাঙ্গামা হোক, মান্দার গাঁযের স্বরাজের ব্রত চূর্ণ-বিচূর্ণ হযে যাক। মাধুরী আর সাড়া দিতে পারবে না। আজ এইখানেই তার ব্রত সাঙ্গ হয়ে যাক। বোর্ড অফিসের মাথায ইউনিযন জ্যাক উড়তে থাকুক, ঘরে ঘরে জাতীয পতকা অনাদরে কুঁচকে পড়ে থাক, মাধুরীর সঙ্গে আর এ সবের কোন সম্পর্ক নেই। হঠাৎ মীরগঞ্জ থেকে এসে গাঁয়ের বুকে আগুন ছুঁইযে দিযেছে মাধুরী। আবার হঠাৎ সে চলে যাবে। আজই চলে গেলে ভাল। মান্দার গাঁ পড়ে থাকুক তার ভাল-মন্দ অদৃষ্টের উপহার নিয়ে।

এতক্ষণ গম্ভীর হয়েছিল মাধুরী। কিন্তু এইবার চোখ ঝাপসা হয়ে আসে। নিজের সত্তাকে এত লঘু বলে ভাবতে পারে না, বিশ্বাস করতে পারে না মাধুরী। কলেজ ছেড়ে দেওযা, চরকা-ব্রত, দেশব্যাপী চাঞ্চল্যের প্লাবনে আত্মবিসর্জনের আনন্দের আস্বাদ, এ সবই কি তার মনের

কতকগুলি প্রগল্ভ ফ্যাসানের ক্ষণিক উচ্ছ্বাস ? এর মধ্যে কি কোন সত্য নেই ? হয়তো তার যোগ্যতা নেই, শক্তি নেই। হয়তো পদে পদে ভুল হয়, ভয় পেয়ে যেতে হয়। কিন্তু এরই মধ্যে সে যে আত্মগৌরবের প্রসন্নতা সৃষ্টি করেছে, প্রতিদিন নিভৃত চিন্তায় সকল তৃষ্ণা দিয়ে উপভোগ করে এসেছে, তাকে অস্বীকার করা যায় না। হয়তো খেলাচ্ছলেই নিজের অন্তরে এক নতুন সত্য সৃষ্টি করে ফেলেছে মাধুরী। তবুও তাকে উপেক্ষা করার মত শক্তিও যে পাওয়া যায় না। বুদ্ধির বিচার দিয়ে তাকে তুচ্ছ করলেও মন দিয়ে তাকে হেয় করা যায় না।

আবার মীরগঞ্জে ফিরে গিয়ে, আবার কলেজে ভর্তি হয়ে, আবার বিলেতের ডাকে একটি চিঠি দিয়ে পরিতোষকে খুশি করে দিয়ে । হ্যাঁ, করতে পারলে ভাল ছিল। কিন্তু সম্ভব নয়।

বিদ্যাপীঠের ছেলেদের মুখের দিকে তাকিয়ে সঞ্জীববাবুর তীক্ষ্ণদৃষ্টির অর্থ আভাসে বুঝতে পেরে, বিকেলের পড়ন্ত রোদের রক্তাভ আবেদনের স্পর্শ পেয়ে মাধুরী যেন ধীরে ধীরে বিচলিত হয়ে পড়ছিল।

ছেলেদের দিকে তাকিয়ে মাধুরী বললো—চল, কেশবদার কাছে আগে যাই, পরামর্শ করি, তারপর · ।

মুহূর্তের মধ্যে ছেলেদের চোখে-মুখে যেন একটা বিদ্যুতের উজ্জ্বলতা খেলা করে উঠলো।—আমরা তাই ভাবছিলাম মাধুরীদি। কেশবদা আজ আমাদের সঙ্গে থাকলে··।

কথাটা শুনতে পেয়ে সঞ্জীববাবু ধড়মড় করে উঠলেন। ধীরে ধীরে এগিয়ে আসলেন। তারপর মাধুরীর মাথায় হাত দিয়ে যেন আশীর্বাদের ভঙ্গীতে বললেন—আমিও তোকে এই কথাই বলতে চাইছিলাম মাধুরী। কালও বলেছিলাম, কিন্তু তুই বুঝতে পারিস নি।

ছেলেরা উল্লাসে কলরব করছিল। মাধুরী উঠে দাঁড়ালো। ছেলেরা তাদের মাতামাতির মধ্যে এক একবার হঠাৎ বিস্মিত হয়ে দেখতে পাচ্ছিল—মাধুরীর চোখের কোণে জলের ফোটা চিক চিক করছে।

সুরু হলো শুভ অভিযান। সঞ্জীববাবু বাড়ির বারান্দায় দাঁড়িয়ে একদৃষ্টি দিয়ে তাকিয়ে রইলেন।

পুরোভাগে উঁচু জাতীয় পতাকা ফরফর করে উড়ছিল বাতাসে। পেছনে সার দিয়ে শোভাযাত্রা। তেলিপাড়া, কামারপাড়া পার হয়ে শোভাযাত্রা এগিয়ে চললো। প্রতি পাড়ায় নতুন লোক এসে শোভাযাত্রায় ভিড় করছে। শাঁখের আওয়াজে গ্রামের হৃৎপিণ্ড গমগম করছে, সত্যাগ্রহের জন্য প্রস্তুত হয়ে একে একে সবাই আসছে। কালীতলার প্রাঙ্গণ পার হযে, ক্ষেতের আল ধরে, ভট্চায বাড়ির পুকুরের কাছে এসে শোভাযাত্রা থামলো।

কেশব ভট্চাযের বাড়ির ভেতর গিযে ঢুকলো মাধুরী।

শোভাযাত্রার হৃদয মথিত করে আর একবার তীব্র জয়ধ্বনি উথলে পড়লো। কেশব ভট্চায মাধুরীর সঙ্গে হাসতে হাসতে চলে আসছে।

কেশব একবার চারিদিকে তাকিয়ে যেন কাউকে খুঁজলো।—অজয় আসেনি ?

মাধুরী উত্তর দিল—না।

কেশব—চল, আগে ওকে ডেকে নিই।

মান্দার গাযের গোপন আবেগের অন্তর থেকে যেন শত স্রোত এসে শোভাযাত্রায মিশে গেছে। আজ আর কোন বিরোধের বেড়া কাউকে ভাগ করে রাখতে পারেনি। শোভাযাত্রার মাঝখানে দাঁড়িয়ে যে মাধব সামন্ত চীৎকার করছে, ঠিক তারই পেছনে রয়েছে হরেরাম সরকার।

মামলার বাদী-বিবাদী দুই শত্রু আজ এক হযে মিশে গেছে। মীরগঞ্জের আদালতে আজও এই মামলার নিষ্পত্তি হযনি, কিন্তু এখানে সব নিষ্পত্তি হযে গেছে।

শোভাযাত্রা এগিযে চললো দিঘীর পাড়ের দিকে। কেশবের মা সারদা দেবী উঠোনের কিনারায এসে দাঁড়িযেছিলেন। শোভাযাত্রার দিকে তাকিযে ছিলেন। কেশব আর মাধুরী পাশাপাশি দাঁড়িযেছিল। সারদার চোখে যেন একটা আশীর্বাদের দৃষ্টি জ্বলজ্বল করছিল।

অজয মিত্তিরের বাগানের পাশে পৌঁছে শোভাযাত্রী জনতা একবার জযধ্বনি করলো। অজয মিত্তির এসে সামনে দাঁড়ালো। চারদিকে তাকিযে অজয যেন কাউকে খোঁজ করলো। পরমুহূর্তে জনতার মধ্যে মিশে গেল অজয।

শোভাযাত্রা আরও কিছুদূর অগ্রসর হতেই একজন কনেস্টবল এসে দাঁড়ালো। বললো—এস. ডি ও সাহেব আর ইন্‌স্পেক্টর সাহেব কেশব ভট্‌চাযকে ডাকছেন।

কেশব এগিযে এসে উত্তর দিল—হ্যাঁ, এই তো যাচ্ছি।

দিঘীর পাড়ের মাঠে পৌঁছলো শোভাযাত্রা। পুলিস ফৌজ উঠে দাঁড়ালো। এস. ডি. ও কে কে বাসু এগিযে এসে পুলিস ফৌজের ঈশান কোণে শক্ত হযে দাঁড়ালেন। লাঠিধারী কনেস্টবলেরা সার বেধে দাঁড়িযে লম্বা হাঁক দিচ্ছিল—এক দুই তিন চার । হেডমাস্টার দিনমণি বিশ্বাস একটা চারপাযা টুল হাতে নিযে হন্তদন্ত হযে দৌড়ে এলেন, এস. ডি. ও সাহেবের পেছনে রাখলেন। বোর্ডের প্রেসিডেন্ট ভূদেব চাটুয্যে আরও ব্যস্তভাবে দৌড়ে এলেন একটা হাতপাখা নিযে। কে. কে. বাসুর ঘাড় বেযে ঘাম পড়ছিল। ভূদেব চাটুয্যে ব্যাকুলভাবে হাওযা দিতে সুরু করলেন।

কোমর-বাঁধা হয়ে খোঁয়াড়ের জন্তুর মত বোর্ড অফিসের বারান্দায় রতন বসেছিল বিমর্ষভাবে। আগত শোভাযাত্রার উল্লাসভরা মূর্তির দিকে তাকিয়েও তার মুখে কোন প্রসন্নতার আভাস ফুটে উঠছিল না। রতন যেন স্তব্ধ হয়ে গেছে। চোখের চাউনিতে উদাস ভাব। কপালে দুশ্চিন্তার কুঞ্চন। শোভাযাত্রার দিকে যেন অনেক দূর থেকে নির্লিপ্ত-ভাবে রতন তাকিয়েছিল। মাঝে মাঝে অজ্ঞাতসারেই তার দৃষ্টি পড়ছিল ভজুর দিকে। ভজুর কুৎসিত চেহারা যেন আজ আলোকে চকচক করছে। ভজুর ব্যস্ততার সীমা ছিল না। একবার ভূদেব চাটুয্যের কাছে গিয়ে প্রণিপাত জানায়, ফিসফিস করে কি সব রহস্যভরা কথা বলে। আবার দৌড়ে যায় ইন্‌স্পেক্টরবাবুর কাছে, বিচলিত কুকুরের মত একেবারে হাটু ঘেঁষে যেন আদরের আবদার নিয়ে বসে।

রতনের চোখ জ্বলে ওঠে, দৃষ্টি পড়তে থাকে। অন্য কোন অপমান ও নির্যাতনের কথা ভাবছে না রতন। মুখের ওপর কালশিটের দাগগুলিও এখন আর দপ্ দপ্ করে যন্ত্রণা দেয় না। দড়ির বাঁধনে কোন বেদনা নেই। চাকরি গেল, জেল হবে, মার হবে—কোন কিছুর ভাবনা নেই রতনের মনে। ওসব একেবারে ভুলে গেছে রতন।

শুধু মনে আছে গোবিন্দপুরের সেই ভস্মাণ্টিযার ছেলেটির কথা—কিছু ভাবনা করো না রতন, তুমি স্বরাজের চৌকিদার হবে। কথাটা বিশ্বাস করতে কেন জানি বড় ভাল লাগছিল রতনের। আজ এই মুহূর্তে, বোর্ড অফিসের বারান্দায় দড়ি-বাঁধা হয়েও বন্দী বন্য প্রাণীর মত রতন যেন ঝিমিয়ে ঝিমিয়ে সেই স্বপ্ন দেখছে। চোখ মেলে তাকালে কোন ভরসার চিহ্ন দেখতে পাওয়া যায় না। তার উদ্ভট স্বপ্নকে বিদ্রূপ করে, তার দুরাশাকে পরাভূত করে, চারদিকে ভ্রূকুটি থম্ থম্ করছে।

আশা করার আর কিছু নেই। তবু ভাবতে ভাল লাগে রতনের। মনের গোপনে এই স্বপ্ন দেখার একটা অদ্ভুত গর্ব যেন আনাগোনা করে। এরই মধ্যে সাফল্যের তৃপ্তি পায রতন। খুশি হযে ওঠে।

শুধু বিমর্ষ হযে ওঠে, ভজুব মূর্তিটা চোখে পড়লে। ভজুর ষড়যন্ত্র একে একে তার সকল গর্বকে ভুযো করে দিচ্ছে। এবার ভজুই চৌকিদাব হবে। না হযে পারে না, ইন্‌স্পেক্টরবাবু যেভাবে ভজুকে প্রশ্রয দিচ্ছেন, তাতে আর কিছু অস্পষ্ট রইল না। রতনের মনে হয, তার মৃত্যুর আগেই যেন চিতে সাজানোর কাজ আরম্ভ হযেছে। ভজু কাজ সারছে। বহুদিনের আকাঙ্ক্ষিত এই সুযোগকে ভজু কাযমনে আঁকড়ে ধরেছে। বহুদিনের আগের সেই পরাভবের প্রতিশোধ নিচ্ছে ভজু। টাকার জোরে, ঘুষের জোরে রতন দরিদ্র ভজুকে হারিযে দিতে পেরেছিল। সেদিন ভজু ছিল শত্রু আর প্রতিদ্বন্দ্বী। কিন্তু ভজু হাব মানেনি, আজ আবাব তার শত্রুতার সকল গর্ব ও সঙ্কল্প নিযে ভজু উঠে পডে লেগেছে। রতনের এক একবার ইচ্ছে হচ্ছিল, ভজুকে কাছে ডেকে জিজ্ঞেসা করে— কেন রে বাউরীর পো, এত সাধ কেন তোর? কি মধু আছে চৌকিদারীতে?

ভজুর ওপর রাগ আর ব্যর্থ প্রতিহিংসার আক্রোশ নিযেই রতন মাঝে মাঝে বিষণ্ণ হযে পড়ছিল। নইলে, মন খারাপ কবার মত আজ আব কোন আঘাত নেই। চৌকিদাব জীবনের সকল অনাচারের স্মৃতি আজও সে ভোলেনি। বহু পাপ সে নিজে হাতে পুষেছে। বহু অমঙ্গলকে একটা সিকি-আধুলির বিনিমযে সে প্রশ্রয দিযেছে। গাঁযের বহু মঙ্গলকে সে অপমান করেছে। এই তো সেদিন, কেশব ভট্‌চাযের মত মানুষকেও কী অপমান করেছে সে। প্রত্যেকটি অপকীর্তির ইতিহাস স্মরণ করতে

পারে, কিন্তু তার জন্য আজ সত্যি তার মনে কোন বেদনা নেই; রতন খুশি হয়, সে প্রায়শ্চিত্ত করতে পেরেছে। সে শুদ্ধ হতে পেরেছে। মান্দার গাঁয়ের অলক্ষ্য দেবতা আজ তার সব অপরাধ ক্ষমা করে দিয়েছেন।

চমকে উঠলো রতন। সত্যিই দেবতা ক্ষমা করে দিয়েছেন, যেন আকাশবাণীর মত সেই সত্য ধ্বনিত হচ্ছে।

শোভাযাত্রী জনতা জয়ধ্বনি করছিল—জয়, রতন সর্দার কি জয়! আনন্দের আতিশয্যে রতনের চোখ জলে ভরে গেল। এক একটি জয়ধ্বনির ঝাপ্‌টায় যেন তার সকল অপরাধের মালিন্য উড়ে নিশ্চিহ্ন হয়ে যাচ্ছে। রতনের জীবনের অন্ধকার রাত্রির পালা যেন ফুৎকারে উড়ে যাচ্ছে। ভোর হয়ে গেছে। এই সূর্য আর ডুববে না, আর রাত্রি আসবে না। আর উপায় নেই তার। আর চেষ্টা করলেও সেই প্রেতচ্ছায়ার জীবনে সে ফিরে যেতে পারবে না, ফিরে যাবার সব অধিকার বাতিল করে দিচ্ছে এই শোভাযাত্রী জনতার জয়ধ্বনি। এর মধ্যে কে না আছে? মাধুরীদিদি আছেন, কেশব ভট্‌চাযের মত মানুষ আছে। বামুনপাড়া, কায়েতপাড়ার ছেলেরাও আছে। মান্দার গাঁয়ের জীবনে এত বড় ঘটনা কখনো ঘটেনি, এর চেয়ে অভিনব বাণী কোনদিন ঘোষিত হয়নি। ছোটলোক রতন সর্দারকে আজ জয়ধ্বনি দিয়ে অভিনন্দন জানায় বড় ছোট সবাই। ঠিক বলেছে গোবিন্দপুরের ভলান্টিয়ার ছেলেটি, গান্ধীজীর আশীর্বাদে পৃথিবী বদলে যাবে। রতন আজ চোখের সম্মুখে দেখতে পাচ্ছে, পৃথিবী বদলে যাচ্ছে। নইলে এত অকপট মায়া, এত বুকভরা ক্ষমা, কোত্থেকে এল গাঁয়ের হৃদয়ে? এত সম্মান কোথা থেকে এল রতন সর্দারের অদৃষ্টে?

জনতা মাঠের ওপর একটা পতাকা দাঁড় করিয়ে ঘিরে দাঁড়ালো। আজ রতন সর্দারকে অজস্র সম্মানে তারা বিদায় দেবে, সদরের পথে, কারাগারের পথে। মান্দার গাঁয়ের নতুন সংগ্রামের জীবনে প্রথম সৈনিক বন্দী হয়েছে—রতন সর্দার। তাকে হেলাফেলা করে বিদায় দেওয়া যায় না। তার যাবার পথে কৌড়ি ছড়াতে হবে, শাঁখ বাজাতে হবে। জয়ধ্বনি করে গাঁয়ের সীমা পর্যন্ত যেতে হবে পেছু পেছু।

কেশব ভট্‌চায মাত্র তার বক্তৃতা আরম্ভ করেছে—আজ আমার সৌভাগ্য যে, পাঁচ বছর পরে আবার আমি ।

পুলিশদল জনতাকে ঘিরে ফেললো। কে কে. বাসু সরে গিয়ে আবার সেই অফিসের বারান্দায় টুলের উপর বসলেন। ভূদেব চাটুয্যে জোরে জোরে বাতাস করলেন।

ইন্‌স্পেক্টর জনতার চারদিকে একটা উদ্দেশ্য নিয়ে পায়চারি করছিলেন। এক অতি সতর্ক কর্তব্যের প্রেরণায় যেন ছটফট করছিলেন। তিনি ভয়ঙ্করভাবে প্রস্তুত হয়েছেন। জনতার অবিরল জয়ধ্বনি আর উত্তেজনার জোয়ার বেঁধে দিয়ে, মাঝে মাঝে ঘাড় বেঁকিয়ে দেখছিলেন।

ইন্‌স্পেক্টর একটু শক্ত হয়ে দাঁড়ালেন। ঘোষণা করলেন সকলকেই গ্রেপ্তার করা হলো।

জনতার উল্লাস দ্বিগুণবেগে উৎসাহিত হয়ে যেন প্রত্যুত্তর দিল। কিছুক্ষণের মত জনতার হর্ষ থামছিল না। এখুনি এক নতুন অভিযান আরম্ভ হবে। মান্দার গাঁ থেকে মীরপুর—মোট সাড়ে পাঁচ ক্রোশ। সারা পথ ধুলা উড়িয়ে, দু'পাশের গাঁ আর বস্তির হৃদয়ে নতুন মন্ত্র শোনাতে শোনাতে জনতা চলে যাবে। এমন সুযোগ পাওয়া যাবে, কেউ কল্পনা করতে পারেনি।

ভিড় থেকে একটু দূরে সরে দাঁড়িয়েছিল ভজু। ভজুর চাঞ্চল্য থেমে গেছে। একটু হতভম্ব হয়ে গেছে। এই উন্মাদনার অর্থ বুঝতে পারছিল না ভজু।

ভজু আর একটু পেছনে সরে গিয়ে যেন ক্লান্ত হয়ে বসলো। পীড়িত মানুষের মুখের মত তার চোখে মুখে একটা যন্ত্রণার ছাপ লেগেছিল। অনেক আশায় অনেক দূর এগিয়ে এসে ভজু যেন আবার পথ হারিয়ে ফেলেছে। সেদিনও পিকেটিংয়ের সময় সঞ্জীববাবুর মেয়ে মাধুরী হাতজোড় করে পথ ভুলিয়ে দিয়েছে। যে পথে এগিয়ে যেতে চেয়েছিল ভজু। সে পথে যেতে পারেনি। ভয় পেয়ে, লজ্জা পেয়ে, ক্ষেতের আল ধরে দৌড়ে যেতে হয়েছিল।

সত্যই ভজু কোন দিকে পথ করতে পারেনি। সেই গোপন অভিমানে তার ফুসফুস যেন পুড়ে পুড়ে জ্বলছিল। রতন স্বদেশী হয়ে গেছে, ঠাকুরমশাই গ্রেপ্তার হ'ল—সবাই যেন পাগল হয়ে গেছে, চোর-ডাকাত না হয়েও সবাই জেলে যেতে চায়, সবাই দাগী হয়ে গেল। এত দাগীকে কে পাহারা দেবে? কে ঘুম ভাঙিয়ে হাজিরা নেবে।

আর কাউকে চায় না ভজু, শুধু এই অহঙ্কারী ঠাকুরমশাই, আর রতন মণ্ডল। জীবনে অন্ততঃ এমন একটি দিনের গভীর রাত্রির অন্ধকার পেতে চায় ভজু, যেদিন ওদের স্বপ্ন থেকে হাঁক দিয়ে সে টেনে তুলবে, হাজিরা নিয়ে ছেড়ে দিবে। অবাধে হাত পেতে মাসের দস্তুরি দেড়টি টাকা দাবী করবে। সে আশার নেশা যেন হঠাৎ ছিঁড়ে গেছে। ভজুর নিরুৎসাহ মূর্তির মধ্যে তার পরিচয় পাওয়া যায়।

ভজু হঠাৎ দেখতে পেল—রতন ইসারা করে ডাকছে।

ভজু বিস্মিত হয়ে এগিয়ে এল। রতন বললো—আমি চললাম রে ভজু।

রতনের গলার স্বর যেন কথক ঠাকুরের গানের সুরের মত একটা ভক্তি লেগে রয়েছে। ভজু আশ্চর্য হয়ে বুঝবার চেষ্টা করছিল। রতনাও কেমন হয়ে গেছে।

রতন বললো—তুই আর চাটুয্যার সঙ্গে মিলামিশি করিস না ভজু।

ভজু বিদ্রূপ করে বললো—তোর ভয় নাই রে রতন। আমি আব চৌকিদার হব নাই, হতে পারলাম না।

রতন—ক্যানে?

ভজু— পঞ্চাশটা টাকা চাই। তাব কমে উহারা মানছে না।

রতন একটুখানি ভেবে নিল। তারপর বললো—তুই সত্যিই চৌকিদারী করবি ভজু?

ভজু—পেলে করতাম।

রতন—তাই করিস।

ভজু— কিন্তু টাকা?

রতন—শিবু পোদ্দারের কাছে আমি টাকা পাই। উহাকে আমি চিঠি দিয়ে বলে দেব, যেন তোকে পঞ্চাশটা টাকা দেয়।

ভজু রতনের মুখের দিকে বোকাব মত তাকিয়ে রইল। তার বিশ্বস্ত সংসারের পরিচিত নিয়ম-কাননগুলিও যেন উল্টেপাল্টে যাচ্ছে। চরমভাবে বিশ্বাস নষ্ট করেছে শত্রু রতন মণ্ডল। একটি কথায় ভজুকে একেবারে অসহায় করে দিয়েছে। এতক্ষণ ভজুর আকজ্ঞাব পথ ঠিক ঠিক চেনা ছিল, রতন আবার পথ ভুল করিয়ে দিয়েছে। বিদায় নেবার আগে রতন ভজুকে সুখী করে যাচ্ছে।

এস. ডি. ও কে কে বসু আগে আগে হেঁটে চললেন। কোমরে দড়ি-বাঁধা রতন চলেছে পেছনে, সঙ্গে একজন কনস্টেবল দড়ির একটা প্রান্ত মুঠো করে ধরে আছে। তার পেছনে বন্দী জনতা। বিদ্যাপীঠের ছেলেদের উল্লাসধ্বনির সঙ্গে পথচলা ধুলো মিশে গিয়ে অভিযানের রূপ আরো বিচিত্র হয়ে উঠছিল।

জনতার পেছনে আস্তে আস্তে হেঁটে চলেছিল কেশব ভট্চায। ক্ষণিকের জন্য একটা নিরর্থক বিষণ্ণতার স্পর্শ কেশবের ভাবনা মেদুর করে রেখেছিল—আবার গাঁ ছেড়ে যেতে হলো। মাত্র ক'টি দিন আগে যে পথে যে আগ্রহ নিয়ে সে মান্দার গাঁয়ে ফিরেছিল, আজ হঠাৎ সেই পথেই চলে যেতে হচ্ছে, সব কিছু পেছনে ফেলে।

কেশবের হঠাৎ মনে পড়ে—তার ভুল হয়েছে। আজ আর সব কিছু পেছনে ফেলে সে চলে যাচ্ছে না। পেছনে পেছনে সে আসছে। জীবনে এত বড় ঘটনার অনুগ্রহ কোনদিন হবে, কল্পনা করতে পারেনি কেশব। এর জন্য সে প্রস্তুত ছিল না। কিন্তু কেশবের সকল বিষণ্ণতা মুহূর্তে মুছে গিয়ে তার মনের আকাশে সহস্র নক্ষত্রের দীপ্তি ঝক্ঝক্ করে ওঠে। মাধুরী তারই সঙ্গে চলেছে।

পেছনদিকে তাকিয়ে কেশব বললো—পিছিয়ে পড়ছো কেন ?

মাধুরী এগিয়ে এসে সঙ্গে সঙ্গে চললো। কেশব গলার স্বর নামিয়ে বললো—পাশে পাশে হাঁটতে লজ্জা করছিল বুঝি ?

মাধুরী কোন উত্তর দিল না।

বন্দী জনতার অনেক পেছনে বুটের শব্দে হুটপাট করে চলেছিল পুলিস ফৌজ। পড়ন্ত রোদের স্নিগ্ধ আলোকের আশীর্বাদ নিয়ে মান্দার গাঁয়ের হৃদয়ের একদল মুখর প্রতিধ্বনি যেন বন্দী হয়ে চলেছে।

একেবারে পেছনে, ছিন্ন ধূলিজালের ভেতর দিয়ে তাকালে দেখা যায়, একটি মূর্তি একা একা অনুসরণ করে আসছে। সত্যিই ভজু একা পড়ে গেছে, অসহায় হয়ে গেছে। তার আসবার কোন প্রয়োজন নেই। তবু সে আসছে।

সূর্যাস্তের আভায় ডাঙার বুক লাল হয়ে গেছে। উৎসবের আনন্দে জনতা পথ ধরে চলছিল। বন্দী জনতার মনে-প্রাণে ও শরীরে কোন ক্লান্তির চিহ্ন ছিল না। নিজের ছন্দে দুলে দুলে তারা এগিয়ে চলছে। সাজসজ্জার ও অস্ত্রশস্ত্রের আড়ম্বরের চাপে ও কেতাদুরস্ত চালে হেঁটে হেঁটে ক্লান্ত হয়ে পড়ছিল পুলিসরা।

সবার পেছনে চলেছিল কেশব আর মাধুরী। দু'জনে মন খুলে গল্প করছিল। দেখে মনে হয়, এই ঘটনার বৈচিত্র্যের মধ্যে তারা দু'জনে একটা নিভৃত ঠাঁই বেছে নিয়েছে। হয়তো গল্প করার জন্যই তারা দু'জনে পিছিয়ে আছে, সবার সঙ্গে এরা দু'জনেও এক হয়ে আছে সন্দেহ নেই, কিন্তু এই স্বরাজের প্রতিজ্ঞা ছাড়া এদের নিশ্চয় ভিন্ন একটা প্রতিজ্ঞা আছে; এই দেশের ডাকের আহ্বান ছাড়া, আর একটা আহ্বান আছে। কেশব ভট্চাযের বিমর্ষ মুখে যে আজ এত তৃপ্তি উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছে, চোখের দৃষ্টিতে যে এত আনন্দের চাঞ্চল্য জাগছে, সে কি শুধু দেশজোড়া চাঞ্চল্যের একটি অংশ? আজ এই মুহূর্তে কেশবের মনে কি ভিন্ন কোন সুরের হাওয়া লাগছে না?

মাধুরী মাঝে মাঝে বিমর্ষ হয়ে পড়েছে। পথ চলার ক্লান্তি আছে। নিশ্চয় এটা একটা কারণ। কিন্তু তা ছাড়া কি আর অন্য কোন কারণ নেই? পরমুহূর্তে উৎফুল্ল হয়ে উঠছে মাধুরী, জীবনে যে পথ তৈরী হয়েছে বহু কামনায় ও বহু আকাঙ্ক্ষায়, সেই পথে হঠাৎ আজ ঘটনার আশীর্বাদে

যাহা সুরু হয়ে গেছে, মাধুরীর জীবনের প্রতিজ্ঞা তুচ্ছ এক ছলনার ইঙ্গিতে ভুল হয়ে যেতে চলেছিল, সেই ভুল থেকে রেহাই পেয়ে গেছে মাধুরী। মাধুরীর মন আজ আর কোন কপটতার, কোন সঙ্কোচ ও ভীরুতার ধার ধারে না। স্বরাজের প্রতিজ্ঞার পথে তার জীবনের প্রতিজ্ঞা এক হয়ে, এক জটিলতায় মিশে যেতে চলেছে। এর জন্য প্রস্তুত ছিল না মাধুরী, কিন্তু ঘটনার আবির্ভাব প্রমাণ করিয়ে দিল যে, পথ চিনতে পারলে সাথী চেনা যায়। পথ ভুল না করলে সাথীত্বে ভুল হয না।

কেশব বললো—তুমি বড় জব্দ হয়ে গেলে মাধুরী।

মাধুরী—তার প্রমাণ ?

কেশব—আমার পাশে পাশে আজ তোমাকে চলতে হচ্ছে, যা ভয করেছিলে, তাই হলো।

মাধুরী—ঠিক গুছিয়ে বলতে পারলে না কেশবদা। যা ভরসা করতে ভয হচ্ছিল, তাই হলো।

কেশব—আজ আর ফাঁকি রেখে কিছু বলো না মাধুরী।

মাধুরী কিছুক্ষণ চুপ করে রইল। শান্ত স্বরে বললো—একটু মিথ্যে আছে কেশবদা, কিন্তু তার জন্য আমার আব কোন ভয নেই। সেটা আমার জীবনের শাস্তি।

কেশবের মুখ ক্ষণিকের জন্য বিষণ্ণ হয়ে উঠলো।—একটু মিথ্যে আছে ?

মাধুরী—হ্যাঁ।

কেশব—শুনে খুশি হতে পারলাম না, তবু তোমার প্রশংসা করছি।

মাধুরী—আমার একটা স্বার্থ আছে।

কেশব—কি ?

মাধুরী—ইচ্ছে করে, এবারও আমার পাঁচ বছরের জেল হোক্।

কেশব—আর আমার ?

মাধুরী—তোমার যেন জেল-টেল না হয়।

কেশব—তা'তে কি লাভ হবে তোমার ?

মাধুরী—লাভ নয়, একটা পরীক্ষা হয়ে যাবে।

কেশব—কিশের পরীক্ষা ?

মাধুরী—মানুষের মনের, মানুষের বিদ্যার, মানুষের বুদ্ধির, মানুষের চেহারার।

কেশব হেসে ফেললো—তুমি কি প্রতিশোধ নিতে চাইছো আমার ওপর ?

মাধুরী—প্রায়শ্চিত্ত।

কেশব—এই পরীক্ষায় কি ফল আশা করছো তুমি ?

মাধুরী—আশা হচ্ছে, তোমাকে এসে দেখবো…।

কেশব—দেখবে যে আমি এম-এ পাশ করেছি, বিলেত থেকে একবার ফিরে এসেছি, একটা বড় অফিসের ছোট সাহেব হয়েছি।…

মাধুরী—তোমার ঠাট্টা বুঝতে পারছি কেশবদা। কিন্তু তুলনাটা ঠিক হলো না। তুমি পাঁচ বছর পরে ফিরে এসে কি মাধুরীর এই অধঃপতন দেখতে পেয়েছ ?

কেশব—অধঃপতন নয় পরিবর্তন।

মাধুরী—এখনো কি তাই মনে কর ?

কেশব—মনে করবার কারণ রয়েছে মাধুরী।

মাধুরী—কারণ আছে ?

কেশব—আমি একটা সত্যি কথা আবার বলি, আমার বিশ্বাস হয় না, তুমি এই আন্দোলনের মধ্যে একটা আন্তরিক আগ্রহ নিয়ে এসেছ।

মাধুরী—আমি যোগ্য নই।

কেশব—তুমি সব দিকে যোগ্য, কিন্তু এই কাজ থেকে তোমার হৃদয় দূরে সরে আছে। এর মধ্যে তুমি তোমার জীবনের কোন একটা আশঙ্কাকে পরীক্ষা করে দেখছো। হয়তো তোমার সেই আশা সফল হবে।

মাধুরী—তুমি নিশ্চয় অনুমান করতে পারছো সেই আকাঙ্ক্ষাটা কি?

কেশব—তুমি মুক্তি খুঁজছো।

মাধুরী—আমি?

কেশব—হ্যাঁ, জীবনের বহুদিন আগের একটা প্রতিজ্ঞাকে ভুলতে পারছো না, অস্বীকার করতে পারছো না। সেই প্রতিজ্ঞা তোমার এক বন্ধন হয়ে দাঁড়িয়েছে।

মাধুরী চুপ করে রইল। কেশব বললো—এই কারণেই আমার কিছু বিশ্বাস করতে ইচ্ছে করে না মাধুরী। তোমার স্বরাজের প্রতিজ্ঞা সেই জন্যেই আমার ভুয়ো মনে হয়।

মাধুরী—কিন্তু তোমার অধিকার তো কেউ কেড়ে নেয়নি কেশবদা।

কেশব—কেড়ে নেয় নি?

মাধুরী—সেটা তুমিও বুঝতে পারছো, নইলে আজ তুমি এত কড়া কথা আমাকে বলতে পারতে না। আমার সত্য-মিথ্যা নিয়ে তোমাকে তো কোন বাধা দিচ্ছি না কেশবদা।

কেশব—আর মিথ্যেটুকুই বা গোপন রাখছ কেন? তোমার মুখে শুনলেই খুশি হব।

মাধুরী—এই পাঁচ বছরে আমি অনেক কঠোর হয়ে থাকি কেশবদা, তুমি সেটা বুঝতে পারছো না। জীবনের প্রতিজ্ঞাকে চাপা দিতে পারি, জীবনের একটা মিথ্যাকে বাতিল করতে পারবো না?

কেশব—তুমি দ্বিতীয়বার ভুল করো না মাধুরী। মিছামিছি জীবনকে কতকগুলি যন্ত্রণা শুধু লাভ হবে, কোন স্থিতি পাবে না। চিরকাল ধরে বদলে যাওয়া উচিত নয়। পরিতোষকে আর বঞ্চনা করো না।

মাধুরী কেশবের দিকে চকিতে তাকিয়ে মাথা হেঁট করে চলতে লাগলো। অনেকক্ষণ ধরে বোকার মত দু'জনে শুধু হেঁটে গেলো। মাধুরী যেন একটু পিছিয়ে পড়তে পারলেই খুশি হয়। পাশে পাশে চলার দৃশ্য হঠাৎ একটা বিদ্রূপের ধিক্কারে যেন ছিঁড়ে গেছে।

মাধুরীই কথা বললো প্রথম—তুমি জান সে কথা?

কেশব—অজয়ের কাছে যেটুকু জানতে পেরেছি।

মাধুরী—অজয়দা কি সব কথা জানেন?

কেশব—তা জানি না।

মাধুরী—তা'হলে আজ আর বিচার করতে বসো বসো না কেশবদা, ভুল হবে।

কেশব—কবে বিচার করতে পারবো?

মাধুরী—যে দিন অভিযোগ সত্যি করে শুনতে পাবে, দেখতে পাবে, বুঝতে পারবে, সেইদিন।

মীরগঞ্জ পৌঁছতে এখনো দেরি আছে। মাধুরীর শরীর ও মন সত্যিই ক্লান্ত হয়ে পড়ছিল। এই শোভাযাত্রার মধ্যে যেন আর কোন শোভা নেই। এই মিছিলের উৎসাহের স্বরে মাধুরীর মন আর সাড়া দিতে পারে না। নিতান্ত অকারণে একটা পৃথিবীর উল্লাসকে যেন অনুসরণ করে চলেছে সে। কেশবদার কঠোর কথাগুলির সত্যতা যেন এই দৃশ্যটির সঙ্গেই ছদ্মবেশ ধরে রয়েছে। ক'টি মিনিট আগে অস্তোন্মুখ সূর্যের রঙিন আলোকে পুলকিত মাঠের রূপ কত ভাল লাগছিল। এখন এই ছায়াবৃত

স্নিগ্ধতার মধ্যেও যেন অসহ্য জ্বালা ছড়িয়ে রয়েছে। সেই ভাল-লাগার শক্তি যেন মনের ভেতর থেকে মুছে গেছে। কেশব ভট্চাযকে ঘৃণা করতে পারলে ভাল ছিল। কিন্তু এত বড় শক্তির সন্ধান কোথায়? পাঁচ বছর অদৃশ্য হযে থেকে, নির্বাসনের প্রতিটি মুহূর্ত শুধু বিগত দিনের এক প্রগল্‌ভ প্রতিজ্ঞাকে ধ্যান করে করে কেশব ভট্চায আরও কঠিন হযে গেছে। পাঁচ বছর ধরে মুক্ত জীবনের প্রসন্নতার মধ্যে প্রতিনিয়ত ভুল করে সেই প্রতিজ্ঞাকে শুধু শিথিল করেছে মাধুরী। তাই কি সে এত দুর্বল? নইলে কেশবের সঙ্গে তার জীবনের আর কি মিল আছে?

কেশব ভট্চাযের কাছে এই স্বদেশীযানা বোধ হয একটা হুজুগ ছাড়া আর কিছু নয। তবু সে এসেছে। কেন? মাধুরীর অনুরোধ উপেক্ষা করতে পারেনি কেশব ভট্চায। মাধুরীর মনে পড়ে—কেশবদা এসে দাঁড়িয়েছে তার পাশে, তারই আহ্বানে, নহলে কেশব ভট্চায আসতো না; কিন্তু কেন?

কেশব ভট্চাযের কাছে আর কিছু অজানা নেই। মাধুরীর ভ্রান্তির ইতিহাস, হৃদযের চপলতার সংবাদ আজ কেশব ভট্চায শুনতে পেয়েছে। এই আঘাত সহ্য করার মত কঠিনতা আছে কেশবের। কিন্তু তার জন্য নিষ্ঠুর হওয়া উচিত নয। মাধুরীকে ঘৃণা করার শক্তি আছে কেশবের। কিন্তু শক্তি থাকলেই কি ক্ষমা ভুলে যেতে হয? নইলে তাকে আর এত-দিন এবং আজও এত বড় করে দেখার কি অর্থ হয?

এ দ্বন্দ্বের কোন মীমাংসা নেই। মাধুরীর মন তিক্ত হযে ওঠে। একমাত্র মীমাংসা হতে পারে, যদি কেশব ভট্চায আজ মাধুরীকে মন থেকে ঘৃণা করতে পারে।

হঠাৎ মাধুরীর হাত ধরলো কেশব,—তুমি খুব ক্লান্ত হয়েছ।

ক্ষমার আশ্বাস নেই, তবু কেশবের কথায় মাধুরীর চিন্তার বেদনাগুলি হঠাৎ ধীরে ধীরে লঘু হয়ে আসতে লাগলো।

মাধুরী বলে—তুমি মিথ্যে বলনি কেশবদা।

কেশব—কি ?

মাধুরী—তোমার সঙ্গে বোঝাপড়া করাটাই যদি সমস্যা হযে থাকে, তার জন্য এখানে ভিড় করার কোন কারণ ছিল না। রাজনীতি, স্বদেশের ও স্বরাজের হুজুগের মধ্যে এই অভিনয় টেনে এনে লাভ কি ?

কেশব—তবে ?

মাধুরী—আমার সব হুজুগের আনন্দ তুমি নষ্ট করে দিলে। তোমার প্রশ্নের উত্তর না দিযে এর মধ্যে আর আসবো না।

কেশব হাসছিল—আমার কিন্তু কোন দ্বন্দ্ব নেই মাধুরী। এই হুজুগে আনন্দ নেই জেনেই আমি এসেছি। শুধু তোমাকে প্রশ্ন করবো বলেই এসেছি।

মাধুরী—তোমার প্রশ্নের সঠিক উত্তর দিতে পারবো, যদি আমার অন্ততঃ বছর পাঁচেক জেল হয। ফিরে এসে বলবো।

কেশব—এই তো মীরগঞ্জ থানা দেখা যাচ্ছে, আর পৌঁছুতে দেরি নেই। দেখা যাক্ তোমার ইচ্ছে পূর্ণ হয কি না হয ?

মীরগঞ্জ শহরের ধোঁয়ায ঢাকা সান্ধ্য-চেহারার মধ্যে একে একে আলো ফুঠে উঠছিল। মান্দার গাঁযের বন্দী জনতা ক্রমেই এগিযে আসছিল। শহরের অবসন্ন কলরবের সঙ্গে আগন্তুক জনতার উল্লাসধ্বনি মিশে গিয়ে চারিদিকে একটা বিচিত্র ধরণের হর্ষ সৃষ্টি করছিল। মীরগঞ্জের প্রবেশ পথের বড় চকের কাছে জনতা পৌঁছুতেই পুলিস দল

ব্যস্ত হয়ে উঠলো। চারিদিকের চার রাস্তা ধরে দলে দলে লোক দৌড়ে আসছিল। আজ সমস্ত দিন ধরে সারা শহরের মনটা একটা কৌতূহলে যেন ছটফট করছিল। সারাদিন ধরে গাঁয়ের দিক থেকে নানা খবর শহরের কানে এসে পৌঁচেছে। মৌশুমী ঝড়ের মত কোথা থেকে এক চেতনার হর্ষ দেশ থেকে দেশান্তরে ছড়িয়ে পড়ছে। এক গাঁ থেকে আর এক গাঁ, এক হাট থেকে আর এক হাটে। মীরগঞ্জ শহরও আজ বিশ দিন হলো উত্তেজনায় টলমল কয়ছে—পিকেটিং, শোভাযাত্রা, প্রভাতফেরী, বিদেশী কাপড়ের অগ্ন্যুৎসব। নিত্যব্রতের পুলকে সারা শহর মাতোয়ারা। পাণ্টা ভ্রূকুটি আর হুঙ্কারেরও বিরাম নেই। কোতোয়ালীর গায়ে যেন গৃহদাহের জ্বালা লেগেছে। নিত্য গ্রেপ্তার আর লাঠি চার্জ।

আজ সারাদিন ধরে গাঁয়ের দিক থেকে দলে দলে লোক গ্রেপ্তার হয়ে আসছে। প্রায় একশো সাঁওতাল নরনারীকে এখনো ময়দানে বসিয়ে রাখা হয়েছে, পুলিস পাহারা মোতায়েন আছে। গফ্‌রাবাদ থেকে একদল চাষীকে কোমরে দড়ি বেঁধে নিয়ে আসা হয়েছে। একটা পুরনো গালা-কুঠিকে নতুন হাজত করা হয়েছে, নতুন বন্দীদের নিয়ে এসে একে একে আটক করা হয়েছে তারই মধ্যে।

সন্ধ্যার আলো জ্বলে উঠতেই মীরগঞ্জ খবর শুনলো—এইবার অসছে, মান্দার গাঁ। সারা শহরে খবব ছড়িয়ে পড়েছে। মীরগঞ্জের জাগরণের সুর, আবেগ আর চঞ্চলতার উপঢৌকন নিয়ে এই তো মাত্র কয়েকদিন আগে মাধুরী দেবী গিয়েছেন মান্দার গাঁয়ে। মান্দার গাঁয়ের চিত্তে আন্দোলনের দোলা লেগেছে। মান্দার গাঁয়ের মুক্ত প্রাণ ছুটে এসেছে। বহুকালের অবসাদ থেকে হঠাৎ গা-ঝাড়া দিয়ে জেগে উঠেছে।

চকের কাছে মস্ত ভিড় জমে উঠেছিল। মীরগঞ্জ শহরের ইতিহাসে এক অভিনব দৃশ্য। গ্রামকে অভ্যর্থনা করবার জন্য আজ পর্যন্ত কোন-দিন সারা শহরের হৃদয় এভাবে একত্রিত হয়নি। আজ যে শুধু হৃদয় বিনিময়ের লগ্ন। মীরগঞ্জের আত্মা ছুটে যায় মান্দার গাঁয়ে, মান্দার গাঁয়ের আত্মা ছুটে আসে মীরগঞ্জে।

স্বতন্ত্র ভারত কি জয়! চকের জনতার বুক থেকে এক ভৈরব নিনাদ উথলে পড়ছিল।

অভিনন্দনের প্রতিধ্বনিকে যেন দু'পায়ে পিষে দেবার জন্য দক্ষিণ দিক থেকে একশত বুটের শব্দ তড়বড় করে ছুটে এল। আবার পুলিস লাঠি চার্জ করল। জনতার একটা অংশ যেন ধাক্কা খেয়ে এদিক-ওদিক ছটকে পড়লো।

মান্দার গাঁযের শোভাযাত্রা পুলিসের বেষ্টনীর আড়ালে থেকে ধীরে ধীরে এগিয়ে চক পার হয়ে গেল। দু'পাশের কয়েকটা দোকান-বাড়ির ছাদ থেকে ঝর্‌ঝর্‌ করে একরাশ ফুল জনতার মাথার উপর ছড়িয়ে পড়লো।

মধ্যরাত্রির স্তব্ধতা। মীরগঞ্জ শহরের চঞ্চলতা নিজের ক্লান্তিতে নিঝুম হয়ে আছে। কোতয়ালী শান্ত। ময়দানে আর সাঁওতাল নরনারীর কেউ নেই। নতুন হাজতে মানুষের সাড়া নেই। কোত-য়ালীর আঙিনায় শুধু একটা পাহারাওয়ালা একা ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে হাঁটে।

বন্দীদের ছেড়ে দেওয়া হয়েছে। মীরগঞ্জের চক পার করে দিয়ে শহরের শেষ আউটপোস্ট পর্যন্ত পুলিস সঙ্গে সঙ্গে এসেছিল। সারাদিন ধরে হইহই করে যেন এক দীঘির জল ছেঁকে কতকগুলি মাছ ধরে নিয়ে

এসে, ধুলো আর রোদে তাতিয়ে আবার তাদের জলে ছেড়ে দেওয়া হ'ল।

রাত্রির অন্ধকারে জেলা বোর্ডের সড়ক ধরে আবার তারা ফিরে গেল। একটা মেলা দেখার ক্লান্তি নিয়ে তারা ফিরছে, সেই উৎসাহ আর কলরব ছিল না। যাবার সময় যারা দীপশিখার মত গিয়েছিল, তারা এখন ফিরছে যেন ছোট ছোট ধোঁয়ার মূর্তি হয়ে। সেই জ্বালা নেই; সেই অস্থিরতা নেই। তাদের মনের ও মূর্তির বিষণ্ণতা রাত্রির অন্ধকারের সঙ্গে মিশে গিয়েছিল।

শুধু ক্লান্তির কারণে নয়। এর চেয়ে অনেক দূরের মেলায় তারা গিয়েছে আর এসেছে। এর চেয়ে অনেক দূরের তীর্থের পথকষ্টে তাদের মুখের হাসি ম্লান করে দিতে পারেনি।

গাঁয়ে ফিরে যাবার পথে, প্রতি পদক্ষেপে তাদের যেন কাঁটা বিঁধছিল। মন ভার হয়েছিল। তার কারণ, তারা সবাই ফিরছে না দু'একজন করে রযে গেছে পেছনে। তারা সহজে বা শীগ্গির আর 'ফিরছে না, কোতোয়ালীর হাজতে যার' রযে গেল।

জন দুই সাঁওতাল মান্‌ঝি, গফুরাবাদের জন তিনেক মাত্‌বর চাষী, আর, মান্দার গাঁযের রতন আর কেশব ভট্‌চায। শুধু এই কয়জন রযে গেল পেছনে।

আর মাধুরী? সন্ধ্যে থেকে অনেক রাত্রি পর্যন্ত কোতয়ালীর বারান্দায় একটা চেয়ারের উপর চুপ করে বসেছিল। কথা বলার মত দ্বিতীয় কেউ আর ছিল না। ইন্‌স্পেক্টার এসে মাধুরীর চোখের সামনে দিযেই কেশব ভট্‌চাযকে কোতয়ালীর ভেতর নিয়ে গেল। রাত দশটা বেজে গেল। কেশব আর বাইরে ফিরে এল না।

মাধুরী শুধু দেখছিল, সম্মুখের জগৎ জনশূন্য হয়ে গেছে। সাড়া-শব্দ থেমে গেছে। চারিদিকের বাতাস ও মাটিতে শুধু গলিত অন্ধকারের ছোপ লেগে রয়েছে। কোথাও একটা ফাঁক নেই, কোথায় আবার সূর্য উঠবে বা ডুববে, আর সে দৃশ্য দেখবার ভরসা নেই।

এই রিক্ততা সহ্য করবার মত শক্তি খুঁজে পাচ্ছিল না মাধুরী। তার সব অনুমান ব্যর্থ হয়ে গেছে। এক বন্ধুর পরিণামের পথে, সকল শাস্তি ও কৃচ্ছ্রতাকে বরণ করে নেবার জন্য প্রস্তুত হয়ে, কীর্তি আর দুঃসাহসের নেশায় এগিয়ে গিয়েছিল। কিন্তু এত শীঘ্রই যে পথ ফুরিয়ে যাবে, তা কখনও মাধুরীর কল্পনায় আসেনি। পাঁচ বছর যদি জেল হয়, মাধুরীর জীবনের আখ্যা পরিপূর্ণ হয়ে যায়। সংসারের অনেকগুলি প্রশ্নের জবাবদিহি থেকে রেহাই পায়। যে পথে যাত্রা শুরু করেছে মাধুরী তার একটা সমাপ্তি পাওয়া যায়।

মাধুরীর সেই জল্পনার আনন্দ নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে। জীবনব্যাপী এই আন্দোলন কি চলতেই থাকবে? মাধুরী ভয় পায়। আজ এই রাত্রিটুকুর জন্য দেশব্যাপী একটা মত্ত সিংহের গর্জন চুপ করে রয়েছে, কাল সকাল হতেই আবার দশ দিক কাঁপিয়ে জেগে উঠবে। আবার মীরগঞ্জের জনতা, মান্দার গাঁয়ের বিদ্যাপীঠের ছেলেরা দলে দলে সামনে এসে দাঁড়াবে। শতদিক থেকে এক আকুল কাজের আহ্বান ছুটে আসবে। মনে শক্তি নেই, হৃদয়ে আবেগ নেই, প্রলোভন, বিশ্বাস, শ্রদ্ধা নেই, তবু ছুটে যেতে হবে। এক অসার অভিনয়ের নায়িকার মত জীবনের নকল করে শুধু দিন কেটে যাবে। জীবনের কোন প্রশ্নের উত্তর পাওয়া যাবে না, উত্তর দেওয়া যাবে না। কোন পরীক্ষা সফল হবে না।

সেই স্বপ্নে বিভোর হয়েছিল মাধুরী—শুধু পাঁচটি বছর জেল হোক তার। ফিরে এসে শুধু একবার দেখতে হবে, কেশব ভট্‌চাযের চিরকালের প্রতিজ্ঞার কি দশা হয়। খোলা পৃথিবীর বুকে, সহস্র সুর, হাসি, রূপ ও রঙের মেলার মধ্যে পথ চলতে গিয়ে, কোথাও কি ভুল হবে না কেশবের? সে কি এতই অপার্থিব? ক'দিন থাক্‌বে প্রতিজ্ঞার অহঙ্কার? জেলের আড়ালে বসে, বদ্ধ জীবনের বেড়ার মধ্যে সকলেই নিজের নিজের প্রতিজ্ঞাকে জপ করতে পারে। যেখানে বিপথ নেই, দ্বিতীয় পথ নেই, সেখানে পথভুল হবে না নিশ্চয়। কিন্তু যেখানে পৃথিবীর মন মুক্ত-আলোকের সাথী হযে ঘুরে বেড়ায, যেখানে শীত, গ্রীষ্ম বদলায়, যেখানে ছুটাছুটির নানাপথ অবাধ হযে ছড়িযে আছে, সেখানে ভুল হওয়া কত সহজ! কেশব ভট্‌চাযেব জীবনে এই পরীক্ষা আসুক। তারপর একদিন ফিরে এসে প্রশ্ন করা যাবে।

মাধুবীব মনে একান্তেব সেই গোপন অভিলাসের ষড়যন্ত্র নিজের ব্যর্থতাব ক্ষোভে এলোমেলো হযে ভেঙে পড়ছিল। কোন দিকে আর কোন ভরসার পথ রইল না। পৃথিবীর যত কিছু পরীক্ষা শুধু তারই জন্য যেন জমা হযে আছে। কোতোযালীর বারান্দার অন্ধকারে বসে এই ক্লান্তি, অবসাদ ও রিক্ততাব মধ্যেও মাধুরীর মনে আজকের বিকালেব একটা দৃশ্য মনে পড়ে। অজযদার বাড়ির সামনে মান্দার গাঁযের শোভাযাত্রা এসে কিছুক্ষণেব জন্য দাঁড়িযেছিল। ছেলেদের জযধ্বনির হর্ষ শুনে অজয়দা বাইবে বেব হযে এলেন। কেশবদা যেন আকুল হযে তাকিয়েছিল, কতক্ষণে অজযদা আসে। সত্যিই এমন বন্ধুত্ব পৃথিবীতে বিরল। পাঁচ বছর আগেও এই অজযদাকে মাধুরী কাঁদতে দেখেছে, কেশবদার মামলার রায় শুনে যেদিন অজযদা গাঁযে ফিরলো। কেশবদা আর অজযদা সত্যিই ভাগ্যবান।

পাঁচ বছরের পুরনো জিনিসকে তারা আজও অটুট রাখতে পেরেছে, ফিরে পেয়েছে। কিন্তু···।

কিন্তু, অজয়দার বাড়ির বারান্দায় দাঁড়িয়েছিল বাসন্তী। সেই বাসন্তী···বাসু। আজ কতদিন ওর সঙ্গে দেখা সাক্ষাৎ নেই। বাসন্তী যেন একটা শুদ্ধ আগ্রহের মত দাঁড়িয়েছিল। ওকে যেন একটা প্রতিজ্ঞার ছবির মত দেখাচ্ছিল, কোন নড়চড় নেই, অস্থিরতা নেই। বাসন্তী কি দেখছিল, কাকে দেখছিল কে জানে? শুধু কিছুদিনের জন্য আড়ালে সরে থাকতে চায় মাধুরী, কেশব ভট্চাযের অহঙ্কার আর প্রতিজ্ঞা কত অবিচল, তার পরীক্ষা মান্দার গাঁযেই রয়েছে। বাসন্তীকে দূর থেকে দেখে মাধুরী মনে মনে যে কথা ভেবেছিল, কোতোযালীর বারান্দায় বসে এই অস্বাভাবিক রাত্রির নিস্তব্ধতার মধ্যেও সেই কথাই বার বার মনে পড়ছিল।

একটা মোটর গাড়ী এসে কোতোয়ালীর ফটকে থামলো। সঞ্জীববাবু গাড়ী থেকে একজন ইন্‌স্পেক্টরের সঙ্গে নেমে এগিয়ে এলেন।

বারান্দায় উঠেই ব্যগ্র ও কাতরভাবে ডাকলেন—চল মাধুরী।

মাধুরী একটু বিস্মিতভাবেই তাকিয়েছিল। সঞ্জীববাবু বললেন—চল, জামিন দিয়েছি।

সব দিক দিয়ে দুর্বল, কীর্তি-বিলাসিনী, সখের দেশসেবিকা মাধুরী, তবু মুখটা হঠাৎ করুণ হয়ে উঠলো। সঞ্জীববাবুর দিকে তাকিয়ে মাধুরী মনের বেদনায় যেন ছোট একটা প্রতিধ্বনি করলো—জামিন?

সঞ্জীববাবু বললেন—চল্।

মাঝখানে শুধু চারটে দিন পার হয়েছে। মাধুরীর মনের ওপর দিয়ে একটা যুগের চিন্তা প্রবাহের মত গড়িয়ে গেছে। কোথায় এর আরম্ভ,

কোথায় এর শেষ, খুঁজে বের করার আর সাধ্য নেই মাধুরীর। সে শক্তি ফুরিয়ে আসছে। এতদিন যেন শুধু মনের খেয়ালে জীবনের একদিকে শুধু নানা মাটির স্তরের পর স্তর সাজিয়ে এক পাহাড় প্রমাণ বাঁধ রচনা করেছে। সেই বাঁধ ভেঙে গেল, এক হঠাৎ প্লাবনে যত স্বপ্নের রঙ ধুয়ে ভাসিয়ে নিয়ে গেল।

বিচারে মাধুরী অব্যাহতি পেয়েছে। দু'বছরের জেল হয়েছে কেশবের। মান্দার গাঁ থেকে অজয়দা এসেছিল। সেই পাঁচ বছর আগের একখানি পরিপূর্ণ সৌহার্দ্যের হৃদয় নিয়ে বিষণ্ণমুখে অজয়দা আদালত ঘরের বারান্দায় ছটফট করে ঘুরে বেড়িয়েছে। আবার কেশব ভট্চাযকে সদরের এক গুপ্ত গহ্বরের অন্ধকারে ফেলে রেখে একা গাঁয়ে ফিরে গেছে অজয়দা। অজয়দা চলে গেল, সে-দৃশ্য মাধুরীর চোখে পড়েছে। মান্দার গাঁয়ের বুকভরা অভিমান কান্না আর ব্যর্থ ক্ষোভ যেন অপমানের বোঝার ভরে মাথা হেঁট করে ফিরে গেছে। কেশবদাকে ফিরিয়ে নিয়ে যাবার শক্তি নেই মান্দার গাঁযের। আদালত ঘরের শত শত গ্রামবাসীর জনতা বিচারকের রায শুনে স্তম্ভিত হযে দাঁড়িযেছিল। কেশব ভট্চাযকে পুলিসেরা মোটর বাসে চড়িয়ে জেলের দিকে নিয়ে চলে গেল। সেই স্তব্ধ জনতা হঠাৎ শিউরে উঠলো। জয়ধ্বনি উঠলো। কী মর্মভেদী স্বর। সারা মান্দার গাঁ যেন মাপ চাইছে—জয় হোক্ তোমার, তুমি নিজের মহিমার গর্বে আবার ফিরে এস। আমরা তোমায় ফিরিয়ে নিযে যেতে পারলুম না। আমরা প্রতি মুহূর্ত তোমার অপেক্ষায় থাকবো। আর তোমাকে ভুলবো না। তুমি গ্রামের মান, তুমি গ্রামের প্রতিভা। মান্দার গাঁ লক্ষ গ্রীষ্মের তাপে পুড়ে পুড়ে ছাই হযে গেলেও, তোমার নিঃশ্বাসের পুণ্য বাতাসে ভরে থাকবে। গোপন শিখার মত গাঁয়ের শত শত দুঃখী

কুটীরের আসে পাশে জ্বলবে। দাহনের দিন আবার আসবে। আবার জ্বলে উঠবে সবাই।

কেশব ভট্টচাযের জেল হযে যাবার পর চারিদিন পার হযে গেছে। মাধুবীর কাছে একটা যুগ ফুরিযে গেছে।

সব বুঝতে পেরেছিল সঞ্জীববাবু, সন্ধ্যের অন্ধকার ছাতের উপর ঘনিযে ওঠে। ফুলের টবের আড়ালে ছোট ইজি-চেযারের ওপর যেন মাধুবী সমস্ত সত্তাকে গা-ঢাকা দিযে পড়ে থাকে। সঞ্জীববাবুর পাযেব চটি সিঁড়িতে শব্দ কবে উঠতে থাকে। মাধুরী চম্‌কে ওঠে, একটু অপ্রস্তুত হয।

সঞ্জীববাবু বলেন—সারা গ্রামেব মধ্যে শ্রদ্ধা কববাব মত একটি মাত্র মানুষ ছিল—কেশব।

মাধুবী উত্তর দেয না। তাব মনে শুধু একটি নিঃশব্দ প্রতিধ্বনি উত্তর দিযে ঘুরে বেড়ায—এই একটি মাত্র শ্রদ্ধেয মানুষকে সবচেযে বেশী অপমান করেছে একজন—মাধুবী।

সঞ্জীববাবু বলেন—কেশব আবাব যখন ফিবে আসবে, তখন যেন সে বুঝতে পাবে, তার সম্মানের আসন আবও বড় হযে উঠেছে।

মাধুবী—কি করে তাকে বোঝাবে?

সঞ্জীববাবু কিছুক্ষণ চুপ কবে রইলেন। তাবপব যেন তাব মনেব ইচ্ছার কাছাকাছি এসে একট দ্বিধা সঙ্কুচিত ভাবে ছুঁযে ছুঁযে বললেন—তা, তুমি ইচ্ছে কবলেই পার। তুমি যদি ঠিক থাক তবে ।

মাধুবী—আমাব ঠিক থাকবার পথ নেই বাবা।

সঞ্জীববাবু—কেন? কি হলো?

মাধুরী—আমি ছাড়া পেযে গেছি।

সঞ্জীববাবু—সেটা তোমার দোষ নয়।

মাধুরী—তবে কার?

সঞ্জীববাবু—কারও নয়। এটা একটা অ্যাকসিডেণ্ট মাত্র।

মাধুরী—আমার কিন্তু শুধু মনে হচ্ছে, আমাকে রেহাই দেবার জন্যই কেশবদার জেল হলো।

সঞ্জীববাবু—না না, তা ঠিক নয়।

মাধুরী—কেশবদার জেল হলো বলেই আমি রেহাই পেয়ে গেলাম।

সঞ্জীববাবু চুপ করে রইলেন। মাধুরীর কথাগুলির মধ্যে একটা ধিক্কার আছে। এক অতিগোপন ষড়যন্ত্রের মূর্তিকে যেন এই অন্ধকারের সকল শান্ত আশ্বাস ভেদ করে মাধুরী দেখতে পেযেছে। সঞ্জীবব'বু ভয পেযে ওঠেন।

সঞ্জীববাবু একটু গম্ভীর হযে আবার সকল ঘটনার গতিকে যেন স্তোকবাক্যে অন্যদিকে ঘুরিযে নিযে যাবার চেষ্টা করলেন।—আমার মনে হয, আর গাঁযে ফিরে না যাওযাই ভাল। তুই এথানেই থেকে যা। যতদিন না কেশব ছাড়া পায ততদিন···।

মাধুরী—আমি গাঁযেই যাব।

সঞ্জীববাবু—সেখানে গিযে আর কি করবি?

মাধুরী—কিছু করবার নেই।

সঞ্জীববাবু—আমিও সেই কথাই বলছি, যখন আর কিছু করবার নেই, তথন—।

মাধুরী—শুধু গাঁয়ে থাকবো।

সঞ্জীববাবু একটু বিস্মিত হয়ে আবার চুপ করে রইলেন। মাধুরী

গাঁযে থাকতে চাইছে, মীরগঞ্জেব অভিশাপ থেকে দূরে সরে থাকতে চাইছে।

মাধুরীর মনের একান্তে এই একটি মাত্র মুক্ত পথের ইশারা একটা ক্ষীণ আলোকের রেখার মত দেখা দিচ্ছিলো। এই একটি মাত্র পথ। মীরগঞ্জের ছলনা, ভ্রান্তি ও মিথ্যা অহঙ্কারের আবিলতা থেকে সেই পাঁচ বছর আগের তুলসীতলার নিকানো মাটির স্পর্শ পেতে চাইছে মাধুরী। আর এখানে নয়। এখানে থাকলে জীবনের কোন সত্যকে স্পষ্ট করে দেখা যাবে না। শহরের হৃদয মাটি হযে গেছে, কিন্তু মান্দার গাঁযের মাটিতে এখনো হৃদয আছে। সারা ভারতের অন্তর ছাপিয়ে এতবড় আত্মোৎসর্গের প্রেরণা জেগে উঠেছে, এর মধ্যে কত সার্থকতা, কত তৃপ্তি, কত মঙ্গল ও মহত্বের সৌরভ ছড়িযে আছে। শুধু একে ধরবার মত, গ্রহণ করবাব মত যোগ্যতা চাই, নিষ্ঠা চাই, সাধনা চাই। তিন মাসে মীরগঞ্জ জাগতে পারেনি, তিন দিনে মান্দার গাঁ জেগে উঠেছে। মীরগঞ্জের মুখরতার মধ্যে শুধু রব আর রোল আছে, সুর নেই। মান্দার গাঁয়ের দীঘির ঘাটের আকাশ বাতাস সুরে ভরা।

ভাবতে গিয়ে কখনও বা চোক ঝাপ্‌সা হযে আসে মাধুরীর। এই বিস্মযের শেষ নেই, এই রহস্যের মীমাংসা নেই—কেশবদার কেন জেল হলো? সে নিজেই বা রেহাই পেলে কি করে। কেশবদা যেন তার নিজের দুর্ভাগ্য দিযে মাধুরীর জীবনের শান্তিকে রক্ষা-কবচের মত ঢেকে রাখছে, সকল বিঘ্ন আড়াল করে দিচ্ছে।

সঞ্জীববাবু যতই বোঝান্ না কেন, মধুরীর সন্দেহ এক এক সমযে তীক্ষ্ণ হযে ওঠে। আড়ালেব একটা চক্রান্তকে দেখতে পায। পেছন থেকে সেই নিরীহ নির্দোষ মানুষটির বিশ্বাস চুরি করে পালিয়েছে সবাই।

ঝড়ের মুখে সে একা এগিয়ে গেছে। সবাই বেঁচেছে। মাধুরীর মুক্ত জীবনের প্রতিটি মুহূর্ত এক বিষাক্ত বাতাসে দুঃসহ হয়ে ওঠে।

যে যাই ভাবুক, সঞ্জীববাবু যতই আড়ালে আড়ালে সুবন্দোবস্ত করুক, মাধুরীর পথ ঠিক হয়ে গেছে। যে সত্যের খাতিরে সে আগুনে হাত দিয়েছে, সেই সত্য আজ তাব কাছে ব্রতের চেয়ে পবিত্র, প্রতিজ্ঞাব চেয়ে কঠিন হয়ে উঠেছে। আবার গাঁয়ে ফিরে যেতে হবে।

আজ আর কোন দুর্বলতার প্রশ্রয় নেই। জীবনের এক কূল ভেসে গেল, একদিকের বাঁধ ভেঙে গেছে। কিন্তু আবার প্রতি মুহূর্তের তপস্যায় বাঁধ গড়ে উঠবে। কেশবকে মান্দাব গাঁয়ে বরণ করে নেবাব মত অর্ঘ হয়ে থাকবে মাধুবী। পাঁচ বছব পবে ফিবে এসে যে অর্ঘ পায়নি, আব দু'বছব পরে ফিবে এসে নিজেব প্রাপ্য এবাব পাবে কেশব।

আব দেবি কবাও চলে না। বাসন্তী বয়েছে মান্দাব গাঁয়ে। কে জানে মান্দাব গাঁয়ের কোন যাদু নিয়ে এই নিভৃত মরীচিকা তৈরী হয়ে আছে। কেশবদাব সঙ্গে বাসন্তীব কি সম্পর্ক? যতদূব মনে পড়ে কোন সম্পর্ক নেই। শুধু এইটুকু সম্পর্ক—অজয়দার বোন বাসন্তী। কিন্তু আজ পর্যন্ত গাঁয়ের বাইরে যায়নি বাসন্তী। গাঁয়েব বাইবেব পৃথিবীর কোন কলবব শুনতে পায়নি। কিন্তু সেই জন্যই বোধ হয় সে এত কঠিন। মীরগঞ্জে এসে কলেজে পড়ে মাধুবী অন্য মানুষ হয়ে গেছে। বাসন্তী সেই বাসন্তীই বয়ে গেছে। তাই বড় ভয় হয়। ওব মনটা বোধ হয় মান্দাব গাঁয়েব সব কোমলতাকে লুটে নিয়ে, সব ছায়াকে এক কবে নিয়ে, সব স্নিগ্ধতাকে চোখেব দৃষ্টিতে ভরে নিয়ে এত বড় হয়ে উঠেছে। ভাবতে ভয় হয়,

কেশবদা জেল থেকে বের হয়ে, এই মূর্তির সঙ্গে মুখোমুখি যদি হয়ে থাকে! যে পথ ছেড়ে চলে গিয়েছিল মাধুরী, সেই শূন্যপথে যেন পাঁচ বছরের দীর্ঘ সুযোগ নিয়ে বাসন্তী একটি সুন্দর ছলনা হয়ে দাঁড়িয়েছে। যেখানে মাধুরীর ঠাঁই ছিল, আজ বাসন্তী যেন সেইখানে দাঁড়িয়ে আছে।

মাধুরী যেন এত দূরে থেকেও কল্পনায় দেখতে পায়, অজয়দা গাঁয়ে ফিরে গেছে। বাসন্তী শুনেছে সেই খবর—কেশবদার দু'বছর জেল। মনে হয়, হঠাৎ এই গেঁয়ো মেয়ের চোখ দুটো জলে ঝাপ্‌সা হয়ে উঠলো।

একটা অস্বাভাবিক রকমের অস্থিরতায় মাধুরীর মনটাও ছেলেমানুষের মত যেন আবোল-তাবোল ভাবতে থাকে। আশঙ্কা হয়, বাসন্তী বোধ হয এখনো দাঁড়িযে আছে অজয়দার বাড়ির বারান্দায়। শোভাযাত্রার দিকে তাকিয়ে আছে। কী এত দেখবার মত আছে এই শোভাযাত্রার চীৎকার আর দৌড়াদৌড়ির মধ্যে। তবু বাসন্তীর দৃষ্টি কী গভীর! কত স্থির! একটি পরিপূর্ণ অভ্যর্থনার সাজির মত বাসন্তী দাঁড়িয়ে আছে। একটি নিঃশব্দ আহ্বানের মত শোভাযাত্রার আত্মাকে যেন পেছুপানে ডাকছে।

মাধুরী লজ্জিত হয়। চিন্তাগুলির ওপর যেন আজ আর তার কোন দখল নেই। কী যন্ত্রণাভরা চিন্তা! কোন প্রমাণ নেই, কোন সংশযের কারণ নেই, তবু এই দুর্বলতা কোথা থেকে আসে। বাসন্তী যেন আজ মাধুরীর চিরকালের দাবী চুপি চুপি চুরি করে নিয়ে গেছে। মাধুরীর ভূমিকায় দাঁড়িযে আছে বাসন্তী। মান্দার গাঁয়ের বাতাসের স্বাচ্ছন্দ্যে বাসন্তী কী দুঃসাহসে আজ তারই পথের মোড়ে দাঁড়িযে আছে। এই অধিকার কে দিল বাসন্তীকে?

গাঁয়েই ফিরে যাবে মাধুরী। প্রায়শ্চিত্তের শুরু হোক। স্বদেশী ব্রতের অভিনয় নিয়ে মাতামাতির আনন্দ যখন মুছে গেছে, মুছেই থাক্।

নিজেকে ফিরে পেতে হবে আগে। যদি আবার দিন আসে, আবার যদি কোন বিবর্ণ ঘুম সুস্বপ্নে সুস্মিত হয়ে ওঠে, যদি কাজের ডাকে হৃদয় নিজে থেকে সাড়া দেয়, তবেই স্বদেশীর দীক্ষা সার্থক হবে। তার আগে নয়। জীবনের পরীক্ষায় আগে শুদ্ধ হয়ে নিতে হবে। ভাঙা ছেঁড়া জীবনের নৌকা জোয়ারের জলে ভেসে গিয়ে লাভ নেই। গাঁয়ে ফিরে যাবে মাধুরী। প্রতীক্ষায় থাকবে মাধুরী। সেই পুরনো প্রতিজ্ঞার সকল মোহকে আবার ধুলো হাতড়ে খুঁজে বের করতে হবে। আবার দিন গুনতে হবে।

এখনো একটা মাস পার হয়নি, গাঁয়ে ফিরে এসেছে মাধুরী, সঞ্জীববাবুও কিছুদিনের জন্য যেন মক্কেলের ভিড় আর ওকালতির মায়া থেকে নিজেকে মুক্ত করে গাঁয়ের বাতাসে হাঁফ ছাড়বার জন্য এসেছেন। কিন্তু তিনি গাঁয়ে এসেছেন, আবার চলে যাবার জন্যই। হয়তো আবার মীরগঞ্জে গিয়ে আবার নতুন উদ্যম ও উৎসাহ নিয়ে কাজে লাগবেন। অন্ততঃ গ্রামের নিন্দুক সমালোচকেরা সেই কথা বলে, এক চাঙ্গা হতে এসেছেন সঞ্জীববাবু। গ্রামের হৃদয়ের কোন আহ্বানে সাড়া দিয়ে গাঁয়ের মাটিতে কোন নতুন কাজ ও সেবার সুযোগ নিতে তিনি আসেন নি। তার জীবনকাঠি সব মীরগঞ্জের সিন্দুকে লুকানো আছে, শুধু তাঁর ছায়াময় একটা দেহ গ্রামে এসেছে ক'টা দিনের জন্য। কি উদ্দেশ্যে?

সারা মান্দার গাঁয়ে সঞ্জীববাবুর বিরুদ্ধে একটা ঘৃণা পুঞ্জীভূত হয়ে উঠেছে। হেড মাস্টার দিনমণি বিশ্বাস বা বোর্ডের প্রেসিডেণ্ট ভূদেব চাটুয্যের সকল দুষ্কৃতির কথা চাপা পড়ে গেছে। তাদের নিয়ে সাবধান হবার, তাদের ঘৃণা করবার আর বিশেষ প্রয়োজন নেই। কারণ তারা পরিচিত শত্রু। তাদের স্বরূপ চেনে সবাই, কিন্তু সব চেয়ে বড় প্রবঞ্চনা—

সঞ্জীববাবু। সবাই চিনতে ভুল করেছিল এই অমায়িক ধনী উকিল মানুষটিকে। বরং গ্রামের লোকের মনে সঞ্জীববাবুর সম্পর্কে অলক্ষ্যে একটা শ্রদ্ধার অর্ঘ্যই তৈরী হয়ে উঠেছিল, মাধুরীর বাবা সঞ্জীববাবু, মাধুরীকে সারা মান্দার গাঁ ভালবাসে। মাধুরী তাদের কাছে বিস্ময়, মাধুরী তাদের একটি নতুন গর্ব। মান্দার গাঁয়ের মেয়ে মাধুরী বিশটা গ্রামের স্বদেশীকে মাতিয়ে তুলেছে, এ যেন মান্দার গাঁয়ের জয়।

কিন্তু সঞ্জীববাবু? ঘরে ঘরে, পাড়ায় পাড়ায় আড়ালে ও প্রকাশ্যে আলোচনা থামতেই চায় না—কি সাঙ্ঘাতিক লোকটা। ছদ্মবেশী পাপ। কেশব ভট্চাযের কত বড় সর্বনাশ করলো সঞ্জীব উকিল!

যে কারণেই হোক্, গ্রামের লোক বিশ্বাস করে এবং বিশ্বাস করার মত প্রমাণ আছে যে, কেশব ভট্চাযের দু'বছর সশ্রম কয়েদের মূলে আছে সঞ্জীববাবুর কারসাজি। সঞ্জীববাবুর পরামর্শ, মিথ্যা রিপোর্ট, সদরের কর্তাদের সঙ্গে মাথামাথি। নইলে মাধুরীর কখনো রেহাই হতো না। এত লোক থাকতে বেছে বেছে কেশব ভট্চাযের শুধু জেল হতো না। সঞ্জীববাবু এই ক্ষতি করছেন। চুপে চুপে এক নিরীহের সর্বনাশ করে বসলেন। মাধুরীর উচিত, এমন বাপের সঙ্গে সকল সম্পর্ক চুকিয়ে দেওয়া। কিন্তু মাধুরী আজও বুঝতে পেরেছে কি, তার অজ্ঞাতে কি কাণ্ড হয়ে গেল?

মনে হয়, মাধুরী সবই বুঝতে পেরেছে। সঞ্জীববাবু বাধা দিয়েছেন মাধুরীকে—গাঁয়ে গিয়ে কি হবে?

মাধুরী উত্তর দিয়েছে—যদি কিছু হয় গাঁয়ে গিয়েই হবে।

সঞ্জীববাবু—কিছুদিন বিশ্রাম নিয়ে আবার ফিরে আসবি তো।

মাধুরী—ফিরে চলে যাচ্ছি, ফিরে আসবার কোন আশা রাখি না।

সঞ্জীববাবু—কেন ?

মাধুরী চুপ করে থাকে। সঞ্জীববাবু একটু চুপ করে, বেশ ভেবে চিন্তে, গলার স্বর তাঁর অন্তরের উদ্দেশ্য ও ধারণাকে খানিকটা যেন ওপরে ভাসিয়ে দিয়ে প্রশ্ন করেন—পবিতোষের চিঠি আর আসেনি ? আর কোন খবর পেয়েছিস্।

মাধুরী বলে—না।

ছোট একটা যন্ত্রণাক্ত শব্দকে প্রাণপণে উচ্চারণ করে মাধুরী যেন একেবারে স্তব্ধ হয়ে যায়।

মাধুরীর সঙ্গে গাঁয়ে ফিরে এসেছেন সঞ্জীববাবু। সেই বিশ্বাস তাঁর আছে, মাধুরীর মনের এই সমযিক বিষাদের ঘোর আর ক'দিনের মধ্যেই কেটে যাবে। এরকম সবারই হয়ে থাকে। স্বদেশীর তেজ যেমন দু'দিন ঝল্সে উঠে ঠাণ্ডা হয়ে গেছে, এই বিমর্ষটাও আবার ঘুচে যাবে। আবার মাধুরী মীরগঞ্জে ফিরে যাবে, কলেজে ভর্তি হবে। হাঁপ ছেড়ে বাঁচবেন সঞ্জীববাবু। কতকগুলি অপার্থিব ব্যতিক্রমের ঝড় এসে হঠাৎ তাঁর উন্নতিশীল সংসারের স্থৈর্যকে ওলটপালট করে দিয়েছিল। খুব খুশি হয়ে শান্ত মনের প্রসন্নতার সঙ্গে আজ তিনি যেন দেখতে পাচ্ছেন, সব উপদ্রব একে একে ক্ষান্ত হয়ে আসছে। তাঁর সংসারের প্রগতি আবার দেখা দেবে। আবার পুরো দমে ওকালতী ধরবেন। মাধুরী বোধ হয় স্বদেশী ছাড়লো। এবার শুধু তাকে নিয়ে আবার কলেজে ভর্তি করে দেওয়া। তারপর ?

তারপর শুধু সংসারভরা শান্তি, মীরগঞ্জের তিন মহল বাড়ীর অঙ্গনে সুখের জলুস, বাগানে ফুলের গর্ব আর সৌরভ, শিক্ষিতা মেয়ে, বিলেত ফেরত ছেলে, বিলেত ফেরত জামাই। সঞ্জীববাবুর এই পরিকল্পনাকে

ব্যর্থ করে দেখবার জন্যই যেন গান্ধী নামে একজন অতি দুর্বুদ্ধিপরায়ণ লোক একটা স্বদেশীর হুজুগ আর আন্দোলন দেশের মধ্যে মাতিয়ে তুলেছিল। আরও আশ্চর্য, এতেই নাকি পরাক্রান্ত গভর্নমেণ্টও ঘাবড়ে গিয়েছেন। এত বড় জুডিসিয়ারি এক্সিকিউটিভ আর লেজিসলেটিভ প্রতিভা উপায় খুঁজে হয়রাণ হয়ে পড়েছে, বিভ্রান্ত হচ্ছে। সঞ্জীব উকীলের কাছে তাঁরা কেউ পরামর্শ নিতে আসেনি, নইলে কবেই তিনি প্রকৃত পথটা দেখিয়ে দিতে পারতেন।.

তিনি নিজে যতটুকু সাধ্যি করেছেন, কারণ এখানে তাঁর সুখের সংসারের পরিকল্পনা ও স্বার্থ জড়িত। মাধুরীকে কোন বাধা দেননি সঞ্জীববাবু, কারণ তিনি জানেন তাতে কোন ফল হয় না। যা করার সবই আড়ালে আড়ালে করেছেন।

গ্রামের লোকে সবাই জেনে ফেলেছে—আড়ালে আড়ালে তিনি কি করেছেন।

সঞ্জীববাবুর ধোপা-নাপিত বন্ধ। মান্দার গাঁ প্রতিশোধ নিতে সুরু করেছে। সঞ্জীববাবু একেবারে নির্বিকার থাকেন। তিনি আজ ইচ্ছে করেই উত্যক্ত হতে চান। গ্রামের প্রতিহিংসা জ্বলে উঠুক আরও ভাল করে, মাধুরী চিনুক ভাল করে তার সাধের গ্রামকে।

মাধুরী চিনেছে গ্রামকে। ঘরের বাইরে একেবারে বের হয় না মাধুরী। মাধুরীর ঘরে আর চরকা নেই, মহাত্মা গান্ধীর বড় ছবিটা নেই। খদ্দর পরে না মাধুরী। স্বদেশীয়ানার সকল উপচার একেবারে ছেড়ে দিয়েছে। দেখে দেখে সঞ্জীববাবু খুশি হয়ে ওঠেন। মাধুরীর মোহ ভাঙছে।

একটা ব্যাপার একটু দুশ্চিন্তভাবে লক্ষ্য করেন সঞ্জীববাবু। দিন

দিন এক একটা গেঁয়ো অভ্যাস ব্যাধির মত মাধুরীকে যেন আক্রমণ করছে। কলসী নিয়ে পুকুর ঘাটে জল আনতে যায় মাধুরী, নিজেই রান্নাবান্না করে। আঙিনা নিকোয। একটা তুলসীমালঞ্চ তৈরী করেছে। মাঝে একদিন একটা ব্রতও করলো।

সঞ্জীববাবু শুধু প্রতীক্ষায দম ধরে থাকেন। এও শুধু দু'দিনের খেলা। কোন বাধা না দিয়ে, কোন তর্জন গর্জন না করে, শুধু অমাযিকতার জোরে তিনি পৃথিবীর যে কোন ঘটনার মোড় ফিরিয়ে দিতে পারেন। সে বিশ্বাস তাঁর আছে।

শেষ পর্যন্ত সঞ্জীববাবু সন্দিগ্ধ হয়ে ওঠেন। শেষ পর্যন্ত তাঁর আশঙ্কা ও ধৈর্য হঠাৎ একটা আঘাত খেয়ে যেন চমকে ওঠে। মাধুরী বেড়াতে বের হচ্ছিল। সঞ্জীববাবু বললেন—গাঁয়ের লোকের মতিগতি সুবিধের নয় মাধুরী। কোথায যাস্ না, অনর্থক অপমান করে দেবে।

মাধুরী—আমার সঙ্গে রোজই দেখা হচ্ছে কতজনের অপমান কেউ করেনি।

সঞ্জীববাবু বিস্মিত হলেন—রোজই দেখা হচ্ছে?

মাধুরী—হ্যাঁ।

সঞ্জীববাবু—বিদ্যাপীঠের ছেলেরা আবার আসা-যাওয়া আরম্ভ করেছে বুঝি?

মাধুরী—না।

সঞ্জীববাবু—তবে কারা?

মাধুরী—মালতীদের বাড়ীর সবাই এসেছিল। অজয়দা এসে-ছিলেন...।

সঞ্জীববাবু—এখন কোথায চলেছ?

মাধুরী—সারদা জেঠীমার সঙ্গে দেখা করে আসি।

সঞ্জীববাবু—যেও না।

মাধুরী—কেন বাবা ?

সঞ্জীববাবু—ওদের সঙ্গে কোন সম্পর্ক রাখা ঠিক নয়।

মাধুরী—ক'দিন আগে তুমিই তো বলেছিলে যে…।

সঞ্জীববাবু—সেদিন আর নেই।

মাধুরী—না, সেদিন আর নেই। সেদিন যেতে পারিনি। আজ যেতেই হবে, না গেলে ভাল দেখায় না।

সঞ্জীববাবু—মস্ত ভুল করছো মাধুরী।

মাধুরী—তুমি বলে দাও, কিসের ভুল ?

সঞ্জীববাবু—তুই আমাকে এ প্রশ্ন করছিস ?

মাধুরী—আমি ঠিক বুঝতে পারছি না।

সঞ্জীববাবু—কেশবদের সঙ্গে আমাদের আর বনিবনা হতে পারে না।

মাধুরী—এমন কোন কারণ হয়েছে কি ?

সঞ্জীববাবু—হ্যাঁ, হয়েছে।

মাধুরী—কিন্তু আমি সে সব কিছু জানি না।

সঞ্জীববাবু—তোমার জেনে কোন লাভ নেই।

মাধুরী—কিন্তু আমারও জানা উচিত বাবা।

সঞ্জীববাবু—এটুকু জেনে রেখ, কেশবদের সঙ্গে আমাদের ভবিষ্যতে আর কখনো কোন অন্তরঙ্গতা বা আত্মীয়তা হতে পারে না।

মাধুরী—হয়তো হবে না, কিন্তু কেন ?

সঞ্জীববাবু—কেশব আমাদের ভয়ানক ক্ষতি করতে চেয়েছিল।

মাধুরী—কিসের ক্ষতি।

সঞ্জীববাবু—আমাদের সংসারের উন্নতির ক্ষতি, শান্তির ক্ষতি।

মাধুরী—যদি তোমাকে একথা কেউ বলে থাকে, মিথ্যে বলেছে।

সঞ্জীববাবু—আমাকে কেউ বলেনি, আমার জানা ছিল।

মাধুরী চুপ করে গেল। রোগী মানুষের মত বিষণ্ণতা আর বেদনা নিয়ে সঞ্জীববাবুর এলোমেলো কথাগুলির মধ্যে একটা নিষ্ঠুর শাসনের ইঙ্গিতকে যেন দেখতে পাচ্ছিল। সঞ্জীববাবু আত্মপ্রকাশ করতে চান না। কিন্তু মাধুরীর প্রশ্নে তাঁর মুখচাপা ছদ্মবেশ হয়তো শিথিল হয়ে যাবে, সঞ্জীববাবুর স্বরূপ প্রকট হয়ে পড়বে। তার মধ্যে কি ভয়াবহতা, কি নির্মম কাহিনী ধরা পড়ে যাবে কে জানে। সারা গ্রাম যে সন্দেহে ফিস্ ফিস্ করছে, ধিক্কার দিচ্ছে, সেই সত্যকে যদি সঞ্জীববাবুর মত ধীর-বুদ্ধির মানুষকে দিয়ে নিজের মুখে ব্যক্ত করানো হয়, তবে আর কোন নির্মমতার মাত্রা থাকবে না। মাধুরী আর কোন বিড়ম্বনা বা সমস্যার সামনে দাঁড়াবার জন্য প্রস্তুত নয়। পৃথিবীর যত ঘটনা, উপদ্রব, বিশ্বাস-হীনতা, বিরহ-মিলন ও অনুরাগের অনিয়ম—সব কিছু এক পাশে সরে থাক্। এই আবর্তের মধ্যে মাধুরী আর ঝাঁপ দিতে চায় না। জীবনের ছোট একটি আঙিনা, চারদিকে বেড়া দিয়ে শক্ত করে সীমা বাঁধা, তার মধ্যে শুধু একটা প্রদীপ—এই আলোকের সম্মুখে সমস্ত মনের আগ্রহকে উৎসর্গ করতে হবে। তাকে যেন আর কখনও ভুলে থাকতে না হয়। চিরকাল শুধু তাকেই সম্মুখে রাখবে, শুধু তাকেই দেখতে পাওয়া যাবে। এই আঙিনায় শান্ত মৃদু আলোকের কাছে দ্বিতীয় কোন মূর্তির আবির্ভাব যেন না হয়।

মাধুরী যেন ভয়ে ভয়েই বলে—আচ্ছা, সারদা জেঠীমার সঙ্গে দেখা করার কোন দরকার নেই।

সঞ্জীববাবু—আর এ গাঁয়েও কোন দরকার নেই।

মাধুরীর গলার স্বর হঠাৎ তীক্ষ্ণ হয়ে উঠলো—এর বেশি পারবো না বাবা।

সঞ্জীববাবু—কি বললে?

মাধুরী—আমি গাঁয়ের বাড়িতেই থাকবো।

সঞ্জীববাবু—এখানে তুই টিঁকতে পারবি?

মাধুরী—বেশ তো আছি।

সঞ্জীববাবু—তোকে এরা তিষ্ঠতে দেবে?

মাধুরী—কারও সঙ্গে কোন সম্পর্কই যখন থাকবে না।

সঞ্জীববাবু—না, তা হবে না। তোকে মীরগঞ্জের বাড়িতে থাকতে হবে।

মাধুরী—কেন?

সঞ্জীববাবু—কলেজে ভর্তি হতে হবে।

মাধুরী—তাতে কি লাভ?

সঞ্জীববাবু—নইলে পরিতোষ আমার ওপর রাগ করবে, বেঁকে বসবে।

মাধুরী—তুমি তাকে জানিয়ে দাও যে…

সঞ্জীববাবু—কি?

মাধুরী যেন নিঃশ্বাস নেবার জন্য কিছুক্ষণ চুপ করেই রইল। সঞ্জীববাবু উৎকর্ণ হয়ে ছিলেন। মাধুরী বললো—জানিয়ে দিও যে, আমি তার অনুরোধ রক্ষা করতে পারবো না বলেই গাঁয়ে ফিরে এসেছি। আমার আর কোন সাধ্য নেই।

মাধুরীকে ক্ষমা করবার মত শক্তি নিজের মনের মধ্যে সঞ্জীববাবু খুঁজে পাচ্ছিলেন না। মাধুরীর কাছে এই ধরণের কথা শোনবার জন্য তিনি

প্রস্তুত ছিলেন না। তাঁর পরিকল্পনার প্রত্যেকটি স্তর তিনি সাফল্যের সঙ্গে অতিক্রম করে এসেছেন। বাধা এসেছে, কত সাময়িক উত্তেজনা ও ভ্রান্তি তার সম্মুখে এসে ভিড় করেছে, কিন্তু কোথাও তিনি হার মানেন নি তাঁর ব্যবহারবুদ্ধির প্রখরতায় সব বাধাকে তিনি গোপন দাহনে ছাই করে দিয়ে এগিয়ে এসেছেন। কেশব ভট্টচাযকে মান্দার গাঁয়ের রঙ্গমঞ্চ থেকে নেপথ্যে সরিয়ে দিতে পেরেছেন। তবু শেষ রক্ষা হলো না। এই দুঃখ রাখবার জায়গা নেই। এই অভিমান কখনো শান্ত হতে পারে না। এই ক্রোধ চাপা দিতে চেষ্টা করলে তাঁর শাস্তির সীমা চরমে গিয়ে ঠেকবে, অভিশাপ হয়ে মনে উঠবে। তাঁরই মেয়ে মাধুরীর একটা জেদ, একটা ছেলেবেলার আবেগ, একটা ভুল প্রতিজ্ঞার অনমনীয় স্পর্ধার কাছে তিনি কি শুধু পরাভব স্বীকার করে ফিরে যাবেন।

হ্যাঁ, ফিরেই যাবেন মীরগঞ্জে। মাধুরী গাঁয়ে পড়ে থাক! গ্রামের স্বরূপ ভাল করে চিনুক। দিঘীর জলের ছন্দ, আম বাগানের ছায়া, কোকিলের ডাক, রজনীগন্ধার গন্ধ—শুধু এই নিয়ে মান্দার গাঁয়ের মনপ্রাণ তৈরী হয়ে আছে। এ বিশ্বাস সঞ্জীববাবুর একদিন ছিল। ছেলেবয়সে মাধুরীর মত তিনিও মান্দার গাঁয়ের হৃদয়কে এইভাবেই চিনতে শিখেছিলেন। মান্দার গাঁয় কাঁটা আছে, বিষাক্ত পোকামাকড় সাপ আছে, জলহীন বৈশাখের বুকফাটা তৃষ্ণা আছে —কত বঞ্চনা ছলনা ও আঘাতের পরীক্ষার ভেতর এই তত্ত্বকেই বড় দুঃখে বুঝতে শিখেছিলেন। একদিন বুঝলেন, এই হিংস্র ও গ্রামের মাঠঘাট ছাড়িয়ে দূরে সরে না পড়লে মুক্তি নেই। গ্রামে মানুষ থাকতে পারে না। গ্রামে মনুষ্যত্ব গড়ে ওঠে না। মৃতের সংসারের

মত এখানে শুধু প্রেতাত্মারা নড়ে চড়ে বেড়াতে পারে। এই গ্রামের মানুষকে আত্মীয় বলে স্বীকার করা যায় না। এখানে পৃথিবীর পথ সব চেয়ে সঙ্কীর্ণ হয়ে গেছে। এখানে আকাশের প্রসার একেবারে স্তব্ধ হয়ে গেছে। বাতাসে দোলা নেই, শব্দে আবেদন নেই। শুধু দীনতা, দলাদলি আর অকিঞ্চন জনতার নিত্য নিরুৎসব জীবন। গাঁ ছেড়ে তিনি তাই শহরে চলে গিয়েছিলেন। শহরে গিয়ে তিনি বড় হয়ে উঠেছেন। বিষয় বৈভব জমে উঠেছে। খ্যাতি পসার প্রসারিত হয়েছে। জীবনের ক্ষুদ্র পরিধিকে প্রশস্ত করতে পেরেছেন। মীরগঞ্জ তিনি আন্তরিকভাবে ভালবাসেন, শ্রদ্ধা করেন। মীরগঞ্জ টাউন হলে যদি তাঁর একটি প্রতিকৃতি স্থান লাভ করে, তবে তিনি তাঁর জীবনকে ধন্য মনে করবেন। মীরগঞ্জের জনতা যদি হাত-তালি দিয়ে তাঁর বক্তৃতা শোনে, তবে তিনি নিজেকে কৃতার্থ বোধ করবেন। মীরগঞ্জের সব কিছুই সুন্দর। এখানে এসে তাঁর জীবন সার্থক হতে পেরেছে। যে অনুপাতে তিনি মীরগঞ্জকে ভালবাসতে পেরেছেন, সেই অনুপাতে মান্দার গাঁকে ঘৃণা করতে পেরেছেন। না করে উপায় নেই। এর জন্য তাঁকে অপরাধী মনে করাও ভুল। জীবনের পরীক্ষার ভেতর দিয়ে তিনি সবই বুঝতে পেরেছেন। একদিন ছিল, তিনি মান্দার গাঁকে ভালবাসতেন। একটি গাঁয়ের মেয়েকেই জীবনসঙ্গিনীরূপে পেয়েছিলেন। আজ সেই নাটকে সম্পূর্ণ দৃশ্যান্তর ঘটেছে। যতদিন শান্তুর মা বেঁচে ছিল, মান্দার গাঁয়ের সকল সঙ্কীর্ণ জীবনের ভীরুতা ও অবনতি যেন তাঁকে গ্রাস করে বসেছিল। তিনি গ্রাম ছাড়তে পারেন নি। দারিদ্র্যে ভুগেছেন, দেনায় ডুবেছেন, লাঞ্ছনা সহ্য করেছেন, তবু গ্রাম ছেড়ে বাইরের পৃথিবীর এত প্রশস্ত উন্নতির পথগুলির দিকে

এগিয়ে যেতে পারেন নি। একটি গাঁয়ের মেয়ের আগ্রহ আর স্নেহ তাঁকে গাঁয়ের সঙ্গে বেঁধে রেখেছিল। এমন দিন ছিল, যেদিন তিনিও ভুল করে বিশ্বাস করতেন, শত হোক্ সাত পুরুষের ভিটা আর গ্রামের মাটি ছেড়ে বাইরে যাওয়া পাপ। এমন দিন ছিল যেদিন তিনি ভুল করেই ভেবেছিলেন, কেশব ভট্চাযের মত ছেলের সঙ্গে যদি নিজের মেয়ে মাধুরীর বিয়ে দিতে পারেন, তবে জীবনে একটা বড় রকম কীর্তি করতে পারবেন। বন্ধনের মধ্যে ছিলেন, মুক্তির আস্বাদ জানতেন না, তাই বন্ধনকেই ভাল লাগতো। গ্রামের সীমার বাইরে কাঞ্চনময় রহস্যের সঙ্গে, সীমাহীন উপার্জনের নেশার সঙ্গে কোন পরিচয় ছিল না।

আজ মীরগঞ্জে তিনি সুপ্রতিষ্ঠিত। শহরের সজ্জন, কীর্তিমান মানুষ সঞ্জীববাবু। আজ তিনি মান্দার গ্রামকে ক্ষমা করতে পারেন না। শুধু মান্দার গাঁ নয়, বহু বছর অতীত হয়ে গেছে, যে গ্রামের মেয়ে সকল গ্রাম্যতার মোহ দিয়ে তাঁকে পিছনে টেনে রেখেছিল তাঁর স্মৃতির প্রতিও তাঁর আজ আর কোন অনুরাগ নেই। বরং তার কথা মনে পড়লে মনে মনে আজও ক্ষুব্ধ হয়ে উঠেন সঞ্জীববাবু, যদিও সে আজ নেই, মাধুরীর মা মারা গেছেন অনেকদিন।

মাধুরী সেই ভুল করতে চলেছে। তার এতদিনের লেখাপড়া শেখা সব বৃথা হয়েছে। আবার ভুল করে আবার গ্রামের বাতাসকে প্রশংসা করতে শিখেছে। মাধুরী জানে না, গাঁয়ের বাতাসে বিষাক্ত বাষ্প আছে, তাতে শুধু আলেয়া সৃষ্টি হয়।

মাধুরী যেন মুখের ওপর স্পষ্ট কথা বলে সঞ্জীববাবুর যেন ওকালতী চাল ভুল করে দিয়েছে। গম্ভীর ও বিমর্ষ হয়ে তিনি বসেছিলেন।

চাকরেরা জিনিসপত্র গুছিয়ে দিচ্ছিলো। তিনি আজই মীরগঞ্জে ফিরে যাবেন।

অজয় এসেছে দেখা করতে, সঙ্গে অজয়ের বোন বাসন্তী। বাসন্তীকে অনেকদিন পরে দেখলেন সঞ্জীববাবু। প্রথমে চিনতেই পারেন নি।

বাসন্তী প্রণাম করতেই সঞ্জীববাবু জিজ্ঞেস করলেন—এ কে অজয়? চিনতে পারলুম না তো।

অজয়—বাসন্তী, বাসু।

সঞ্জীববাবু হঠাৎ নিজের অজ্ঞাতসারেই আশ্চর্য হয়ে বললেন—সে কি?

সত্যিই এ কি রকম ব্যাপার। সেই বাসু না কি এই রকমটি হয়ে গেছে, এ তো চিরকালের গাঁয়ের মেয়ে। ক'টা দিন পাঠশালায় পড়েছিল, সেই কোন্ কালে। তারপর? তারপর আর কোন খবর রাখেন না সঞ্জীববাবু। তাঁর কল্পনায় মান্দার গাঁ শুধু একটা আবর্জনার কুণ্ড হয়ে উঠেছিল। এই আবর্জনার স্তূপের মধ্যে যারা বাস করবে, তারাও যেন পোকামাকড়ের মত জীব। তাদের রুচি নেই, শিক্ষা নেই, রূপ নেই, হাসি নেই। বাসন্তীকে দেখে তাই তিনি একটু চম্‌কে উঠেছেন। দেখা মাত্র, চোখে পড়ে তার সবই আছে। রুচি আছে, রূপ আছে, শিক্ষা আছে, হাসি আছে। কিন্তু সবই কেমন নতুন ধরণের। ঠিক মাধুরীর মত নয়। মীরগঞ্জের শত শত প্রতিবেশীর মেয়েদের মত নয়। তবু, কোথায় যেন এর মধ্যে একটা বৈভব রয়েছে।

সঞ্জীববাবু অজ্ঞাতসারেই বললেন—বাঃ, বাসু এত বড়টি হয়ে গেছ?

অজয় বললো—ও নিজেই জোর করে এসেছে আপনাদের সঙ্গে

দেখা করতে। ক'দিন থেকে জেদ ধরেছে, আপনার সঙ্গে ও মাধুরীর সঙ্গে দেখা করবে।

সঞ্জীববাবুর মন একটা অকারণ বেদনার স্পর্শে নরম হয়ে আসতে লাগলো। বললেন—বেশ, বেশ, এই তো উচিত।

কেন উচিত ? এই প্রশ্নকে আর বিচার করতে চান না সঞ্জীববাবু। গ্রামের রীতি-নীতির সূত্র তিনি আর জানেন না। গ্রামের আগ্রহ পুলক ও অন্তরঙ্গতার নিয়ম তিনি জানেন না, তিনি কারও সঙ্গে দেখা করতে চান না। দেখবার মত কিছু আছে কিনা, সে বিষয়েই তাঁর সন্দেহ ছিল। কিন্তু বাসুর মত মেয়েও যে আছে, সে খবর তাঁর উপলব্ধির মধ্যে ছিল না। শুধু তাই নয়, ওরা আজ নিজের আগ্রহেই দেখা করতে এসেছে।

সঞ্জীববাবু জিজ্ঞেস করলেন—এতদিন আসনি কেন ?

বাসু কোন উত্তর দিল না, অজয় বললে—বোধ হয় এতদিন মনে মনে একটা ভয় ছিল।

সঞ্জীববাবু—কিসের ভয়।

অজয়—আপনারা পর হয়ে গেছেন, বাসু তাই মনে করতো।

সঞ্জীববাবু—পর হয়ে গেছি কেন ?

অজয়—গাঁয়ের মায়া ছেড়ে সবাই মিলে শহরে চলে গেলেন।

সঞ্জীববাবু হাসতে লাগলেন—আজ গাঁয়ে ফিরে এসেছি জেনেই বুঝি বাসু আবার সাহস পেয়েছে।

অজয়—তাই হবে বোধ হয়। নইলে হঠাৎ ওর এত আগ্রহ কেন ?

সঞ্জীববাবু—কিন্তু আমি মীরগঞ্জে আবার ফিরে যাচ্ছি।

বাসু কৌতূহলী হয়ে প্রশ্ন করলে—মাধুরীও চলে যাবে ?

সঞ্জীববাবু—না।

বাসু যেন হঠাৎ প্রসন্ন হয়ে উঠলো। পাশের ঘরের দিকে একবার চোখ ফিরিয়ে সবেগে ঘরের ভেতর গিয়ে ঢুকলো। বাসুর আচরণে মনে হয় না, মাধুরীর সঙ্গে আজ পাঁচ বছর পরে সে মুখোমুখী দেখা করছে, কথা বলতে যাচ্ছে।

আরও বিমর্ষ হয়ে সঞ্জীববাবুর মনের ভেতর চিন্তাগুলি এলোমেলো হয়ে যাচ্ছিল। ঘটনাগুলির প্রকৃতি যেন চিনতে পারছিলেন না। মনের গভীরে একটা বেদনায় শুধু সতর্কতার বাঁধ ভেঙে ছড়িয়ে পড়ছিল। মনে পড়ে মাধুরীর মায়ের কথা, এক নগণ্য গাঁয়ের মেয়ে, সকল অবহেলাকে তুচ্ছ করে তারই স্মৃতি যেন প্রতিশোধ নেবার জন্যে আজ সত্য হয়ে উঠেছে। মাধুরী আর বাসু পাশের ঘরে বসে গল্প করছে, দুটি অবমানিত গ্রম্য হৃদয়ের প্রীতি যেন ষড়যন্ত্র করেছে।

সঞ্জীববাবু আর দেরি করলেন না। মীরগঞ্জ রওনা হয়ে গেলেন। এরকম বিভ্রান্ত মন নিয়ে হয়তো এত তাড়াতাড়ি চলে যেতেন না। কিন্তু পরিতোষের চিঠি আজই পেলেন। বিলেতের ডাকের চিঠি নয়, কলকাতা থেকে লেখা পরিতোষের চিঠি। মাত্র কাল সে কলকাতা পৌঁছেচে। শরীর ভাল আছে, মীরগঞ্জে আসছে। এর বেশি বৃত্তান্ত চিঠির মধ্যে নেই। কবে বিলেত থেকে রওনা হলো পরিতোষ, কবে বোম্বাই পৌঁছল, কেন চলে আসতে হচ্ছে, কোন বিবরণ নেই। তবে কি পড়াশুনার দায় একেবারে চুকিয়ে দিয়ে চলে এসেছে পরিতোষ? কিছুই অনুমান করা যায় না। সঞ্জীববাবুর মনে নানা সংশয়ের উৎপাত চলতে থাকে। ভারতবর্ষের হাঙ্গামার ছোঁয়াচ কি বিলেত-প্রবাসী বাঙালীর ছেলের মনে গিয়ে লেগেছে? মান্দার গাঁয়ের জনতার জয়ধ্বনি কি বায়ুস্তরে সাঁতার

দিয়ে মহাসমুদ্র অতিক্রম করে একটি ভাবুক তরুণের হৃদয় মাতিয়ে তুলেছে? এত অবাস্তব অসম্ভব কাণ্ডও কি সম্ভব?

যদি তাই হয়, সঞ্জীববাবুর সুখের সংসারের পরিকল্পনা তা'হলে চরমভাবে ছিন্নভিন্ন হয়ে গেল। তাই সঞ্জীববাবু সংশয়টাকে মাত্র মনে মনে উঁকি দিয়ে দেখেন। মাত্র অনুমান করেন, বিশ্বাস করতে সাহস হয় না।

যদি তা না হয়। যদি পরিতোষ এমনিতেই নিজের মনের আবেগে চলে এসে থাকে? সঞ্জীববাবু মনে মনে আশ্বস্ত হন। তাই সত্য হোক। মাধুরীর চিঠি না পেয়ে, অথবা মাধুরীর চিঠির অর্থ না বুঝতে পেরে, বুকভরা উদ্বেগ নিয়ে হয়তো ছুটে এসেছে পরিতোষ। হয়তো খুব রাগ আর অভিমান নিয়েই এসেছে। তাই ভাল। পরিতোষ সামনে থাকলে কতকটা নিশ্চিন্ত হতে পারেন সঞ্জীববাবু। মান্দার গাঁয়ের সকল ষড়যন্ত্রের ফাঁদ থেকে মাধুরীকে উদ্ধার করে নিয়ে যেতে পারে একমাত্র পরিতোষ, নইলে আর কারও সাধ্য নেই। কেশব ভট্‌চাযের গ্রাম্য-প্রতিশোধ নিঃশব্দে, আনাচে-কানাচে গা-ঢাকা দিয়ে থাকবে। মাধুরীর অধঃপতন চরম হয়ে উঠবে। মাধুরীর খামখেয়ালকে ক্ষুদ্র মান্দার গাঁয়ের বন্ধন থেকে মুক্ত করে আবার মীরগঞ্জের আধুনিকতার আসরে টেনে নিয়ে যেতে পারে পরিতোষ। রূপে গুণে সব দিক দিয়েই উপযুক্ত ছেলে পরিতোষ।

তাই সঞ্জীববাবু আর দেরি করলেন না। নিজের দেশের মাটি তার শত্রু হয়ে দাঁড়িয়েছে, চারিদিকে শুধু নিন্দা, কুৎসা আর অভিশাপ কানাকানি করে তাঁরই বিরুদ্ধে। এখানে আর ঠাঁই নেই। চিরদিনের মত শুধু এই গ্রামকে ঘৃণা করাই তাঁর জীবনের সাধনা। শহরে গিয়ে বড়মানুষ হয়ে তিনি নাকি গ্রামকে গ্রাহ্য করেন না। গ্রামের কোন

উপকার করেন না। একটা নতুন পুকুর পর্যন্ত করেন নি। পুকুরকাটার জন্য দু'টাকা চাঁদা পর্যন্ত দেননি। গ্রামের লোকের মামলা মোকদ্দমায় তাঁর ওকালতির দর পর্যন্ত একটুকুও শিথিল করেননি। গ্রামের লোক তাই নিয়ে নিন্দে করে। সঞ্জীববাবু মনে মনে ধিক্কার দেন—এমন দেশের কপালে আগুন। তাঁর মতে সবাই নাকি হিংসুক, সবাই তাঁর সৌভাগ্যকে সহ্য করতে পারে না। নিজের পুরুষকারের জোরে তিনি বড় হয়েছেন, তার জন্য যেন বড় অপরাধী হয়ে পড়েছেন তিনি।

তবু যদি গ্রামের লোকের মনে এক তিল কৃতজ্ঞতা বা একটু আন্তরিকতা থাকতো! প্রতি বছরে একবার করে তিনি গ্রামে আসেন। গ্রামের লোকের মতিগতি যাচাই করে দেখেন। কিন্তু আশ্চর্য হয়ে যান—এক তিল কৃতজ্ঞতা নেই, তবুও সবই সহ্য করতেন। একটা দীন দরিদ্র গ্রাম, তার এক মাত্র গর্ব করার মত সুসন্তান তিনিই, কিন্তু কোনদিন কোন গ্রাম্য প্রতিবেশীর মুখে একটি অভিনন্দনের বাণীও তিনি শোনেন নি। তাঁর কৃতিত্বের জন্য কেউ গর্বিত নয়। বরং এইবার এসে তিনি স্তম্ভিত হয়ে গেছেন। জেলফেরত আসামী কেশব ভট্টচায এইটুকু ছেলে, সে আজও গ্রামের শিরোমণি হয়ে রইল। সমস্ত মান্দার গাঁ তার দোষ মাপ করে দেয়। পাঁচ বছর পার হয়ে গেছে, তবুও তাকে ভুলতে পারে না। কেশবের এই অধিকারের মূল কোথায়? কোথা থেকে এই শক্তি পেল সে? কেশবের জেল হয়েছে, সমস্ত গাঁ যেন শোকে কাতর হয়ে আছে। দীঘির ঘাটে, ক্ষেতে, মাঠে, বাগানে চণ্ডীমণ্ডপে সর্বত্র কেশবের কথা। কেশবকে বিদায় দিয়ে এখনো যেন বিরহ ভুলতে পারছে না মান্দার গাঁ। কিন্তু আর কয়েক ঘণ্টার মধ্যে সঞ্জীববাবু মীরগঞ্জ রওনা হয়ে যাবেন, কেউ তাঁকে একটু সম্মান জানাবার জন্যও আসবে না,

জেলা বোর্ডের সড়কটা পর্যন্ত পৌছে দিতেও যাবে না। টাকার জোরে এবং টাকার গুণে পৃথিবীতে সব কিছু করা যায়, এই বিশ্বাস ভেঙে ফেললে তাঁর জীবনের একটা বড় অবলম্বনই ভেঙে যায়। কেশব ভট্টচায যেন হঠাৎ জেল থেকে দু'দিনের জন্য বেরিয়ে এসে সঞ্জীববাবুর সেই অবলম্বনকে ভেঙে ছিঁড়ে দিয়ে চলে গেল। মান্দার গাঁয়ের এই বিচিত্র মনস্তত্ত্বের রহস্য বুঝতে হাঁপিয়ে ওঠেন সঞ্জীববাবু, এখানে কাউকে বিশ্বাস করতে পারেন না।

সবচেয়ে বড পরাভবের দুঃখ শুধু মনের মধ্যে বয়ে নিয়ে গেলেন সঞ্জীববাবু—মাধুরীর আচরণ। মাধুরী তাঁর পরিকল্পনা ব্যর্থ করে দিল। মাধুরীর এই নিরীহ প্রতিরোধের সম্মুখে তাঁর সব উচ্চাশা চূর্ণ হতে চলেছে। এর পর কি হবে, কিছুই ভেবে উঠতে পারেন না সঞ্জীববাবু। মাধুরী পড়ে থাকবে মান্দার গাঁয়ের বীভৎস দীনতার মধ্যে ; এক দুরন্ত ব্রতের প্রতিজ্ঞা নিযে। কেশব ভট্চায কারাগারে গিযেও কত মুক্ত। তার প্রভাব মান্দার গাঁযের জংলী পানার মত খাল, বিল ছাপিযে ভাসছে।

একমাত্র ভরসা, সঞ্জীববাবু এখনো একটু আশার আলো দেখতে পান—পরিতোষ। পরিতোষ কাউকে ক্ষমা করবে না। মাধুরীকেও না।

মান্দার গাঁযের আঁকাবাঁকা পথ ধরে সঞ্জীববাবু হেঁটে চলে গেলেন। একটা ছোট বাক্স নিজেই হাতে ঝুলিযে নিয়ে চলেছিলেন। কোন লোক পাওযা যাযনি। সঞ্জীববাবুর মজুরী খাটতে সারা গ্রামের মধ্যে একজনও লোক খুঁজে পাওয়া যাযনি। চার আনা কেন, দশ টাকা বা একশো টাকা দিলেও সঞ্জীববাবুর বক্স কাঁধে বয়ে নিয়ে যেতে কেউ রাজী নয। তিনিই কেশব ভট্চাযকে চক্রান্ত করে ধরিযে দিযেছেন, জেলে পাঠিয়েছেন। অধঃপতিত মান্দার গাঁ

যতই দীনহীন হোক, সঞ্জীববাবুর মত প্রচণ্ড বড়লোকের এত বিবেকহীন দুষ্কৃতিকে ক্ষমা করতে পারে না। তারা প্রতিশোধ নিতে জানে। সারা ভারতবর্ষের হৃদয়ের ধর্মের মতই নান্দার গাঁয়ের মন। অপরাধীকে যদি ক্ষমা না করতে পারে, তাকে গাছে ঝুলিয়ে লিঞ্চ করে মারে না; সে পদ্ধতিও তারা জানে না। কিন্তু তার চেয়েও ভয়ানক এঁদের প্রতিশোধ। কথা বন্ধ, আলাপ বন্ধ, চোখের দেখা বন্ধ, প্রত্যেকটি আশীর্বাদ বন্ধ। সঞ্জীববাবুর মত গ্রামদ্রোহীর আত্মাকে শুধু নিঃশব্দ উপেক্ষায় এরা শাস্তি দেয়। সে শাস্তি লিঞ্চ আর ফাঁসির চেয়েও অধিক।

হাঁপাতে হাঁপাতে বাক্সের বোঝা ঘাড়ে তুলে সঞ্জীববাবু হেঁটে চলেছিলেন। প্রতি পদক্ষেপে ক্ষুব্ধ নান্দার গাঁয়ের অভিশাপ তাঁর পায়ে কাঁটার মত যেন ফুটছিল।

তবু নিজেরই গাঁয়ের এই অভিমানভরা হৃদয়ের দীর্ঘশ্বাসটুকু তিনি বুঝতে পারছিলেন না। সবাইকে বিদায় দিতে গ্রামের বুক ফেটে যায়। নিতান্ত দায়ে পড়ে তারা নিষ্ঠুর হয়। অপমানিত না হবার আগে কখনো অপমান করে না। সঞ্জীববাবু শুধু পুঞ্জে পুঞ্জে আক্রোশের বোঝা বুকে ভরে নিয়ে চলেছিলেন।

আমবাগানের সরু পথ পার হয়ে মাঠের ওপর বাক্স নামিয়ে একটুখানি জিরিয়ে নিলেন সঞ্জীববাবু। পকেটে নগদ দেড় হাজার টাকার নোট একেবারে ব্যর্থ হয়ে পড়ে আছে। গ্রামের প্রতিশোধকে ঘুষ দেওয়া যায় না। একটিও মুটে মজুর পাওয়া যায় না। সঞ্জীববাবুর শহুরে বুদ্ধি অন্ধ হয়ে খোলা মাঠের শেষ প্রান্ত পর্যন্ত শুধু চোখ মেলে দেখবার চেষ্টা করছিল।

অন্ধ সঞ্জীববাবু সত্যিই এখনো জানেন না, তাঁরই বাড়িতে, একটি কক্ষে তখন মাধুরী আর বাসন্তী হাস্যালাপে গাঁয়ের বাতাসে চাঞ্চল্য জাগিয়ে তুলেছে। মাধুরী বার বার আশ্চর্য হচ্ছিল—তুমি কি রকম যেন হয়ে গেছে বাসন্তী।

বাসন্তী উত্তর দেয়—একটু মোটা হয়ে গেছি, এই তো ?

মাধুরী—না তা ছাড়া…।

বাসন্তী—না আর কিছু নেই। ভাবনা করার মত কিছু হয়নি।

মাধুরী হঠাৎ ভয় পায়।

মাধুরী তার মনের যত শঙ্কাকে শুধু বিশ্বাসের জোরে প্রবোধ দেবার জন্য কিছুক্ষণ চুপ করে থাকে। বাসন্তী তেমনি উজ্জ্বল হাসিভরা মুখ নিয়ে মাধুরীর এই অস্বাভাবিক গাম্ভীর্যকে যেন পাহারা দিতে থাকে। পৃথিবীতে মাধুরীর জীবনের আসন যেন এক অস্থায়িত্বের অভিশাপ, সকল অধিকার ও ক্ষমতার বাইরে ক্ষণে ক্ষণে লুপ্ত হয়ে যেতে চায়। তাই মাধুরীর এত ভয়। প্রতি মুহূর্তে তাই সে এত সহজে মুসড়ে পড়ে, নিজের দুর্বলতাকে চাপা দিয়ে রাখতে পারে না। বাসন্তী ঠিক তার উল্টো। তার জীবনের দাবি এখনো অকথিত রয়ে গেছে। জীবনের প্রাপ্তিকে সে হয়তো মন দিয়ে চেনে, কিন্তু প্রপ্তব্যকে নিজের অধিকার বলে ঘোষণা করার দুঃসাহস তার আজও হয়নি। শোভাযাত্রার জনতার সঙ্গে কেশব ভট্চায গ্রামের পথ ধরে বাসন্তীর বাড়ির সুমুখ দিয়েই চলে গেছে। বাসন্তী দূরে দাঁড়িয়ে সেই দৃশ্য দেখেছে। এর বেশি অধিকার তার নেই। এর বেশি অধিকার ঘোষণা করার নিয়ম নেই। বাসন্তী নিতান্তই গ্রামের মেয়ে, তার চোখের দৃষ্টি গ্রামের নিয়মেই চলে। বাসন্তী বড় হয়ে উঠেছে গ্রামের নিয়মে,

বুঝতে শিখেছে গ্রামের নিয়মে, দুঃখ করতে শিখেছে গ্রামের নিয়মেই।

আজও বাসন্তী মাধুরীর অস্বাভাবিক গাম্ভীর্যের দিকে কৌতুকভরে তাকিয়েছিল। এটা তার অবশ্য কর্তব্য। মাধুরীকে ও কেশবকে বাসন্তী ভাল করেই চেনে। জীবনের এক প্রতিশ্রুতি দিয়ে ওদের হৃদয় বাঁধা আছে। বাসন্তী তার সমগ্র অন্তর দিয়ে এই বন্ধনের পবিত্রতাকে স্বীকার করে, সমর্থন করে। তার আচরণে যেন মাধুরীব জীবনের প্রতিশ্রুতি কোথাও ক্ষুণ্ণ না হয়।

বরং বাসন্তী আজ প্রস্তুত হয়েই এসেছে। সে আজ নিঃসন্দেহ হয়ে ফিরে যাবে, স্পষ্ট করে জেনে যাবে যে, মাধুরী কেশবকে অপমান করেনি। কলেজে পড়ে, শহরে থেকে আর বড়লোকের মেযে হযে মাধুরী তার জীবনের প্রথম অঙ্গীকার ব্যর্থ করে দেযনি। বাসন্তীর মনে এই ভয় আছে। মাধুরীর সম্বন্ধে অনেক কথা শুনেছে। পরিতোষ নামে এক ভদ্রলোকের কথা বাসন্তীও শুনেছে, কি ভয়ঙ্কর ভুল কবতে চলেছে মাধুরী। আর কিছু না হোক্, বাসন্তী আজ শুধু এই আশ্বাস নিয়ে ফিরে যেতে চায় যে, তারই শৈশবের সখী মাধুরী যেন ভুল না করে। শহর থেকে বা বিলেত থেকে কোন বিভীষিকা এসে যেন গ্রামের হৃদয়ের এই শক্তিময় শ্রদ্ধা ও ভালবাসার শক্তিকে ব্যর্থ না করে দেয়। নিয়ম নেই, গ্রামের জীবনে ইতিহাসে ও শাসনে নির্বিদ্ধ তাই বাসন্তী তার নির্দিষ্ট পরিধির বাইরে পা দিতে চায় না। মনের [illegible] ভাষা বোবা হয়েই থাকবে, এই অকারণ কামনার [illegible] সে টু শব্দ করতে দেবে না। কেউ জানবে না, জানতে পারবে না বাসন্তীর নিভৃত হৃদয়ের কথা। অজয়দা কিছুই

জানেন না, মাধুরী কিছু বুঝতে পারবে না। বাসন্তী শুধু তার সকল গোপনতার নিবিড় আগ্রহকে আজ মাধুরীর মনের ওপর সঁপে দিয়ে, মাধুরী করে তৈরি করে দিয়ে সরে যাবে। গ্রামের নিয়মে যার জীবন শৈশব থেকে যৌবনে এগিয়ে এসেছে, গ্রামের নিয়মেই সে চলে যাবে সম্মুখের সহজ পরিণামের পথ ধরে। বাসন্তীর বিয়ের দিনও ঠিক হয়ে আছে; দিন এগিয়ে আসছে। এই গ্রাম থেকে মাত্র তের মাইল দূরে বাসন্তীর ভাবী জীবনের গ্রাম। সকল সংসার সাধনার শেষ অধ্যায়ের ও সমাপ্তির গ্রাম।

বাসন্তী বললো—আমি কিন্তু প্রথমে তোমার কথা শুনে বড় ভয় পেয়েছিলাম।

মাধুরী—কেন ?

বাসন্তী—তুমি কলেজে পড়ছো শুনেই কেমন জানি মনে হয়েছিল।

মাধুরী—এখন কেমন মনে হচ্ছে ?

বাসন্তী—ভালই মনে হচ্ছে, কিন্তু ভয় ভাঙছে না।

মাধুরী—তোমার কিসের ভয় বাসু ?

বাসন্তী—আমার অনেক ভয় মাধুরী। সবচেয়ে বড় ভয়…।

মাধুরী—বল, থাম্‌লে কেন ?

বাসন্তী—ভয় হয় তুমি আবার মীরগঞ্জ চলে যাবে।

মাধুরী—না।

বাসন্তী—তিন সত্যি করে বল।

মাধুরী আশ্চর্য হয়ে বাসন্তীর মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে। এ কিসের আগ্রহ ? বাসন্তীর যেন জীবন-মরণ সমস্যা জড়িয়ে আছে মাধুরীর গাঁয়ে থাকা-না-থাকার সঙ্গে।

মাধুরী—তুমি বিশ্বাস করছো না?

বাসন্তী—তুমি শুধু একবার স্পষ্ট করে বলে দাও, মীরগঞ্জ ফিরে যাবে না।

মাধুরী—না, যাব না।

বাসন্তী—ব্যাস্, আর কোন চিন্তে নেই আমার।

মাধুরীর মনে সন্দেহের দোলা লাগে। একটা অদ্ভুত কৌতূহলের জ্বালা লাগে গায়ে। প্রশ্ন করে—তুমি কিসের এত চিন্তে করছিলে বাসু?

বাসন্তী একটু অর্থহীনভাবেই হাসতে থাকে—তা বলতে পারবো না।

মাধুরী—অজয়দা এখানে আছেন?

বাসন্তী—হ্যাঁ, কেন?

মাধুরী—তোমাকে জিজ্ঞেস করে উত্তর যখন পাচ্ছি না, তখন···।

বাসন্তী—অজয়দা কিছুই জানেন না।

মাধুরী—তা'হলে নিজেই চেষ্টা করে বুঝে নেব।

বাসন্তী—ছাই বুঝবে তুমি। সে ক্ষমতা থাকলে তুমি আর··।

মাধুরী—কি?

বাসন্তী—বিলেত ফেরত মানুষ-টানুষের সঙ্গে সম্পর্ক রাখা তোমার সাজে না।

মাধুরী—তুমিও তা'হলে সব শুনেছ।

বাসন্তী—শুনেছি, কিন্তু এখনো বিশ্বাস করি না।

মাধুরী—বিশ্বাস না করাই উচিত।

বাসন্তীর শাদা মুখ ছাপিয়ে একটা সাফল্য ও গর্বের দীপ্তি ঝক্‌মক্ করে উঠলো। চোখ দুটা চক্‌চক্ করছিল। মাধুরীর একটা হাত আবেগের সঙ্গে ধরে বাসন্তী বললো—তোমার কথা শুনে আমার যে

কী ভালো লাগ্‌ছে, তা বলতে পারি না। আমার সব ভাবনা দূর হয়ে যাচ্ছে।

মাধুরী—এইবার তোমাকে বলতে হবে, কিসের ভাবনা।

বাসন্তী—আমার ভাবনার কথা কি শোনবার মত?

মাধুরী—হ্যাঁ, শুনবো।

বাসন্তী—অজয়দার কাছে সব কথা শুনে আমার বড় ভাবনা হয়েছিল।

মাধুরী—কি শুনেছিলে?

বাসন্তী—কেশবদাকে বোধ হয় তুমি ফাঁকি দিলে, এই ভয় হয়েছিল।

মাধুরী—আর কি কথা বলেছেন অজয়দা?

বাসন্তী—পরিতোষবাবুর কথা শুনেছি।

মাধুরী—কেশবদার যেন মানরক্ষা পায়, তার জন্মেই তুমি এত চিন্তে করতে?

বাসন্তী—হ্যাঁ।

মাধুরী—কেন?

বাসন্তী হঠাৎ চুপ করে রইল, মাধুরীর প্রশ্নটা যেন স্পষ্টতায় আরও তীব্র হয়ে উঠলো—কেন বলতো?

বাসন্তী—তা জানিনা।

মাধুরী—আমি জানতাম বাসু, তুমি উত্তর দিতে পারবে না।

বাসন্তী—দিতে পারি, কিন্তু দিলাম না।

মাধুরী—তুমি নির্ভয়ে বলতে পারো। আমাকে অন্ততঃ আর ভয় করো না। আমি জীবনে আর কারও ক্ষতি করতে পারবো না, ভালও করতে পারবো না।

বসন্তী যেন একটু কঠোরভবে অথচ সমবেদনার আবেগে উত্তর দিল—কিন্তু নিজের ক্ষতি করতে পারবে, তাই ভেবেছ বুঝি ?

মাধুরী—আমি আর কিছু করবো না, শুধু এই গাঁয়ে থাকবো।

বাসন্তী—আমিও আর কিছু বলবো না, শুধু এই গাঁ ছেড়ে অন্য গাঁয়ে চলে যাব।

মাধুরী—কোথায় ?

বাসন্তী—অজয়দাকে জিজ্ঞাসা করে শুনে নিও।

মাধুরী—সে কি ? সব ঠিক হয়ে গেছে না কি ?

বাসন্তী—হ্যাঁ।

মাধুরী—কবে ?

বাসন্তী—এই মাস তিনেকের মধ্যে।

মাধুরী—এত হেসে হেসে বলছো, একটুও দুঃখ হচ্ছে না ?

বাসন্তী—একটুও না।

মাধুরী—একটুও দেরি করতে ইচ্ছে করছে না ?

বাসন্তী আবার যেন একটা আঘাত পেয়ে চুপ করে গেল। মুখের হাস্যময় চাঞ্চল্য ধীরে ধীরে মিলিয়ে গেল। প্রচ্ছন্ন বেদনার ছায়া পড়ে সারা মুখ করুণ হয়ে উঠলো। মাধুরীর প্রশ্নে সাড়া দিয়ে বাসন্তী যেন হঠাৎ না বুঝেই নির্লজ্জের মত বলে ফেললো—হ্যাঁ, আরও কিছুদিন থেকে যেতে ইচ্ছে করছে।

মাধুরী—কেন ?

বাসন্তী—কেশবদা জেল থেকে ফিরে আসুক। তারপর যেন···।

মাধুরী একাগ্র দৃষ্টি তুলে বাসন্তীর মুখের দিকে তাকিয়ে রইল। বাসন্তীর চোখের দৃষ্টিতে, মুখের হাবভাবে কোনও কপটতার স্পর্শ ছিল।

না। যেন নিজের মন থেকে সব গোপনতার বিষের ভার নামিয়ে দিয়ে মুক্ত হয়ে উঠেছে বাসন্তী।

কথায় কথায় রাত হয়ে গিয়েছে। মাধুরী সপ্রশ্নভাবে বাসন্তীর দিকে তাকিয়েছিল। স্থানকালের কথা ভুলে গিয়ে বাসন্তী তখনো যেন নিজের মনের আবেশে সমাধিস্থ হয়েছিল। জীবনের নানা জটিল পথের ধাঁধা পার হয়ে বহু শঙ্কা, কৌতূহল ও আবেগের কুহেলিকা পার হয়ে বাসন্তী শেষ সীমায় এসে দাঁড়িয়ে রয়েছে। ওর মনে আর কোন দ্বিধার দ্বন্দ্ব নেই, ভুল বুঝবার অবকাশ নেই। বাসন্তী একদিক দিয়ে বিজয়িনী হয়েছে, নিজকে চিনিতে সে ভুল করেনি। তাই এর মধ্যে কোন অস্পষ্টতা নেই, তাই বিদায় নেবার জন্য এর কোন কাতরতা নেই, কোন ভয় নেই, শুধু এখান থেকে বিদায় নয়, আর তিন মাস পরে, দাদার পায়ের গোপন উপাসনার সকল দাবি ও বন্ধন থেকে নিজকে মুক্ত করে নিয়ে চলে যাবে বাসন্তী। আজ তার হৃদয়ের সত্যকে ব্যক্ত না করলে পৃথিবীর কেউ অনুযোগ করতো না। কেউ কিছু জানতে পারতো না। মাধুরীর সংশয় কখনো কোন প্রমাণ পাবার অবকাশ পেত না, কিন্তু এইটুকু লোভ ছাড়তে পারেনি বাসন্তী। বিদায় সুনিশ্চিত জেনেও সে হৃদয় খুলে দিয়েছে। উপাস্য সত্যটিকে স্পষ্টকথায় উচ্চারিত করেছে। আর কেউ শুনলে কি ফল হতো, তা জানে না বাসন্তী। কিন্তু মাধুরীর কাছে ব্যক্ত না করাই ভাল ছিল। কিন্তু কি দুর্বলতা, ঠিক যেখানে না বলাই উচিত ছিল, সেখানে সে নিজেই নিজকে ধরিয়ে দিল।

মাধুরী নিজের চিন্তাকে নিয়ন্ত্রণ করার ক্ষমতা হারিয়েছিল। যা মাত্র একটি সংশয়ের মধ্যে উঁকি দিয়েছিল, বাসন্তীর কথা কোন দিন বিচার

করে দেখতে পারে নি মাধুরী, সেই সত্যই আজ রূপে বর্ণে অশ্রুজলে আর সকরুণ হাসির মধ্যে ধরা পড়ে গেল। মান্দার গাঁয়ের মাটিকে সম্পূর্ণ নিরাপদ মনে করেই মাধুরী তার নিজের পথে একটা সহজ গর্বের আবেগে এগিয়ে চলেছিল। এই মাটিতেই তার অনুরাগের অঙ্কুর দেখা দিয়াছিল, এই গ্রামের ছেলেকেই একদিন নিজের হৃদয়ের দর্পণে একান্তভাবে আপনার বলে চিনতে পেরেছিল। এখানে কোন শঙ্কা নেই, বাধা নেই, প্রতিদ্বন্দ্বিতা নেই, কোথা থেকে আড়ালে অড়ালে ঘটনা এই প্রতিশোধের পথে চলে গেছে, তাত কথনো ভাবেনি মাধুরী। মাধুরীর বিবেক একটা অসহ যন্ত্রণায় উত্যক্ত হতে থাকে। অপরাধের গ্লানিতে সারা মনের দর্প মাথা নীচু করে। আজ সে বিজয়িনী নয়, তার পরাজয়ের সকল আয়োজন পূর্ণ। বাসন্তী যেন নিঃশব্দে ও নিভৃতে একেবারে বিনা কারণেই শুধু মাধুরীর জীবনকে অপমান ও পরাজিত করার জন্য এই অনধিকার প্রেমের ভাগিনী হয়েছে।

কেশব কিছুই জানে না। বাসন্তীকে সে আজ শুধু অজয়ের বোন ছাড়া আর কোন ভাবেই চিনতে শিখেনি। কোনদিন ভুলক্রমেও বাসন্তীর কথা কেশব তার অন্তরের সান্নিধ্যে খুঁজে পায়নি। মাধুরীও সে কথা বিশ্বাস করে। কেশব এ বিষয়ে সম্পূর্ণ নির্দোষ। কেশব নির্লিপ্ত। বাসন্তীর কথা হয়তো দিনান্তে একবারও মনে করে না কেশব।

এই নিশ্চিন্ত বিশ্বাস সত্ত্বেও মাধুরীর মন সুস্থ হয় না এটাই আশ্চর্য। কেন এই ভীরুতা? মাধুরীর শঙ্কিত হবার কি আছে? মাধুরীর এতে কি ক্ষতি হবে?

কিছুই নয়, বাসন্তীর মুখের দিকে তাকিয়ে মাধুরী সহজেই বিশ্বাস

করে, কোন্ ক্ষতি করবার আভাস ঐ মুখের ভাবে বা চোখের দৃষ্টিতে নেই। বাসন্তী কোন দিন তার মনের কথা দ্বিতীয় প্রাণীকে জানাবে না। কেশব ভট্টচায্ কোনদিনই বাসন্তীকে চিনিতে পারবে না। এ যেন সমুদ্র জলের একটা ভাসমান ঝিনুক, দূর আকাশের চাঁদের দিকে অনুরাগ ভরে অনর্থক তাকিয়ে আছে। ভয় করবার কিছু নেই, তবু মাধুরীর মর্মপীড়া শান্ত হয় না। একটা প্রচণ্ড শাস্তির জ্বালা রয়েছে, বাসন্তীর এই নিবিরোধ অনুরাগের মধ্যে, পথ থেকে একেবারে দূরে সরে রয়েছে বাসন্তী কাউকে বাধা দেবার জন্য সে প্রস্তুত হয়নি, আর তিন মাস পরে একেবারেই অদৃশ্য হয়ে যাবে, কিন্তু তবু বাধা।

নিজের এই মনস্তত্ত্বের রহস্য নিজেই বুঝতে পারে না মাধুরী। যদি কেশব বাসন্তীর এই গোপন মনের কথা কোনদিন শুনতে পেত, তবে না হয় কথা ছিল, কিন্তু কেশবের মন আজও স্বচ্ছ আছে, সেখানে একটি মাত্র প্রতিচ্ছবি সব স্থান জুড়ে আছে। দ্বিতীয় প্রতিচ্ছবি পড়বার কোন সুযোগ নেই এবং সে সুযোগ কখনো হয়নি। বাসন্তী সেখানে সম্পূর্ণ অবান্তর কল্পনারও বাইরে।

কিন্তু তবু মন আপোষ মানতে চায় না। হেরে যাবার কোন সম্ভাবনা নেই, তবু যেন পরাজয় হয়েই গেছে। বাসন্তীর কাছে এই পরাভবকে মনে মনে স্বীকার করে মাধুরী।

বাসন্তী কথা বলে। মাধুরীর চমকে ওঠে, যেন বাসন্তী তার পরাভূত মনের রূপটি দু'চোখে দেখতে পেয়েছে। বাসন্তী বলে—এবার উঠতে হবে।

মাধুরী—কেন?

বাসন্তী—অজয়দা এসে গেছে আমাকে নেবার জন্য।

অজয়ের আগমন শব্দ বাইরের বারান্দায় শোনা যাচ্ছিল। কিন্তু

পায়ের শব্দে অজয়ের আগমন ধরা পড়েনি, বাসন্তী অজয়ের গলার স্বর শুনেই বিদায় নেবার জন্য প্রস্তুত হচ্ছিল। মাধুবীর কানে বোধ হয় কোন শব্দ পৌঁছয় নি, নিজের চিন্তার বেদনাতেই আত্মহারা হয়ে ডুবেছিলো।

—কার সঙ্গে কথা বললে অজয়দা? বাসন্তীর প্রশ্নে এইবার সত্যিই চমকে উঠলো মাধুবী।

যার সঙ্গে কথা বলছিল অজয়, তাকে কোনদিন বাসন্তী চেনে না। পরিচিত গলার স্বর নয়। হয়তো মাধুবী জানে। বাসন্তী তাই কতূহলী হয়ে মাধুবীর মুখের দিকে উত্তরের আশায় তাকিয়েছিল।

ধীরে ধীরে মাধুবীর মুখটা করুণ হয়ে উঠতে লাগলো। অস্বাভাবিক রকম দেখাচ্ছিল মাধুবীকে। বাসন্তী আবার ব্যস্ত হয়ে উঠতেই মাধুবী বাসন্তীর হাত ধরলো,—আজ তুমি এখানে থেকে যাও বাসু। যেও না।

বাসন্তী—কেন?

মাধুবী—আমার বিপদ ঘনিয়ে উঠেছে।

বাসন্তী—বিপদ!

মাধুবী—হ্যাঁ।

বাসন্তী—কেন?

মাধুবী—শুনতে পাচ্ছ না, বাইরে কে কথা বলছে?

বাসন্তী—অজয়দার সঙ্গে?

মাধুবী—হ্যাঁ।

বাসন্তী—তুমি চেন? কে?

মাধুবী—উনিই বিলেত থেকে ফিরেছেন।

বাসন্তী—পরিতোষ বাবু?

মাধুরী—হ্যাঁ।

বাসন্তী চুপ করে রইল। তার নিজের জীবনের সঙ্কটকে কখনো এ ভাবে আপন করে দেখেনি বাসন্তী। কিন্তু মাধুরীর বিপদকে অগ্রাহ্য করবার ক্ষমতা সে খুঁজে পায় না। নিজের সঙ্কটকে অবাধে ছিন্নভিন্ন করে নিজেকে মুক্ত করে নিয়ে যাবার শক্তি বাসন্তী রাখে, তার জন্য সে প্রস্তুত হয়েই আছে। কিন্তু মাধুরীর একটি কথায় বাসন্তীর সারা অন্তঃকরণ মমতায় নত হয়ে আসে। এক পরাভূত দুর্বল জীবন তারই কাছে সব দিক দিয়ে আজ প্রসন্নতায় প্রার্থিনী হয়ে উঠেছে। তারই কাছে আবেদন জানাচ্ছে।

বাসন্তী বললো—তুমি এরকম করছো কেন মাধুরী? তুমি না কলেজে পড়েছ?

মাধুরী মাথা নেড়ে উত্তর দেয়—না।

বাসন্তী হেসে ফেলে। মাধুরীর সবল গর্ব আজ দিশেহারা ও শক্তিহারা হয়ে গেছে। নিজেরই রচনা করা ব্যর্থতার ফাঁদে জড়িয়ে পড়েছে। মুক্তির জন্য অস্থির হয়ে উঠেছে। কিন্তু চারিদিক থেকে শাসনের সকল ইঙ্গিত ওরই দিকে প্রধাবিত হয়েছে। জীবনে একটা ফাঁকিকে ঢাকতে গিয়ে এইভাবে শত ফাঁকির আশ্রয় নিতে হয়। কিন্তু তবুও ঢাকা পড়ে না। আজ মাধুরী বুঝতে শিখুক, কোথায় তার ভ্রম। তার সকল অহঙ্কারের ভিত্তি কত দুর্বল। জীবনের প্রথম সত্যকে অপমান করতে নেই। সারা জীবন ধরে তা'হলে শুধু ঘুষ দিয়েই চলতে হবে। কেউ আপন হবে না। কাউকে আপন করা যাবে না।

বাসন্তী সমবেদনার সুরে বললো—কি করবো ভাবছি।

মাধুরী—তোমাদের বাড়িতে আমায় আজ নিয়ে চল।

বাসন্তী উৎফুল্ল হয়ে উঠলো—তাই ভাল হবে মাধুরী। অজয়দাকে ডেকে বলে দিই তোমাকে আমি আজ নেমন্তন্ন করেছি।

মাধুরী—তাই বল।

বাসন্তী তবু দ্বিধা করে। চুপ করে ভাবে। যেন অলক্ষ্যে আর একটা প্রশ্ন তার মনের ভেতর গিয়ে ঢুকছে, দুর্বল করে আন্‌ছে।

মাধুরী বললো—আবার কি ভাব্‌তে বসলে ?

বাসন্তী—ভাবছিলাম, পরিতোষ বাবুর কথা। ভদ্রলোক এই মাত্র আসলেন, এখুনি যদি তুমি চলে যাও, তা'হলে···।

মাধুরী—কিছু হবে না।

বাসন্তী—ভদ্রলোক হয়তো আশা করছেন··· ।

মাধুরী—আমি জানি না, তিনি কি আশা করে আছেন।

আকাশে মেঘ ছিল না, কিন্তু ঘরের ভেতর বন্দী দুটি মনের মধ্যে তার চেয়ে বেশী গুমোট ছেয়ে ছিল। বাসন্তী বা মাধুরী, দুজনেই স্তব্ধ হয়ে বসেছিল। সুমুখের দিকে তাকালে যেন আর কোন পথের চিহ্ন দেখা যায় না। দুজনেরই জীবনের বৃত্তান্ত শেষ অধ্যাযে এসে চরম সঙ্কটের কাছে আত্মনিবেদন করে এইখানে সমাপ্ত হবে। আর অগ্রসর হবার, সম্মুখ দিকে চলবার কোন প্রশ্ন বা জিজ্ঞাস্য নেই। পিছনের অতিক্রান্ত পথের সকল ভুল ও অনুতাপের হিসাব মিলাবার আশাও মুছে গিয়েছে। এখন পিছিয়ে গিয়েও কোন পরমার্থ লাভ হবে না, এগিয়ে যাবার মত লক্ষ্যও নেই। তাই দুজনেরই মুখের দিকে তাকালে মনে হয়, দুজনে শুধু একটা চরম সঙ্কটে আত্মরক্ষার জন্য উৎকণ্ঠিত হয়ে আছে।

এই বিষণ্ণ আবহাওয়াকে যেন উড়িয়ে দিবার জন্যই অজয় এগিয়ে

আসছিল উচ্চ হাসির ঝড় তুলে। পরিতোষ আর অজয় মনখোলা গল্পের আবেগে এক সঙ্গে ঘরের দরজার কাছে এসে দাঁড়ালো। অজয় চীৎকার করে ডাকলো—তোরা কোথায় আছিস বাসু ?

বাসন্তী ব্যস্তভাবে উঠে দাঁড়ালো। অজয় বললো—আমরা এসেছি চলে যাবার জন্যই, তোদের বিরক্ত কবতে আসিনি।

আরও স্পষ্ট করে বুঝবার জন্যই বাসন্তী অজয়ের দিকে একটু বিস্মিত-ভাবে তাকিয়ে রইল।

এই হেঁয়ালির সঙ্কট থেকে মুক্তি দেবার জন্য অজয় এইবার সুস্পষ্ট করেই বললো—পরিতোষ বাবু আব আমি এখুনি মীরগঞ্জ রওনা হব। আমাকে সঙ্গে নেবার জন্যই পরিতোষ বাবু এসেছেন।

বাসন্তী একটু কুতূহলী হযে উঁকি দিযে দেখবার চেষ্টা করলো,- পরিতোষ কোথায়। পরিতোয বাবান্দার উপর একটা চেযাব টেনে নিযে পরিশ্রান্ত অথচ শান্তভাবে বসেছিল। পবিতোষকে এই প্রথম স্বচক্ষে দেখতে পেল বাসন্তী। অজযদাব কাছে এঁরই সম্বন্ধে কত কাহিনী শুনে এসেছে। সে-কাহিনীব ইতিবৃত্ত আজও মনের মধ্যে বহু ধারণার ধোঁযা সৃষ্টি করেছে। ইনিই সেই বিলেত ফেরত ভদ্রলোক, মাধুরীর বাবার টাকায সাহেবদের দেশে গিযে অঢেল ইংরেজী শিখে ফিরেছেন। মাধুরীকে ইনিই মুগ্ধ করেছেন। এঁরই মুখের দিকে তাকিযে মাধুরী তার মান্দার গাঁযের ষোল বছবের জীবনের ইঙ্গিতকে অস্বীকার করেছে। আলেযা আলোর চেয়েই সুন্দর নিশ্চয, চোখে মোহ সৃষ্টি করে। মাধুরীর তাই হয়েছিল। বাসন্তী তাই খুবই সঙ্কোচে ও সাবধানে তাব কৌতূহলের উগ্রতা সংবরণ করে বাব বার পরিতোষের দিকে তাকাচ্ছিল।

একটু বিস্মিত ও বেদনাহতভাবেই বাসন্তী বা ব বার চোখ ফিরিয়ে

নিচ্ছিল। তার এতদিনের ধারণার অর্থগুলি হঠাৎ মিথ্যে হয়ে যাচ্ছে। পরিতোষের দিকে তাকিয়ে নিন্দে করবার, বিরক্ত হবার এবং অবজ্ঞা করবার কোন প্রমাণ আবিষ্কার করা যায় না। বেশ সাদাসিধে শান্ত ভদ্রলোক। প্যান্ট-কোটের জমক নেই, মুখে চুরুটও নেই। একেবারে অজয়দার মত উদার উজ্জ্বল ও প্রসন্ন চেহারার একটি ভদ্রলোক। বাসন্তী মনে মনে অজ্ঞাতসারেই অনুতপ্ত হয়, চোখের দৃষ্টিটা বেদনায় বিভ্রান্ত হয়ে ওঠে। পরিতোষ বাবুর চেহারায় ও আচরণে কোন কিছু সন্দেহ করার নেই, বড়লোকী ফাঁকির নিষ্ঠুরতার ছাপ নেই।

অজয়ের কথার কোন উত্তর দেওয়া হয়নি, বাসন্তী তার কৌতূহলের আবেগ সংযত করে বর্তমান প্রসঙ্গের দিকে মনোযোগ দিল।—এখুনি মীরগঞ্জ যাবার কি এমন দরকার হলো ?

—দরকার আছে।

চাপা গলায় একটু সঙ্কোচ করে বাসন্তী আবার অজয়কে প্রশ্ন করে—কার কাজ দাদা ? ওঁর ?

অজয়—ওঁর এবং আমার।

বাসন্তী—কিছু বুঝলাম না।

অজয়—হঠাৎ কেশবের ব্যাপার।

বাসন্তী একটু উৎসাহিতভাবেই প্রশ্ন করলো—কেশবদাকে ছাড়িয়ে আনছ ?

অজয়—তারই চেষ্টা করবো।

বাসন্তী—এর মধ্যে উনি…।

বাসন্তী পরিতোষের অন্যমনা মূর্তিটার দিকে দৃষ্টির ইঙ্গিত তুলে অজয়কে প্রশ্ন করতে গিয়ে থেমে যায়। বাসন্তীর সংশয়গুলি একে একে ছিন্ন হয়ে

বিস্ময়ের রূপে বদলে যাচ্ছে। পরিতোষ বাবুর মত লোক, তিনিও এসেই সবার আগে কেশবদার খোঁজ নিয়েছেন। শুধু খোঁজ নয়, তাঁকে উদ্ধার করার জন্য প্রস্তুত হয়েছেন। হ্যাঁ, ঐ শান্ত মূর্তির মধ্যে সেই প্রতিজ্ঞা যেন স্থির হয়ে আছে। কিন্তু কী অসম্ভবের কাহিনী আজ সম্ভব হতে চলেছে। যা দুরাশার চেয়েও দুরূহ ছিল, যে-সমস্যা শিবের অসাধ্য রোগের মত জটিল ছিল, তাই আজ খোলা বাতাসের মত সব জঞ্জাল উড়িয়ে নিয়ে চলেছে। কেশব ভট্চাযের আত্মা আজ মান্দার গাঁয়ের কাছে তার ন্যায্য সম্মান আদায় করে ছাড়ছে। পরিতোষবাবু বিলেত থেকে ফিরে এসে মাধুরীর জীবনে এক অমঙ্গলের প্রদাহ সৃষ্টি করবে, দুর্বল, ভীরু, বিপন্ন ও অনুতপ্ত মাধুরীকে সকল দিক দিয়ে অবশিষ্ট জীবনের জন্য বিব্রত করবে, বাসন্তীর মনের আড়ালে এই আশঙ্কা একটা বিশ্বাসের মতই পুষ্ট হয়ে উঠেছিল। সেই পরিতোষের আবির্ভাব আজ সত্য হয়ে উঠেছে, কিন্তু শাস্তির রূপে নয়, শান্তির রূপেই। সত্য হোক, সত্য হোক, বাসন্তীর এই নতুন বিশ্বাস সত্য হোক। আজ সত্যই বাসন্তীর প্রতীক্ষার ব্রত সমাপ্ত হতে চলেছে। সব দিক দিয়ে সকল মালিন্য দূর হয়ে যাবে, যার যার উচিত পথে জীবনের যাত্রা সুরু হবে, এই বাঞ্ছনীয় মুক্তি আজ আসন্ন। বাসন্তীর আজ আর দুঃখ করবার কিছু নেই। কেশব ভট্টাচার্যের দাবি মান্দার গাঁয়ে সবার বড় হয়ে রইল। সকল উপেক্ষা ও বাধা সরে গেল। মাধুরীর প্রায়শ্চিত্তও আজ এইখানে সাঙ্গ হোক্। কেশব ভট্চাযের দিকে আবার পাঁচ বছর আগেকার সুস্মিত, কৃতজ্ঞ ও মায়াসজল দৃষ্টি দিয়ে তাকাবার শক্তি ফিরে পাবে মাধুরী। কেশবদা আবার ফিরে আসবে। শুধু আসবে কেন, শীগ্‌গির আসছে। পরিতোষবাবু আর অজয়দা সেই আয়োজনের জন্য উঠে পড়ে লেগেছেন।

বাসন্তী মাধুরীর দিকে তাকালো কিছুক্ষণ নিশ্চল হয়ে চুপ করে রইল। মনে মনে যেন তার বাকি কর্তব্যের তালিকাটা একবার দেখে নিল বাসন্তী।

—ওঠ মাধুরী। বাসন্তী মাধুরীর দিকে এগিয়ে গিয়ে আস্তে আস্তে বললো।

—মাধুরী, তুমি একবার এস এদিকে, ওভাবে মুখ লুকিয়ে বসে থাকলে চলবে না।

অজয়ও চেঁচিয়ে তার স্বভাবসুলভ উৎসাহ ও আবেগের সঙ্গে বলে উঠলো।

হঠাৎ উঠে দাঁড়ালো মাধুরী। অলক্ষ্যে কোথা থেকে যেন এক ঝলক বিদ্যুতের আলো এসে নিথর হয়ে গেছে। এক দীর্ঘ যন্ত্রণায় ওর আত্মা যেন স্নান সেরে নিয়ে শুচিস্নিগ্ধ হয়ে উঠেছে। সব ভুলকে এক পাশে সরিয়ে দিতে পেরেছে এতক্ষণে, সকল আকাঙ্ক্ষাকে হাসিমুখে বিদায় দিতে পেরেছে—অত্যন্ত সরল, সহজ ও স্বাভাবিক ভাবে ঘরের বাইরে গিয়ে দাঁড়ালো মাধুরী। অজয় এক পাশে সরে গেল। বাসন্তী পেছু পেছু দরজা পর্যন্ত এসে থেমে রইল।

পরিতোষ হাসিমুখেই অভ্যর্থনা করলে মাধুরীকে—কেমন আছ? আমি পরশুদিন মীরগঞ্জ পৌঁচেছি।

মাধুরী—আছি ভালই। তবে···।

পরিতোষের হাসি আরও উজ্জ্বল হয়ে উঠলো—বলেই ফেল, আমাকে শেষ পর্যন্ত তুমি যদি ভয় কর তা'হলে···।

মাধুরী—না তোমাকে আর ভয় করি না।

পরিতোষ—আমি এসেই সব শুনলাম। কেশববাবুর খবর শুনেই মনে হলো···।

মাধুরী—সত্যই কি সে জন্য তুমি এসেছ ?

পরিতোষ—সব খবর শুনে মনে হলো, আমারও কিছু একটা কর্তব্য আছে।

মাধুরী চুপ করে রইল। পরিতোষ যেন নিজের মনের আবেগে বলে বসলো—কেশববাবুকে ছাড়াবার জন্য একটা চেষ্টা করতে হবে। অন্যায় করা হয়েছে—তার ওপর। তোমার বাবা আমাকে বুঝতে ভুল করেছেন…।

মাধুরী—তুমি ওঁকে ক্ষমা করো।

পরিতোষ—ছি, ছি, ক্ষমার কথা আসছে না। বিলাতে গিয়ে আমি বিলিতী হতে পারব না, একথা তাঁকে আমি আগে থেকে জানালেই ভাল করতাম।

মাধুরী হাসছিল—সত্যিই যে দেখছি, বিলিতী হতে পারনি।

পরিতোষ—না, হতে পারিনি মাধুরী। ভারতবর্ষের খবর সব পেতাম। খবরের কাগজের বিবরণ পড়তাম। তারপর আর পারলাম না। বুঝতে পারলাম, কোনো একটা ভুল হয়েছে, ভুল পথে এসেছি। তাই ফিরে এলাম।

মাধুরী একাগ্রদৃষ্টির মোহ নিয়ে পরিতোষের দিকে তাকিয়ে তার কথা শুনছিল। বাসন্তী আর একবার উঁকি দিল। পরিতোষের মুখটাও স্পষ্ট দেখতে পেলে বাসন্তী। একেবারে ছেলেমানুষের মুখ, দেখলেই মায়া হয়।

বারান্দার ওপর ছোট একটা ভিড় সৃষ্টি করে দাঁড়িয়েছিল চারজন—পরিতোষ, মাধুরী, বাসন্তী আর অজয়। অজয় বললো—আর সময় নেই, বেশি রাত হয়ে যাবে, এখুনি রওনা হতে হয়।

তবু রওনা হবার মত ব্যস্ততা দেখা দিল না। সকলকেই রওনা হতে হবে, কিন্তু কে কোথায যাবে, তার যেন সিদ্ধান্ত খুঁজে পাওযা যাচ্ছিল না। একটা বাঁকের মুখে, বহুদিনের কতকগুলি ঘটনার স্রোত এসে পৌচেছে এইবার কোনদিকে বইতে হবে, তার নির্দেশ জানা নেই কারও, মনে হয, এইবার কুল ছাপিয়ে যাবে, ভাঙন ধরবে। স্থিরতার দিন ঘুচে গেছে। স্বপ্ন দেখার পালা শেষ হয়ে গেছে। আগ্রহ, প্রতীক্ষা ও পরীক্ষার আব অবকাশ নেই। আজ এই মুহূর্তে যে যার পথ কবে নেবে, নইলে চিরকালের মত আর পথ পাওযা যাবে না। কিন্তু এই পথে এগিযে যাবার নিযম ও রীতি কেউ জানে না। চুপ করে চারটি জীবনেব ছাযা যেন দাঁড়িয়ে আছে। আকাশের দিকে তারা সবাই অবাক্ হযে চেযে আছে, আর যেন ঝড়ের আশা নেই কোথাও। নতুন সূর্যোদযেব কোন সম্ভাবনা আর নেই। সব সমস্যাব সমাধান হযে গেছে এইভাবেই। আজ তাদের চরম অভিযান। যদি আজ সাহস করে এখান থেকে তারা নড়তে না পাবে, তবে চিবযুগেব মত এইখানে স্তব্ধ হযে থেকে যাবে তারা। ভাল হোক্, মন্দ হোক—বুঝতে পারুক আর নাই পারুক্— আজ এখুনি যাত্রা শুরু করতে হবে। গন্তব্য যদি না জানা থাকে, তবুও।

অজয জানে, না যেযে তার উপায নেই। কারণ এই গাঁযেই তাকে থাকতে হবে। কেশব ভট্‌চাযকে এ গাঁযে ফিরিয়ে না আনলে, এ গ্রাম আর তার পক্ষে বাসযোগ্য হবে না। একাকী থাকবার মত মনেব সাহস তার আর নেই। এ গ্রামে জীবন ছিল, ভাঙন ধবেছিল, আবাব জীবনের উৎসব জেগে উঠেছিল—কিন্তু এখন শুধু নির্বিকার শূন্যতা। এ গ্রামে আর পৈতে-আন্দোলন হবার আশা নেই। দলাদলি করাব মত উদ্যমও শেষ হযে গেছে। এ গ্রামে আর শান্তি সম্মানের পৌরুষ

গর্জন করে উঠবে না, কেশব ভট্চাযকে বিসর্জন দিয়ে মান্দার গাঁ চরম অবনতির সার্থক করেছে। নতুন বিদ্যাপীঠ আজ হলো না, কিন্তু সেই আর্য পাঠশালাকেও ফিরে পাওয়া যাবে না। ইংরেজী স্কুলের নতুন চালা তৈরি হচ্ছে। হেডমাস্টার দিনমণি বিশ্বেস, প্রেসিডেন্ট ভূদেব চাটুয্যে আর সার্কেল অফিসার বন্দুক নিয়ে গাঁয়ের বাগানে বাগানে পাখি শিকার করে ফিরছেন। গাঁজার দোকানের সামনে ভিড় বাড়ছে। অজয় শুধু একটি সুস্বপ্নকে বুকে আঁকড়ে রয়েছে—হতে পারে, সবই সম্ভব হবে, যদি কেশব আবার ফিরে আসে।

কিন্তু তাকে ফিরিয়ে আনানো কঠিন। বিলেত ফেরত পবিতোষও সেই কথা ভাবে, কেশবের সকল বিশ্বাসকে চরমভাবে ফাঁকি দিয়েছে মান্দার গাঁ। মাত্র পাঁচ বছরের জন্য গাঁয়ের সম্মানের লড়াই লড়তে গিয়ে—একটা সাহসভরা বুক, প্রীতিভরা মন শুধু ফিরে এসেছিল ধিক্কার শুনবার জন্য, তার সাধের ছবিকে সবাই ছিঁড়ে রেখে দিয়েছিল। তার মন্দিরের সব সামগ্রী উল্টে পাল্টে গেল। যেখানে যাকে রেখে গিয়েছিল কেশব, ফিরে এসে ঠিক সেইখানে তাকে আর পাওয়া গেল না। খুঁজে খুঁজে হারান হয়েছে, কৌতূহল ব্যর্থ হয়েছে, আগ্রহ অপমানিত হয়েছে। সকল ফাঁকিকে চরমভাবে নিষ্ঠুর করে দিয়েছে, মাধুরী আর সঞ্জীববাবু।

পবিতোষ বিস্মিত হয়েই ভাবে। প্রতি মুহূর্তে মনের মধ্যে দিয়ে তীব্র চিন্তার বন্যা ছুটে যায়। অজয়ের কাছে সকল ইতিহাস শুনতে পেয়েছে পবিতোষ। কেশব ভট্চাযের কাহিনী সবই জানতে পেরেছে। মাধুরীর জীবনের প্রথম আখ্যায়িকা তার আজ আর অজানা নেই। পবিতোষের মনে তার জন্য কোন আক্ষেপ ও বিষণ্ণতা নেই। জীবনের

সত্য ইতিহাসকে শ্রদ্ধা করার শক্তিতেই সে যেন আরও সুন্দর হয়ে উঠেছে। মাধুরীর ওপর এক তিল বিদ্বেষের কথা তার মনে আসে না। পরিতোষ শুধু জানে—সে ভয়ানক একটা ভুল করতে চলেছিল, সেই ভুল থেকে বেঁচে গেছে। মাধুরীর জন্য আজ তার মনে কোন মমতার অভাবও নেই। হোক্, মাধুরীর জীবনের প্রথম আগ্রহ সার্থক হোক্। এর মধ্যে পরিতোষের প্রথম জীবনের সত্যটুকুই জয়ী হবে। কেশবের স্বপ্ন কেশব ফিরে পাবে। মাধুরীর ওপর মনে মনে একটা অভিমান একটুখানি আভাস দিয়েছিল শুধু। এই অভিমান বড় হয়ে উঠতো, কেশবের মনের সকল প্রসন্নতাকে তিক্ত করে দিত, কিন্তু বাঁচিয়ে দিয়েছে অজয়। অজয়ের কাছে কেশবের পরিচয় পেয়েছে পরিতোষ। একটি নতুন মানুষের পরিচয়। বিলেতের হোটেলে বসে নিজেদের দেশের শত দুঃখের ও অপমানের কাহিনী শুনতে শুনতে পরিতোষের মনে এক নতুন জাতির কল্পনা ফুটে উঠতো। এক নতুন মানুষের দল জাতির মুক্তির কামনাকে সফল করে তুলবে। কারা সেই মানুষ? কোথায় তাদের পাওয়া যাবে? কি হবে তাদের সাধনা? কেমন হবে তাদের মন? পরিতোষ যেন মনে মনে দেখতে পায়—সেই ধরণের মানুষ দেখা দিয়েছে ভারতবর্ষের মাটিতে। এরা মাটি কামড়ে পড়ে থাকে। কেশব ভট্চায সেই ধরণের মানুষ। ভারতের মাটিতে আজও ওরা প্রহরীর মত জেগে আছে। কোন ফাকিতে ওরা ভুলবে না। যারা বিলিতী হয়ে গেছে, যারা বড় বেশি লেখাপড়া শিখেছে, যাদের অঢেল পয়সা হয়েছে, তারা সবাই এই মাটির দেশ গ্রামকে বদলে দিতে চায়। কেশব ভট্চাযেরা গ্রামকে বাঁচিয়ে রাখতে চায়, মস্ত বড় পার্থক্য! পরিতোষ সব দিক দিয়ে ভেবে দেখেছে। আজ আর নতুন করে ভাবনা করার

কিছু নেই। কেশব ভট্চাযের আসন শূন্য থাকবে না। তাকে ফিরিয়ে আনতে হবে।

মাধুরী জানে, আর কোন পথ নেই। তার যাত্রা শুরু হবার কোন আশা নেই। দু'দিকের পথচিহ্ন লুপ্ত হয়ে গেছে। এই রাত্রির অন্ধকারে এক পা বাড়িয়ে এগিয়ে গেলেই তার অস্তিত্ব মুছে যাবে। মাধুরী তৈরি হয়ে আছে শুধু সকল আহ্বান থেকে মুক্ত করে নিজেকে এই অন্ধকারে অস্তিত্বহীন করে দেবে।

বাসন্তীই সবার আগে কথা বললো—তোমরা রওনা হয়ে যাও দাদা। মাধুরী আজ আমাদের বাড়িতে থাকবে।

একমাত্র বাসন্তীই জানে তার পথ। সুস্পষ্ট ভ্রান্তিহীন পথ। আজ তার জীবন এইখানে দু'ভাগ হয়ে গেছে। কেশবদা হয়তো ফিরে আসবে আর ক'দিন পরে, কিন্তু বাসন্তী আর ফিরে আসবে না। তাকে চলে যেতে হবে এই গ্রাম ছেড়ে, আর এক গ্রামে। সে গ্রামে তার ভিন্ন জীবন শুরু হবে, ভিন্ন পথে। এখানে জীবনের একটা কাহিনী শেষ হলো।

নিতান্ত সরল ও অনাড়ম্বর শান্তির মধ্যে কাহিনীটা নিজের আবেগেই এখানে এসে শেষ হলো। বাসন্তীর নিজের ভূমিকার অভিনয় শেষ হয়ে গেছে। শুধু মান্দার গাঁয়ের সকল ঘটনার নাটমঞ্চ থেকে অন্ধকার ঘুচে যাক্, আবার ব্যথাহত মুখগুলি সুন্দর হয়ে উঠুক্, বাতাস স্বচ্ছ হোক্—বাসন্তী মনে-প্রাণে আজ শুধু তাই প্রার্থনা করে।

অজয় একটা লণ্ঠন হাতে তুলে নিল। পরিতোষ পাশে গিয়ে দাঁড়ালো। মাধুরীদের বাগানের শেষ বেড়া পার হয়ে পথে উঠতেই চারজনেই চুপ করে রইল। পথ চলার সঙ্গে সঙ্গে মনের উৎসাহ যেন

আর স্বাভাবিক ছন্দ রাখতে পারছে না। সকল প্রশ্নের অবসান করবার জন্য, সকল অপরাধকে শেষ শাস্তির জ্বালা দিয়ে বিদায় করাব জন্য, সকলভাবে জীবনের পরম ক্ষমাকে সন্ধান করার জন্যই যেন তাবা অভিযানে বের হযেছে। কিন্তু মনে মনে সবারই ভয হয, আবার কোন ভুল যদি হয়ে যায। পরিতোষের মুখের দিকে তাকিযে অজয বিমর্ষ হযে পড়ে। মাধুরীর মুখের দিকে তাকিযে বাসন্তীর চোখ ঝাপ্‌সা হযে আসে। সম্মুখের সকল জটিলতাকে ছিন্ন কবে, সকল দ্বন্দ্ব ঘুচিযে দিযে আবাব গ্রামেব পাঁচ বছর আগের মহিমাকে সোজা পথে ফিবিযে এনে প্রতিষ্ঠা করতে হবে। আর কোন বাধা নেই। সঞ্জীববাবু বাধা দিযেছিলেন, তিনিও তাঁব জীবনেব ধর্ম কর্ম লক্ষ্যেব এক ভিন্ন প্রতিজ্ঞাব আক্রোশে একেবারে স্পষ্টভাবে পব হযে গেছেন, এই পথ থেকে সবে গেছেন। সঞ্জীববাবুর মূর্তি আর কখনো এই সমাধানেব উৎসবে হাসিমুখে দেখা দেবে না। তিনি কেশবকে স্বীকাব কববেন না, মাধুবীকে স্বীকার করবারও তাঁব আব স্পৃহা নেই, তিনি সব দিক দিযে সদব মীবগঞ্জেব নতুন বড়লোক হযে গেছেন।

ভয ছিল পরিতোষকে। কিন্তু পরিতোষ আজ আব পথেব ওপব বাধার রূপে দাঁড়িযে নেই। সবাব পাশে পাশে সে চলেছে। আজকেব এই যাত্রারম্ভে সকল মৌনতা, গোপন বেদনাব গাম্ভীর্যেব মধ্যে একমাত্র পবিতোষের মূর্তি নির্ভযতার আলোক ছড়িযে দিযেছে।

অজয একটা গল্প আরম্ভ করলো। পরিতোষ মনেব গভীব আগ্রহ দিয়ে গল্পটা শুনছিল। মান্দার গাঁযেব আব একটি মানুষেব কাহিনী। পরিতোষেব কাছে সম্পূর্ণ অভিনবত্বেব আস্বাদ নিযে কাহিনীটা কারুণ্যে ও ভয়াবহতায বিচিত্র হযে উঠছিল। ভজুব কাহিনী। অজয যেন

মান্দাব গাঁযেব পোড়া মাটিব জ্বালা দিযে তৈরি এক দুর্দান্ত দুঃখীর জীবনী পড়ে শোনাচ্ছিল।

অজয বলছিল—অদ্ভুত লোক এই ভজু, দিনের বেলায় তার মূর্তি কোথাও চোখে পড়ে না। বোধ হয সূর্যেব আলোককে ও ভয পায। কিংবা দিনেব আলোতে পৃথিবীব দিকে চোখ মেলে তাকাতে পারে না ভজু, দিনেব বেলায একমাত্র গাঁজাব দোকানেব সামনে একবার আসে, ভক্ত পূজারীব মত। চোখ ঘোলাটে কবে, গাঁ সুদ্ধ মানুষকে অভিশাপ দিতে দিতে চলে যায। চুবি ক'বে জীবিকা উপার্জন কবে। পয়সার জন্য সব কবতে পাবে। আট আনা পযসাব জন্য লোকেব বাড়িতে আগুন দিতে পাবে। ওব জীবনে শুধু একবাব একটা সখ দেখা দিযেছিল।

পবিতোষ—কি ?

অজয—ভজুব মনেব বড সাধ ছিল চৌকিদাব হবে। বতন ছিল ওর চোখেব বিষ। কিন্তু বতন চৌকিদাবী ছেড়ে জেলে যাবাব পর থেকে ··।

পবিতোষ—ভজুই চৌকিদাব হযেছে।

অজয—না। ভজুব অবস্থা বডই খাবাপ। ভজুব বুকে একটা বেদনা দেখা দিযেছে। শ্বাসকষ্ট হয। আজকাল আব ঘর থেকে বের হয না। আমি একদিন দেখতে গিযেছিলাম ভজুকে।

পবিতোষ—কি হযেছে ভজুব ?

অজয—বোধ হয যক্ষ্মা বোগে ধবেছে ভজুকে।

পরিতোষ—দুঃখেব বিষয।

অজয—ভজু মবতে চলেছে, সেজন্য ভজুর কোন দুঃখ নেই। ভজুর

শুধু একটা ইচ্ছা আছে। মববাব আগে কেশবেব সঙ্গে একবাব দেখা কবতে চায় ভজু।

পবিতোষ যেন উৎফুল্ল হযে উঠলো—কেশববাবুর সঙ্গে ? কেন ?

অজয—জানি না। ভজু বলে, শুধু সে একবার কেশবকে দেখতে চায।

পবিতোষ চুপ করে রইল। সমস্ত ঘটনাব বিবরণগুলিই পবিতোষের কাছে অদ্ভুদ রহস্যময লাগছিল। কেশবকে কোনদিন চোখে দেখেনি পবিতোষ। বিলেত থেকে ফিবে এসে মাত্র একটা কাহিনীব মাধ্যমে কেশবকে সে দেখতে পেযেছে।

অজযেব বাড়িব কাছাকাছি এগিযে এসেছে সবাই। ঘন বাগানেব লতাপাতায বন্দী কালো অন্ধকাবেব বহস্য ভেদ করে প্রদীপেব আলোর আভা ফাঁকে ফাঁকে ছড়িযে পডছিল। মাধুবী আব বাসন্তীব গন্তব্যের সীমা এই পর্যন্ত। ওবা আব এগিযে যাবে না। ওদেব ব্রত শুধু প্রতীক্ষাব ধৈর্যে শান্ত হযে থাকবে। শুধু অজয আর পরিতোষ থামবে না। এরা সোজা হেঁটে রওনা হযে যাবে মীরগঞ্জেব দিকে।

সবাই একবাব থামলো। অজযেব স্তব্ধতাই একটু অদ্ভুত বকমেব মনে হচ্ছিল। অজয যেন জিবিযে নেবাব জন্য দাঁড়ালো।

পবিতোষ বললো—আব থেমে কাজ নেই অজযবাবু। চলুন একটানা চলে যাই।

অজয কোন উত্তব দিল না। নিজেব মনেব আড়ালে একটা বেদনার বোঝাকে যেন সে সবিযে দিযে হাল্কা হবাব চেষ্টা কবছিল।

ক্ষণিকের জন্য অজয় আর কিছু ভাবতে পারছিল না। শুধু মনে হয় পরিতোষের কথা। কি দোষ করেছে পরিতোষ? কি ভুল করেছে পরিতোষ? তার শোনা কাহিনীর সকল ইতিবৃত্তকে তন্ন তন্ন করে খুঁজেও আজ আর পরিতোষকে দোষী করার মত কোন প্রমাণ খুঁজে পায় না অজয়। পরিতোষকে আহ্বান করেছিলেন সঞ্জীববাবু। পরিতোষকে বিলেত যাবার খরচ, জীবনে বড় হবার সকল সুযোগ দেবার আশ্বাস দিয়ে সঞ্জীববাবু তাকে কাছে টেনে এনেছিলেন। কিন্তু তার চেয়ে বড় আহ্বান এসেছিল মাধুরীর কাছ থেকে। অজয় কোন দাবি নিয়ে কারও কাছে দাঁড়ায় নি। অজয় তার সম্মুখের ভবিষ্যৎ প্রতিশ্রুতিকে আদায় করবার জন্য মাধুরীর কাছে হাত পাতে নি। মধুরী নিজে থেকেই পরিতোষের মুখের দিকে তার বিহ্বল দৃষ্টির একগ্রতা নিয়ে তাকিয়েছিল। সাথী হয়ে পাশে দাঁড়াবার মত একটি স্নিগ্ধ ছায়ার স্পর্শ যেন পরিতোষের কাছে কাছে রয়েছে। ইচ্ছা করে নয়, চেষ্টা করে নয়, নিজেরই হৃদয়ের ধর্মে মাধুরী সাড়া দিয়েছিল। কেশবকে ভুলতে পারেনি মাধুরী, যে-আসনে কেশব বসে আছে, সে-আসন এক তিলও স্থানচ্যুত হয়নি। মাধুরী নিজের মনকেই পরীক্ষা করে বুঝতে পেরেছিল। কিন্তু মানুষের হৃদয়ে যেন অনেকগুলি জানালা আছে। সূর্যোদয়ের কালে একদিক দিয়ে আলোর বার্তা ছুটে আসে। আবার গোধূলি বেলায় অন্যদিকে বঙ্কিম রশ্মির শান্ত পুলক। এ-জীবনে বাতাসের সাড়া লাগে, কিন্তু একই রূপে নয়। কখনো ঝড়ের রূপে আসে, কখনো বা মৃদু-সঞ্চারে তার আগমন হয়। উভয়কেই ভাল লাগার অবকাশ একই দেহে, একই জীবনে, একই চিত্তের গোপনে নিহিত আছে।

অজয়ের চিন্তার মধ্যে মাধুরীর মনস্তত্ত্বের প্রতিচ্ছবি সকল রূপ রঙ ও

বৈচিত্র্য নিয়ে যেন প্রত্যক্ষ হয়ে ওঠে অজয়। নিজকে অপরাধীর মত মনে হয়। মাধুরীর সম্বন্ধে তার মনের একান্তে এই নিঃশব্দ গবেষণার মধ্যে একটা ইঙ্গিত স্পষ্ট হয়ে ওঠে, অজয় ভয় পায়। লজ্জিত হয়।

পরিতোষের জন্যও অজয় তার মনের ভেতর এমনি একটা করুণাভরা সমবেদনার ভাব দেখতে পায়। কেশব হয়তো আবার ফিরে আসবে, মান্দার গা তাকে আর ছেড়ে দেবে না। মাধুরীও প্রস্তুত, কেশবকে অভ্যর্থনা করে নিতে সে আর কুণ্ঠিত নয়। যার যেখানে অধিকার ছিল, সে সেইখানে তার অধিকার আবার চিনে নেবে। কিন্তু পরিতোষের অধিকারের কোন রেখাচিহ্ন আজ আর নেই। ঘটনার আক্রোশে মাঠের শিশিরের মত রোদের জ্বালায় একেবারে নিশ্চিহ্ন হযে মুছে গেছে। তার জীবনের একটা অধ্যায এত বাস্তব হযে ফুটে উঠেও স্বপনের মত অলীক হযে মিশিয়ে গেল। মাধুরীর দিকে ফিরে তাকাবার মত সাহসও বেচারার মুছে গেছে। কেশবের নামে পরিতোষের মনে আন্তরিক শ্রদ্ধার বিস্মৰ জেগে উঠেছে। শ্রদ্ধার অর্ঘ স্তূপীকৃত হযে উঠেছে। পরিতোষ স্বেচ্ছায় ছোট হযে থাকতে চায।

অজযের ইচ্ছে হয়, কিছুক্ষণের জন্য এই মাধুরী আর পরিতোষ এখানে দাঁড়িযে থাকুক। আর যেন কেউ না থাকে। আজ চরম বিদায়ের এই অদ্ভুত সন্ধিক্ষণে মাধুরীর কাছে ক্ষণিকের জন্য পরিতোষ শ্রদ্ধেয় হয়ে উঠুক।. ক্ষমা চেযে নিক্ মাধুরী। নইলে ওব জীবনের আর শান্তি নেই। নির্বিরোধ প্রতিবাদহীন পরিতোষের শান্ত মুখচ্ছবির স্মৃতি মাধুরীর জীবনের সকল হাসি চাপল্য যত্ন নিষ্ঠা ও প্রেমের বুকে কাঁটা হযে বিঁধে থাকবে।

অজয় ডাকলো—বাসন্তী একবার এই দিকে শুনে যা।

বাসন্তী সরে গিয়ে অজয়ের কাছে দাঁড়ালো। একটু ব্যস্ততার সঙ্গে দু'জনে কথা বলতে বলতে বাগানের বেড়ার ঝাঁপ সরিয়ে ভেতরের দিকে এগিয়ে গেল।

মাধুরী বললো—বাসু আর অজয়দা কেন সরে গেলেন বুঝতে পারছো?

পরিতোষ চমকে উঠে বলে—না, ঠিক বুঝতে পারছি না। অজয়বাবু কি মীরগঞ্জ যাবেন না।

মাধুরী—নিশ্চয় যাবেন। যাকে আজ সবাই মিলে ফিরিয়ে আনতে যাচ্ছে, সে যে সবারই শ্রদ্ধেয়।

পরিতোষ—নিশ্চয়। ভজুর মত মানুষও কেশববাবুকে শ্রদ্ধা করে।

মাধুরী—তুমিও তো কর।

পরিতোষ—হ্যাঁ, এই রকমের একজন মানুষকে দেখতে আমার বড় ইচ্ছে করছে। বিলেতে থাকতেও দেশের খবর শুনে চুপ করে বসে বসে অনেক কথা ভাবতাম। মনে হতো, আমরা সবাই কি রকম যেন হয়ে গেছি। একেবারে ছোট হয়ে যাবার একটা পথকে আমরা সবাই বড় হবার পথ বলে মেনে নিয়েছি। এই সব বড় বড় সার্ভিস, ডিগ্রি, ইংরেজিয়ানা, বাড়ি গাড়ি, বিজনেস্—আমার কাছে সবই কেমন যেন মেকী ও কুৎসিত মনে হয়। আমি পরীক্ষা দিলাম না কেন, জান?

মাধুরী—কেন?

পরিতোষ—অধ্যাপক বললেন, তোমার মত উজ্জ্বল ছাত্র ভারতবর্ষের মত অপদার্থ দেশে গিয়ে কি করবে? তুমি এখানেই থেকে যাও।

মাধুরী হাসছিল— এরই জন্যে তোমার দুঃখ হয়েছে?

পরিতোষ—দুঃখ নয়, সেই মুহূর্তে সব উৎসাহ একেবারে ফাঁকা হয়ে গেল।

মাধুরী—ভালই করেছ।

পরিতোষ—হ্যাঁ, নতুন করে কিছু শেখবার প্রয়োজন বোধ করছি। তাই ভাবছি···।

মাধুরী—কি ?

পরিতোষ—কেশববাবুর সঙ্গে দেখা করেই চলে যাব।

মাধুরীর মন বেদনায় মোচড় দিয়ে উঠলো—চলে যাবে কেন ? কোথায় যাবে ?

পরিতোষ—এখনও স্পষ্ট করে কিছু ভেবে উঠতে পারিনি। কিন্তু কিছু একটা করতেই হবে। অবশ্য আসবো মাঝে মাঝে।

মাধুরী—চলে যাবে কেন ?

পরিতোষ—যেতেই যে হবে।

মাধুরী—মাঝে মাঝে আসবে কেন ?

পরিতোষ মনে মনে অপ্রস্তুত হয়ে রইল। সহসা উত্তর দেবার মত ভাষা খুঁজে পেল না। মাধুরীর প্রশ্নটাও অদ্ভুত। অত্যন্ত কঠিন প্রশ্ন। পরিতোষের অসতর্ক আবেগের একটা প্রমাণ হাতের কাছে পেয়ে যেন খোঁচা দেবার লোভ সামলাতে পারলো না মাধুরী। পরিতোষ অন্য প্রসঙ্গে সরে যাবার জন্য বললো—অজয়বাবুকে এইবার ডাক দেওয়া যাক্।

মাধুরী—আমার কথার উত্তর তো দিলে না ?

পরিতোষ—না, উত্তর দেবার এমন কিছু নেই। এমনই মাঝে মাঝে আসবো। সময় সুযোগ না পেলে আসবো না।

মাধুরী—সে প্রশ্ন করছি না। কেন মাঝে মাঝে আসবে এখানে ?

পরিতোষ—তোমাদের সঙ্গে সম্পর্কটা চিরদিনের মত বাতিল করে দিতে চাইছ ?

মাধুরী—না, তা নয়। কিন্তু কাদের সঙ্গে তোমার সম্পর্ক ?

পরিতোষ—তোমার ও কেশববাবুর সঙ্গে যদি মাঝে মাঝে দু'দিনের জন্য দেখা করে যাই, তাতে আমার উপকারই হবে।

মাধুরী—হাঁ, এস মাঝে মাঝে। কিন্তু কেশববাবুর সঙ্গে দেখা হলেই তোমার উপকার হবে। আমার সঙ্গে দেখা করে উপকার পাবার তো কোন আশা নেই।

পরিতোষ—না, আশা নেই।

মাধুরী এগিয়ে এসে পরিতোষের হাত ধরলো।—তুমি আমায় মাপ করো পারতো।

পরিতোষ বিচলিত হয়ে উঠলো—মাপ করবো কেন মাধুরী ?

মাধুরী—নিজেকে সর্বভাবে অশুচি মনে করছি আমি। আমি অবসর চাই, অবকাশ চাই! তোমরা আমাকে মুক্তি দাও।

পরিতোষ—আমরা ?

মাধুরী—হ্যাঁ, তুমি আর কেশবদা।

পরিতোষ—শুধু আমরা দু'জনেই তোমাকে মুক্তি দিতে পারি না মাধুরী। আমার আর একটা কথা মনে হয়েছে। তোমাকে মুক্ত করে দেবার প্রশ্ন বোধ হয় আর একজনের কাছেও…।

—আর একজন ? কি বলছো পরিতোষ। তুমিই বা এসব খবর…।

দূরে অজয়ের হাতের লণ্ঠন দুলে উঠলো। বাসন্তী ঘরের ভেতর থেকে কতকগুলি কাগজপত্র নিয়ে আসছে, অজয় লণ্ঠন তুলে পথ দেখাচ্ছিল বাসন্তীকে।

পরিতোষ—আমি এর বেশি কিছু বলতে পারবো না।

মাধুরী—বলতেই হবে তোমাকে।

পরিতোষ—তুমি জান, অজয়বাবুর সঙ্গে আমার অনেক আলাপ হয়েছে।

মাধুরী—হাঁ।

পরিতোষ—অজয়বাবুর সঙ্গে নানা কথার প্রসঙ্গে তাঁর সব আন্তরিকতা ও আগ্রহের মধ্যে একটা জিনিসের পরিচয় অস্পষ্ট হলেও আমার কাছে ধরা পড়েছে। আমার মনে হয়, বুঝতে আমার ভুল হয়নি।

মাধুরী—তুমি কিন্তু সবই অস্পষ্ট করে বলছো। আমি কিছুই বুঝতে পারছি না।

পরিতোষ—তুমি জান, কেশববাবু এমন একজন লোক, যাঁকে অনেকেই শ্রদ্ধা করে।

মাধুরী—তা জানি।

পরিতোষ—তেমনি তুমি জান না, তুমি এমন একজন মানুষ, যাকে অনেকেই ভালবাসে।

মাধুরী—অনেকেই ? এর অর্থ ?

পরিতোষ—আর আমাকে বেশি জেরা করো না মাধুরী। আমি হয়তো তোমার ক্ষতি করে দেব, কারণ আমি কিছুই গুছিয়ে বলতে পারছি না।

মাধুরী জোরে একটা নিঃশ্বাস ছাড়লো—সব গুছিয়ে বলা হয়ে গেছে তোমার। বলে তুমি ভালই করলে পরিতোষ। না জানলেই আমার ক্ষতি হতো।

অজয় লণ্ঠন হাতে নিয়ে এগিয়ে আসছিল। বাসন্তীও কিছুদূর এগিয়ে ডাক দিল—মাধুরী এস।

অজয় ও পরিতোষ চলে গেল। অজয়ের হাতের লণ্ঠন দুলতে দুলতে মান্দার গাঁয়ের নিস্তব্ধ রাত্রির ঘন অন্ধকারের মধ্যে ক্রমে ক্ষীণতর হয়ে অদৃশ্য হলো। মাধুরী আর বাসন্তী ঘরের ভেতর এসে বসলো।

আজকের সাড়াহীন রাত্রিটার গায়ে যেন একটা শঙ্কার ছাপ লেগে আছে। হঠাৎ একটা হালকা ঝড় বাগানের গাছের মাথাগুলি কাঁপিয়ে সিরসির করে উঠলো। বাতাসটা যেন নিজের দৌরাত্ম্যে মত্ত হয়ে উঠতে লাগলো। নিঃশব্দ রাত্রির স্থৈর্য ক্রমেই একটা প্রবল আক্ষেপে এলোমেলো ও উচ্ছৃঙ্খল হয়ে উঠলো। আকাশের তারাগুলি ঊর্ধ্বের কালো চাঁদোয়াতে চুমকির মত তখনো ছড়িয়ে আছে। মেঘ নেই। ঝড়ের শব্দটা ক্রমেই কষ্ট হয়ে উঠতে লাগলো। সারা মান্দার গাঁয়ের ওপর দিয়ে কতকগুলি প্রতিহিংসার নিঃশ্বাস যেন এলোপাথাড়ি দৌড়ে বেড়াচ্ছে। হু হু করে এক একবার বাগানের গাছপালার বন্ধন ভেদ করে আকাশের ওপর উঠতে থাকে। মনে হয়, ঐ কালো চাঁদোয়ার চুমকিগুলি এইবার ছিঁড়ে ছড়িয়ে পড়বে চারিদিকে।

মাধুরী একটু ভয়ার্তের মত বললো—এ কি আরম্ভ হলো। ওঁরা এই মাত্র রওনা হলেন, আর এরই মধ্যে···।

বাসন্তী—পথ হাঁটতে বেগ পেতে হবে। এই ঝড়গুলির কোন নিয়মকানুন নেই।

মাধুরী—সেরকম বাধা হলে ফিরে আসবেন নিশ্চয়।

বাসন্তী—অজয়দা ফিরবেন না। ওর আবার এইসবই ভাল লাগে।

মাধুরী চুপ করে রইল। বাসন্তী নিজের মনের আবেগে যেন কাব্যি করে বলে চললো—আমারও বড় ইচ্ছে করে মাধুরী। চুপচাপ একা একা মেঠো-পথের ওপর দিয়ে রাত্রির অন্ধকারে হেঁটে চলেছি। বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে, মেঘ ডাকছে, বৃষ্টি পড়ছে, শন্ শন্ করে ঝড় উড়ে বেড়াচ্ছে চারদিকে, তারই ভেতর একা চলেছি। কোথায় যাচ্ছি, তা'ও জানি না। কিন্তু ফিরবার উপায় নেই। শুধু এগিয়ে চলেছি। এমনি করে যেতে যেতে হঠাৎ পৌঁছে গেলাম নদীর ধারে। নদীর জলে ঢেউ পাগল হয়ে আছড়ে পড়ছে কিনারায়। মাটি ধ্বসে পড়ছে। মাঝে মাঝে দেখতে পাচ্ছি বিদ্যুতের আলোকে—নদীর ওপর বৃষ্টির গুঁড়ো ধোঁয়ার মত ছেয়ে রয়েছে। তারই আড়ালে ঢেউয়ের তোলপাড়ানির শব্দ লক্ষ হাহাকারের মত গড়াচ্ছে ভাঙছে।

মাধুরী—তারপর ?

বাসন্তী—তারপর আর কিছু নয়।

মাধুরী—ঝাঁপিয়ে পড়তে ইচ্ছে করবে না ?

বাসন্তী—না ভাই এত সাহস আমার নেই।

মাধুরী—তা'হলে শুধু দাঁড়িয়ে থেকেই বা কি হবে ?

বাসন্তী—বাস্, ঐ পর্যন্ত, তারপর আর কি করা যায়, তা আর ভেবে উঠতে পারি না।

মাধুরী—এরপর কি ভাবতে ইচ্ছে করে জান ?

বাসন্তী—কি ?

মাধুরী—হঠাৎ দেখতে পাওয়া গেল, একটা নৌকা সেই ঝড়ের সব আক্রমণ সহ্য করে ধীরে ধীরে কিনারার দিকে আসছে।

বাসন্তী—না ভাই, দেখা মাত্র আমি অজ্ঞান হয়ে যাব। ও আমার সহ্য হবে না।

মাধুরী—ধরে নাও, একেবারে খালি নৌকা, কোন মানুষ নেই।

বাসন্তী—তাতেই বা কি লাভ? এ নৌকা ডুবে যাবে, কোন ভরসা হয় না।

মাধুরী—বুঝেছি।

বাসন্তী—কিছু বুঝতে পারনি।

বাসন্তীর প্রতিবাদের সুরের মধ্যে অত্যন্ত প্রচ্ছন্ন একটা বিদ্রূপের আভাস ছিল। কথাটা বলে বাসন্তী নিজেই লজ্জিত ও দুঃখিত হলো। তবু মাধুরীর মুখের দিক তাকিয়ে বাসন্তীর মনে হয়, এই রূঢ়তার আভাসটুকু সত্যি বুঝতে পারেনি মাধুরী।

মাধুরী কিছুক্ষণের জন্য অন্যমনস্ক হয়েছিল। বাইরের শব্দ স্পর্শ রূপ দিগন্তজোড়া অন্ধকারের প্রশ্রয়ে, আকস্মিক ও অকারণ একটা ঝড়ের প্ররোচনায় ক্রমেই ভয়াবহ হয়ে উঠছিল। মরা জোনাকীর কুচি ঝরে পড়ছিল হাজারে হাজারে। ঝড়ের অবিশ্রান্ত উচ্ছ্বাসের মধ্যেও, সকল শব্দের রুদ্র হর ও আক্ষেপের মধ্যে অতি করুণ বিলাপের রেশ মাঝে মাঝে ভেসে আসে। কোন ঘুমকাতুরে নিশ্চিন্ত পাখির বাসা হাওয়ার দাপটে উপড়ে যচ্ছে, তারি অসহায় বেদনা মাঝে মাঝে সমস্ত বাতাসের প্রমত্ততাকে করুণ করে তুলছে। মাধুরীর সত্যি ভয় করছিল।

নানা কারণে আজকের রাতটা অদ্ভুত হয়ে উঠলো। কোন হাসি দিয়ে, কোন অকপট আলাপের আনন্দ দিয়ে কোন কর্তব্যের নিষ্ঠা, সঙ্কল্পের আন্তরিকতা, কোন প্রতিজ্ঞা ও প্রতীক্ষার ধৈর্য দিয়ে এ রাত্রির উচ্ছৃঙ্খলতাকে শান্ত করা সম্ভব নয়। অকারণে সমস্ত সংসারের যত

প্রতিশোধগুলি যেন একটা লগ্নের সুযোগে নাটকীয় হয়ে উঠেছে, সব ঘটনাগুলি যেন আজকের রাত্রির জন্য ধৈর্য ধরে বসেছিল। হঠাৎ বাঁধ ভেঙে সব ঘটনার স্রোত ছুটে এল। এই অন্ধকারের মনে প্লাবন সৃষ্টি করলো, তাই তার রূপ এত ভয়বহ ও এত অস্থির।

—ফিরে আসুক ওরা দু'জনে। অন্যমনস্কভাবেই বাইরের পথের দিকে তাকিয়ে মাধুরী যেন মনে মনে প্রার্থনা করে। কিছুক্ষণের মধ্যেই অন্যমনস্কতা কেটে যায়, মাধুরী চমকে ওঠে। এই অব্যক্ত প্রার্থনাটাকে যেন শুনতে পায়। বাইবেব প্রকৃতির মতই তার মনের রীতিনীতি আকাঙ্ক্ষা ও প্রার্থনাগুলির অকারণত্ব দেখতে পায়। এইমাত্র বাসন্তী বলেছে, শত ঝড় হোক অজয়দা আজ আর ফিরছেন না। বাসন্তীব ধারণা হয়তো পরিতোষ ফিরে আসবে। যদি নেহাৎ পরিতোষ একাই ফিরে আসে তবে এমন কিছু অস্বাভাবিক হবে না। সকল অমর্যাদা ও তুচ্ছতাকে সে সহজে গ্রহণ করবার এক অদ্ভুত শক্তি পেযেছে। আজকে এসেই আজ তাকে চলে যেতে হযেছে। নিশ্চিন্ত হযে দাঁড়াবার মত কোন ঠাঁই সে পাযনি। পাওযার দাবিও সে করেনি। সবদিক দিযে প্রস্তুত হয়েই যেন সে এসেছিল। তার চিরকালের আশ্বাসের ছবি মুছে গেছে, তার ঘুম ভেঙে গেছে, তাই তার স্বপ্নও পর হযে গেছে। বড় বড় শ্রদ্ধা, মহত্ত্ব ও প্রতিজ্ঞার দাবির ভিড়ে তার দাবি ছোট হযে গেছে। সে নিজেই বলে গেল, জীবনে দূরে সরে গিযেও সে মাঝে মাঝে আসবে। পরিতোষকে ভয করবার কিছুই নেই। তার জীবনের বক্তব্যকে সে মুখ খুলেই বলে ফেলেছে। গোপন রেখে কোন বিরোধ বেদনার আবিলতা সৃষ্টি করেনি। পরিতোষের আসা আর যাওয়া, দুই-ই সহজ সরল ও স্বাভাবিক। এর মধ্যে কোন দুশ্চিন্তা করার, কুণ্ঠিত হবার প্রশ্ন নেই।

মাধুরীর জীবনে কোন ইষ্ট বা অনিষ্ট ঘটাবার মত ব্যক্তিত্ব নিয়ে পরিতোষ আর দাঁড়িয়ে নেই।

অথচ কত ভয় হয়েছিল, মাধুরী যখন পরিতোষের গলার স্বর শুনতে পায়। বাসন্তীদের বাড়িতে যে সে আজ এসেছে, তার প্রধান কারণ পরিতোষের সান্নিধ্য এড়িয়ে যাবার জন্যই। কিন্তু কী মিথ্যা আশঙ্কা। সকল সন্নিধ্যের ইতিহাসের মোহ ও আকর্ষণকে নিজের মনের বিচারের জোরেই বাতিল করে দিয়ে সে মুক্ত হয়ে এসেছিল।

কিন্তু পরিতোষ ফিরে আসতে পারে, মাধুরীর অন্যমনস্কতার মধ্যে এই ইচ্ছাটাই স্পষ্ট হয়ে ওঠেনি। ওরা দু'জনেই ফিরে আসুক। এর অর্থ কি ? পরিতোষের ফিরে আসা স্বাভাবিক। কিন্তু অজয়দা ফিরতে পারেন না। বাসন্তীই বলেছে, বরং এইরকম ঝড় বাদলে অন্ধকারে চলতে অজয়দা ভালবাসে। কিন্তু শুধু পরিতোষ নয়, অজয়দাকেও ফিরে আসতে হবে। নইলে, মাধুরীর মনের প্রার্থনা অসার্থক হয়ে যায়। পরিতোষের কথাগুলি মনে পড়ে মাধুরীর। কি অদ্ভুত একটা কাহিনী বলে চলে গেল পরিতোষ। অজয়দা তো কোনদিন, কোন মুহূর্তে, কোন অনুরোধ আদেশ ও ইঙ্গিতে, এমন কোন কাহিনীর তিলমাত্র পরিচয়ও ব্যক্ত করেনি। জীবনের কোন মুখর আকাঙ্ক্ষা কি এত মুখচাপা থাকতে পারে ? যে মাটির অন্তরে অন্তরে স্রোত বয়ে চলেছে, তার তৃণলতার মধ্যেও কি একটুও সবুজের সাড়া না লেগে থাকতে পারে ? এ সম্পূর্ণ অদ্ভুত, অস্বাভাবিক। কিন্তু এই অদ্ভুতের এক মোহকর স্পর্শ যেন অলক্ষ্যে মাধুরীর চিন্তার মধ্যে গিয়ে ঢুকেছে। মাত্র দু'টি কথার মধ্যে যে কাহিনীকে শোনা হলো, তাকে যে ভেবে ভেবে কুল পাওয়া যায় না। কোথায় তার সীমা ? তার আরম্ভ ? কোন্ মন্ত্রে, ঘটনায়

বা আবেগে এর উদ্ভব ও স্থিতি ? বিনা কারণেই কি এই রহস্য সম্ভব ? হয়তো সম্ভব, নইলে রহস্য বলা হয় কেন ?

আকাশ-পাতাল, এলোমেলো চিন্তা করে মাধুরী। অজয়দাকে আজ সে একবার ফিরিয়ে আনতে চায়। অদৃষ্টটা এভাবে মাঝপথে ফেলে রেখে চলে যাওয়ার কোন অর্থ হয় না। জীবনে যদি প্রশ্ন ঘনিয়ে ওঠে, তবে বোঝাপড়া হয়ে যাওয়াই ভাল। জীবনের এই পরম আশ্চর্যকে একবার বিচার করে বুঝতে চায় মাধুরী। কোথায়, কবে, কোন্ সূত্রে, কোন্ আলোকের দৃষ্টিতে অজয়দার চোখে ভাল লেগে গেল সে ?

মাধুরী হঠাৎ লজ্জিত হয়ে নিজের চিন্তাকে সংযত করে। এত আগ্রহ কেন ? পৃথিবীতে কত কি অকারণ ঘটছে, কিন্তু তার জন্য এত মাথা ঘামাবার প্রয়োজন তার কখনো হয়নি। অজয়দার মনের অলক্ষ্য পরিণাম ও ইতিহাসকে এই অকারণ সাধারণের মতই নিতান্ত নগণ্য বলে উপেক্ষা করতে পারছে না কেন সে ?

নিজেকে হঠাৎ কেন অশুচি মনে হয়েছিল, এতক্ষণে তার কারণ বুঝতে পারে মাধুরী। তার নিজেরই মনুষ্যত্ব তাকে ধিক্কার দিয়ে উঠছে। জীবনে কোথা থেকে এই ভ্রান্তির নেশা তার সকল বিচার-বুদ্ধিকে গ্রাস করে বসলো ? ভুলের আর শেষ নেই। প্রথম ভুলের আঘাত যেন দ্বিতীয় একটা ভুলের জন্য মাধুরীর অন্তঃকরণ মাতিয়ে তোলে। জীবনের প্রথম প্রতিজ্ঞাকে যে অবহেলা করেছে, অশ্রদ্ধা করেছে, ফাঁকি দেবার চেষ্টা করেছে—তার সমগ্র মনুষ্যত্বটাই আর নির্ভর করার মত নয়। প্রতি ভুলের জন্য সে ক্ষুব্ধ হবে। যেখান থেকে, যার কাছ থেকেই আহ্বান আসুক্—এক কপট সমাদরের অভিনয়।

ক'রে তাকে সে গ্রহণ করে। গ্রহণ করে শুধু আবার অকারণে প্রত্যাখ্যান করার জন্য। মাধুরী উপলব্ধি করে, এইখানে তার জীবনের সকল অভিশাপের রহস্য লুকিয়ে আছে। তার স্থিতিহীন সত্তা শুধু সখের পিপাসায় অস্থির হয়ে ছুটে চলছে। প্রতি মেঘের ছায়ার দিকে তাকিয়ে থাকে। যেখান থেকেই ডাক আসুক, সাড়া দিতেই হবে। এ কী ভয়ানক দুর্বলতা। কোথা থেকে এই বিচিত্র শিক্ষা তার সব ভুল করিয়ে দিল?

তবু আশ্চর্য লাগে অজয়দাকে? অজয়দা তো অবুঝ অসহায় ও দুর্বল মানুষ নয়। ভাল মন্দ বেছে চলবার, জীবনের প্রগল্‌ভতাকে শাসনে কঠিন করে বাঁধবার, উচিত অনুচিত ঠাহর করবার সব রীতিনীতি ও শিক্ষা তার জানা আছে। তবু তার ভুল হয় কেন? অনধিকার ও অপ্রাপ্য হয়ে রয়েছে যে ঠাঁই, তারই আলো-ছায়ার পুলকের মধ্যে নিজেকে বিকিয়ে দিতে তার বাধে না কেন?

তা অজয়দা আর একবার প্রকাণ্ড ভুল করে ফিরে আসুক। মাধুরীর কাছে অন্ততঃ একটা প্রশ্ন শুনে যাক্। অজয়দা জানুক, মাধুরী সব জানতে পেরেছে।

বাগানের পথ ধরে একটা কদাকার মূর্তি কাশতে কাশতে উঠোনের ওপর এসে দাঁড়ালো। মাধুরী ও বাসন্তী ভয় পেয়ে কপাট বন্ধ করার আগেই মূর্তিটা ভাঙা গলায় ডাকলো—অজয়দাদা আছেন?

বাসন্তী প্রত্যুত্তর দিল—তুমি কে?

—আমি ভজু।

না, আর ভয় করবার কিছু নেই। ভজু এ গ্রামের কারও অপরিচিত নয়। ভজু এ গ্রামের শত্রু নয়। ভজু এই গ্রামেরই পোষা বিষধর।

গ্রামের লোককে সে কামড়ায় না ভিন্ গাঁয়ের গেরস্তের ঘটিবাটি চুরি করে, ভিন্ গাঁয়ের লোকের মাথা ফাটিয়ে রাহাজানি করে ওর জীবন কেটে যায়। নিজের গাঁয়ে ভজু শুধু দীনতম সেবক। মাটি কাটে, বেড়া বাঁধে, এঁটো খায়, মজুরী পায় না। যেখানে ভয় আছে, মৃত্যু আছে, সেইখানে ভজু সবারই সহায়, সবারই প্রতিনিধি।

বাসন্তী বলে—এত রাত্রে কি মনে করে ভজু? তোমার নাকি খুব অসুখ করেছে?

ভজু—হাঁ দিদিমণি। অসুখ করেছিল বহুদিন আগেই, এইবার অসুখটা সেরে আসবে। বেশ বোধ করছি দিদিমণি, এইবার সেরে আসবে।

বাসন্তী—আজ খেয়েছ?

ভজু—না দিদিমণি।

বাসন্তী—খাবে?

ভজু—না, আমার সময় নেই। এখুনি কাজে বের হতে হবে।

বাসন্তী—এই অসুখ শরীরে, না খেয়েদেয়ে, এখন আবার কোন্ কাজে বের হবে?

ভজু—সেই কাজের কথাটাই অজয়দাদাকে জানাতে এসেছিলাম। তিনি ঘরে নাই বোধ হয়।

বাসন্তী—না, মীরগঞ্জ গিয়েছেন।

ভজু—বাস্ ভালই হলো। কেউ আর সাক্ষী রইলেন না।

বাসন্তী—কিসের সাক্ষী ভজু।

ভজু—আজ একটা বড় কাজের ভার নিয়ে আগাম টাকা পেয়েছি। সেই খবরটা অজয়দাদাকে জানিয়ে আমি কাজে বের হব ভেবেছিলাম।

ভজুর কথাগুলি দুর্বোধ্য। নেশাখোর মানুষের কথায় [illegible] বোধ হয় এই। বাসন্তী তাই শুধু কয়েকটা কথার কথা বলে, গোঁয়ার ভজুকে দুটো মুড়ি খাইয়ে বিদায় করে দিতে চায়। ভজুর কথার মধ্যে যে ঘোরতর অর্থ লুকিয়ে আছে, বাসন্তীর মনে সেরকম কোন সন্দেহ হয়নি।

মাধুরীর দিকে তাকিয়ে ভজু বললে—ইনি কে বটে? ইনিই তো সঞ্জীব চাটুয্যার মেয়ে? স্বদেশী করছেন যিনি?

বাসন্তী হাসছিল। কিন্তু মাধুরী বিরক্ত হয়ে উঠছিল। এই অশোভন গ্রাম্য রূঢ়তা, এই ভাষা আর এই চেহারা, এই ধরণের জীবের জীবন—এসবের পরিচয় সে ভুলে গেছে অনেকদিন। মাধুরীর স্মৃতিতে যদি মান্দারগাঁ আজও বেঁচে থাকে, তবু তার মধ্যে এই কুৎসিতের কোন চিহ্ন নেই। সেখানে শুধু মান্দার গাঁয়ের শিউলীতলা, দীঘির জলের ঢেউ আর ভোরে পাখীর গানের শব্দই শুধু বড় হয়ে আছে। বাসন্তীর মত মান্দার গাঁয়ের পাঁক পোকামাকড়গুলিকেও আপন বলে ভাবতে সে পারে না। ভজুর মত পাপীর কর্কশ কথাগুলির মধ্যে হাসবার মত এমন কিছু মজার বিষয় নেই।

বাসন্তী বললো—ভজু তুমি কিছু খেয়ে নাও।

ভজু—না, কাজ আছে দিদিমণি। দেরি করলে চলবে না।

বাসন্তী—তা'হলে যাও।

ভজু—হ্যাঁ যাচ্ছি, কিন্তু যাবার আগে আপনাকে সাক্ষী মেনে যাচ্ছি আগুন লাগাতে চললাম।

বাসন্তী ভয়ে শিউরে উঠলো—কোথায় আগুন লাগাতে চললে ভজু? ছি ছি, এত অসুখে ভুগছো, মরতে বসেছ, তবু তুমি বদভ্যাস ছাড়লে না।

ভজু—আপনি ত' জানেন দিদিমণি, আমি শুধু অর্ডার খাটি, যে টাকা দিবে তারই অর্ডার খাটবো।

বাসন্তী—কে অর্ডার দিয়েছে ?

মাধুরীর দিকে একবার সশ্রদ্ধভাবে তাকিয়ে নিয়ে ভজু বললে—অর্ডার দিয়েছেন, এই দিদিমণির পিতাঠাকুর সঞ্জীব চাটুয্যা, আর দিনমণি বিশ্বেস আর বোর্ডের প্রেসিডেন্ট।

বাসন্তী—কি করতে হবে ?

ভজু—পনর টাকা নিয়েছি, আজ রাতের মধ্যে কেশব ঠাকুরের ঘরে আগুন লাগিয়ে দিতে হবে।

মাধুবী স্তব্ধ হয়ে তাকিয়ে রইল। মূর্ছা যাবার লক্ষণ। বাসন্তী কিছুক্ষণ হতভম্ব হয়ে থাকে, তারপর ধীরে ধীরে চোখের দৃষ্টিটা কঠোর হয়ে ওঠে। দুষ্কৃত ও পাপের গর্বেই ভজুর রোগজীর্ণ কঙ্কালসার মূর্তিটার মধ্যে একটা সজীবতার আনন্দ ছড়িয়ে রয়েছে, নির্বিকার নিষ্ঠুরতা আর অমানুষিকতার প্রেরণাতেই আত্মহারা হয়ে আছে ভজু।

বাসন্তী কঠোরভাবে বলে—তুমি কি ভেবেছ ভজু, অজয়দা থাকলে সে চুপ করে শুধু তোমার কথা শুনতো ? তোমার হাত দুটো অজয়দা ভেঙে দিত না ?

ভজু কেসে কেসে হাসলো—হাত ভেঙে দিলেনই তো কি করলেন। দাঁতে করে আগুন লাগাতে পারি।

বাসন্তী—বেশি বাজে কথা বলো না ভজু। আজ যদি কারও কথায় কোন কুকাজ করেছ, তবে তোমার রক্ষে নেই জেনে নিও।

ভজু তবুও হাসছিল—যাক্, আপনি দিদিমণি তবু দুটো ধমক দিলেন, কিন্তু উনি কিছু বলতে পারছেন নাই কেন ?

ভজুর দিকে চকিতে একবার তাকিয়ে মাধুরীর গা শিউরে উঠলো ; কী ভয়ানক নিষ্ঠুর আর বীভৎস মূর্তি।

ভজু আবার বলে—অজয়দাদা তো শুধু আমারই হাত দু'খানা ভেঙে দিতে পারেন, কিন্তু আরো যে তিন জোড়া হাতের নাম করলাম, উহাদের ভাঙতে পারেন কি ?

মাধুরী অস্বস্তিতে ছট্‌ফট করে ওঠে—ওকে চলে যেতে বলে দাও বাসু।

বাসন্তী—তুমি বোকার মত কথা বলছো কেন মাধুরী ? ওকে এখন আটক করে রাখাই আমাদের কাজ। ওকে যেতে দিলে আজ ভয়ানক সর্বনাশ ঘটাবে।

ভজু—আমি আজ কোন মতেই আটক থাকবো না দিদিমণি, আগাম টাকা নিয়েছি, আমাকে কাজ করতেই হবে।

বাসন্তী—তুমি যদি এখান থেকে এক পা নড়েছ, আমিও তোমার সঙ্গে সঙ্গে যাব। সবাইকে ডেকে তোমায় ধরিয়ে দেব।

ভজু—তবে দিন চাবটে মুড়ি, খেয়ে নি। কাজটা সারতে আর দিলেন নাই আপনি।

মুড়ি খেয়ে ভজু চলে গেল। যাবার সময় মাধুরীকে উদ্দেশ্য করে বলে গেল—অপনি আজ এইখানে থেকে ভালই করেছেন দিদিমণি, আজকের রাতটা ভাল নয়।

মাধুরী অনেকক্ষণ পরে হাঁপ ছেড়ে কথা বলে—অজয়দাদের আজকে না যেতে দিলেই হতো।

বাসন্তী চুপ করে থাকে। মাধুরী অনেকক্ষণ পরে আবার কথা বলে —আমার শুধু সারদা জেঠিমার কথা মনে পড়ছে বাসু। বড় ভয় করছে, বুড়ো মানুষ, একা একা রয়েছেন।

বাসন্তী—সারদা জেঠিমার কথা তোমার মনে আছে ?

মাধুরী—আমায় ঠাট্টা করছো ?

বাসন্তী—আমিও এখন তাঁর কথাই ভাবছিলাম।

মাধুরী—যদি কিছু অঘটন ঘটেই যায় কি উপায় হবে বাসু ?

বাসন্তী—কিসের অঘটন ?

মাধুরী—ঐ ভজু যদি সত্যিই ওঁর বাড়িতে আগুন লাগিয়ে দেয় ?

বাসন্তী—ভজু তো বলে গেল, এ কাজ সে করবে না, তবে কেন ভয় করছো ?

মাধুরী—চোর গুণ্ডাদের কি বিশ্বাস করা যায় বাসু !

বাসন্তীর চোখ দুটো তীব্রভাবে জ্বলে উঠলো—কে চোর গুণ্ডা মাধুরী ?

বাসন্তীর গলার স্বরের তীব্র শ্লেষ মাধুরীর মনের ভেতর জ্বালা সৃষ্টি করে ; বাসন্তীর উদ্ধত দৃষ্টি, মাধুরীর সর্বাঙ্গে কাঁটার মত বিঁধতে থাকে। বাসন্তীর প্রশ্নের ভাষা অর্থ আর ইঙ্গিত মাধুরীর শিক্ষা রুচি ও বিত্ত দিয়ে গড়া শহুরে মর্যাদার মাথায় যেন চরম অপমান বর্ষণ করে।

মাধুরী উঠে দাঁড়ায়। বাসন্তীর উত্তেজিত প্রশ্নের অহঙ্কারকে ঠেলে দিয়ে সে এখুনি চলে যেতে চায়। গর্বিতা বাসন্তীর কোন করুণার প্রশ্রয় সে চায় না। মান্দার গাঁয়ের এত নিরাভরণ জীবনেও যে এত অহঙ্কার লুকিয়েছিল, মাধুরী তা ভাবতে পারে না। কী রূঢ় এই গর্ব !

মাধুরী বলে—ভজুর কথাগুলি বিশ্বাস করতে তোমার বেশ ভাল লাগছে বাসু ?

বাসন্তী—তুমি যে আমাকেও ভজুর দলে টেনে আনছো ?

মাধুরী—কিন্তু তুমি ভজুর কথা বিশ্বাস করেছ নিশ্চয়।

বাসন্তী—হ্যাঁ, তুমি বিশ্বাস করনি ?

মাধুরী—না। আমার বাবা ভজুকে টাকা দিয়ে এসব কুকাজ করাবে, এমন অসম্ভব কথা আমায় বিশ্বাস করতে বলো না।

বাসন্তী—যাক্, এসব কথা আলোচনা না করাই ভাল।

মাধুরী—আমি চল্‌লাম।

বাসন্তী—এই ঝড়ের মধ্যে, এমন অসময়ে, এমন রাগ করে চলে যেতে নেই মাধুরী।

মাধুরী—রাগ করছি না বাসু, নিজের অবস্থাটা বুঝতে পেরেছি। আমি নিজেকে কখনো খুব বড় করে ভাবিনি, খুব বেশি গর্ব আমার ছিল না, কিন্তু তোমাদের মতে আমাকে যতখানি ছোট মনে করা উচিত, নিজেকে ততখানি ছোট বলে ভাবতে পারছি না।

বাসন্তী—বড় ভুল করছো মাধুরী। তোমাকে ছোট করে ভাববার আমার সাধ্যি কি ? তুমিই আমাদের অহঙ্কার মাধুরী। তুমিই তো সব দিক দিয়ে জিতে যাচ্ছ। তোমাকে কোথাও হার মানতে হবনি। আমাকে তুলনা করে লজ্জা দিও না মাধুরী। আমি তোমাদের গাঁয়ের পাতাকুটোর মতন। একটি ফুঁ দিলেই সবে যাব। বিধাতাকে আর অদৃষ্টকে এইভাবে মানতে শিখেছি আমি। কিন্তু তুমি তো তা নও। মান্দার গাঁ হোক্, মীরগঞ্জ সদর হোক্, বা বিলেত হোক্—পৃথিবীর কোন স্থানের কোন গর্ব তোমাকে ছোট করতে পারেনি।

মাধুরীর মুখের ভাব শান্ত হয়ে এল। বাইরে ঝড়ের দাপাদাপিও অনেকটা শান্ত হয়েছে।

মাধুরী কুণ্ঠিতভাবে বলে—কিন্তু ভজুর কথা আমার বিশ্বাস করতে ইচ্ছে করছে না বাসন্তী।

বাসন্তী—বেশ তো, বিশ্বাস করো না। ভজুর কথায় কি আসে যায় ?

মাধুরী—কিন্তু যদি সত্যি হয় ?

বাসন্তী—তা'হলেই বা কি আসে যায়। মানুষ ভুল বুঝেই ভুল কাজ করে। ভুল ভাঙার দিনও আসে, তখন সব ঠিক হয়ে যায়।

মাধুরী—কথাটা ঠিক বললে না বাসু। যেদিন ভুল ভাঙে, সেদিন আর কিছু করার থাকে না। যা ক্ষতি হবার হয়েই যায়, তার পূরণ আর হয় না।

ঝড় থেমে আসছিল, কিন্তু ক্লান্ত ঝড়ের মৃদু বিলাপের শব্দ ছাপিয়ে সারা গা জুড়ে শতকণ্ঠের চীৎকার চারদিকে দৌড়াদৌড়ি করে বেড়াচ্ছিল। পূব-পশ্চিমে উত্তর-দক্ষিণে—সব দিকেই ব্যস্ত ক্ষুব্ধ ও বিব্রত জনতার আর্তরোল শুনতে পাওয়া যাচ্ছে। মাধুরী আর বাসন্তী বারান্দায় এসে সেই চীৎকারের ঝড়ো ভাষা বুঝবার জন্য উৎকর্ণ হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। মাঝে মাঝে দেখা যায়, লণ্ঠন নিয়ে এদিক ওদিক থেকে লোকজন ছুটাছুটি করছে। হঠাৎ এই চাঞ্চল্যের কি কারণ কিছুই বোধগম্য হয় না। ডাকাত, দাঙ্গা, বাঘ—সবই হতে পারে।

ঘণ্টার পর ঘণ্টা আশঙ্কা ও উৎকণ্ঠায় দু'জনে বারান্দায় দাঁড়িয়ে রইল। কিছুক্ষণ পরে দেখা গেল, জনকয়েক লোক আলো হাতে নিয়ে বাসন্তীদের বাড়ির বাগানে এসে ঢুকলো। আশঙ্কায় বাসন্তীর বুকে দুরু দুরু আরম্ভ হয়। মাধুরী ঘরের ভেতর গিয়ে শুয়ে পড়ে।

একটু এগিয়ে এসেই আগন্তুকদের মধ্যে একজন জোরে চেঁচিয়ে হাঁক দেয়—অজয় আছিস্ নাকি রে।

তারপরেই আবার প্রশ্ন হয়—বাসু ঘুমিয়েছিস্ ?

মেজকাকার কণ্ঠস্বর। আজ বোধ হয় পাঁচ বছর পরে মেজকাকা

বাসন্তীদের বাড়িতে পা দিলেন। পাঁচ বছর পরে কথা বললেন। পাঁচ বছর ধরে অজয়দের একটা পুকুরের সরিকী স্বত্ব নিয়ে এক দুর্মর মামলা মেজকাকাকে এ বাড়ির সীমা থেকে দূরে সরিয়ে রেখেছে। কথাবার্তা আলাপ মেলামেশা—সবকিছু মুছে গিয়ে দু'বাড়ির মধ্যে এক দুর্লঙ্ঘ্য ব্যবধান তৈরি করে রেখেছে। একই পুরুষের শোণিতের ধারা আজও দুই পরিবারের ধমনীতে অবিকার আছে, কিন্তু তার প্রবাহ যেন ভিন্নমুখী হয়ে গেছে। তার কারণ, ঐ একখানি পুকুরের সরিকী স্বত্ব। ঐ মামলা।

তবু মেজকাকা আজ এসেছেন। বাসন্তী উত্তর দিল—কি ব্যাপার কাকা? কিসের গোলমাল হচ্ছে? আমার যে ভয়ে ঘুম আসছে না।

মেজকাকা অজয় বাড়িতে নেই বুঝি?

বাসন্তী—না।

মেজকাকা—তবুও কোন ভয় করিস নি। আমরা সবাই পাশেই জেগে রয়েছি। কোন ভয় নেই।

বাসন্তী—কি হয়েছে?

মেজকাকা—কারা জানি ঘরে ঘরে আগুন লাগিয়ে দিচ্ছে। কিছুই বুঝতে পারা যাচ্ছে না।

বাসন্তী—কোথায় আগুন লাগলো?

মেজকাকা—স্কুল বাড়িটা পুড়ে ছাই হয়ে গেছে, ইউনিয়ন বোর্ড অফিসটা পুড়ে গেছে, আর সঞ্জীব চাটুয্যের বাড়ি।

ঘরের ভেতর বিছানার ওপর মাধুরী উঠে বসলো। মেজকাকা তখনো বাসন্তীকে সমস্ত ঘটনার বিবরণ সংক্ষেপে শোনাচ্ছিলেন—সঞ্জীব চাটুয্যের বাড়িটা এখনো একেবারে পুড়ে শেষ হয়নি। লোকজন সবাই গিয়ে

এখনো আগুন নেবাচ্ছে। বাড়িতে কেউ ছিল কি না জানা যাচ্ছে না। আমি শুনেছিলাম, সঞ্জীব চাটুয্যের মেয়েটি আজকাল বাড়িতেই থাকে। যদি সে সত্যিই থেকে থাকে, তা'হলে, ভগবান্ ভগবান্!...

মেজকাকা ঘটনাটাকে আর অল্পনা করতে পারলেন না। গলার স্বর শিউরে উঠলো।

বাসন্তী—আর কোথাও আগুন লেগেছে, শুনেছেন কিছু?

মেজকাকা—না, আর কোথাও কিছু হয়নি। আমি চারদিক টহল দিয়ে এলাম। চারদিকে ভলান্টিয়ার বসিয়ে দিয়ে এসেছি, পাহারা দেবার জন্য।

বাসন্তী—কেশবদার বাড়িতে একা জেঠিমা রয়েছেন।

মেজকাকা—হ্যাঁ, সেখানে ঘুরে এসেছি, দু'জনকে পাহারা রেখে এসেছি। শুধু একটি কথা ভাবতে আমার বুক কেঁপে উঠছে বাসন্তী। সঞ্জীববাবুর মেয়েটি যদি ঘরের ভেতর থেকে থাকে, তা'হলে ভয়ানক সর্বনাশ হয়ে গেছে বুঝতে হবে ভগবান ভগবান।

বাসন্তী চুপ করে দাঁড়িয়েছিল। মেজকাকা বললেন—তুই নিশ্চিন্ত হয়ে ঘুমো গে বাসু। আমরা ঘুরে ঘুরে সারা রাত পাহারা দেব, কোন ভয় নেই।

মাধুরী বিছানার ওপর চুপ করে বসেছিল। আজ আর ঘুমোবার ভরসা নেই। বাকী রাতটুকু জেগে জেগেই ভোর করে দেওয়া ভাল। ঘুমোবার ইচ্ছেও নেই মাধুরীর। জেগে থেকে তবু ঘটনাগুলিকে চোখে চোখে রাখতে পারা যায়। একটু আগুনের জ্বালা লাগে, অপমান সইতে হয়, কিন্তু তার বেশি কিছু নয়। ঘুমিয়ে পড়লে কোন্ দুঃস্বপ্ন এসে শান্তি নষ্ট করবে কে জানে।

বাসন্তী এসে বললো—সব শুনলে তো মাধুরী ? মেজকাকার কথাগুলি নিশ্চয় শুনতে পেয়েছ ?

মাধুরী—হঁ্যা।

অনেকক্ষণ চুপ করে থেকে মাধুরী বলে—আমার একটা আপশোষ হচ্ছে।

বাসন্তী—কি ?

মাধুরী—যদি আজ তোমাদের এখানে না আসতাম ?

বাসন্তী—তাতে কি লাভ হতো ? কি ক্ষতি তোমার হয়েছে ?

মাধুরী—আজ তা'হলে একটা গতি হযে যেত।

বাসন্তী—গতি কিছুই হতো না, একটা দুর্গতি হতো।

মাধুরী—যাই বল, সব ল্যাটা চুকে যেত।

বাসন্তী—কিছুই চুকে যেত না। অনেক ল্যাটা সৃষ্টি করতে।

মাধুরী—তর্ক করতে চাই না বাসন্তী, শুধু মনে হচ্ছে যদি আজ বাড়িতে থাকতাম, তবে আজকের রাত্রিটা জীবনের শেষ রাত্রি হয়ে যেত। বেশ ভাল রকম নিশ্চিন্ত হযে যেতে পারতাম।

বাসন্তী—কিছুই হতো না, কিছুই করতে পারতে না। এটা তোমার একটা সখ, এই মাত্র বলতে পার।

মাধুরী—তুমি আমাকে এত দুর্বল ভাব কেন বাসন্তী ?

বাসন্তী—তুমি মোটেই দুর্বল নও। দুর্গতি থেকে নিজেকে সরিয়ে নিযে যেতে, সবে পড়তে তুমি পার। সে শক্তি তোমার আছে।

মাধুরী—না, সে শক্তি আমার নেই। এখনো একটা উপায় আছে বাসন্তী।

বাসন্তী—বল।

মাধুরী তুমি যদি লোকের কাছে প্রকাশ না করে দাও তবে বলি।

বাসন্তী—বলে ফেল।

মাধুরী—লোকে জানুক, সত্যিই আমি পুড়ে মরে গেছি, ছাই হয়ে গেছি।

বাসন্তী—তারপর ?

মাধুরী—তারপর একদিকে চলে যাই। সবাই রইল, শুধু আমি থাকবো না। না মরেও এই রকম একটা মুক্তি আমায় পেতে দাও।

বাসন্তী—তাতে তোমার লাভ ?

মাধুরী—আমার লাভ, আমি বেঁচে গেলাম।

বাসন্তী—কিসের থেকে বাচবে ? কিসে তোমায় এত মর মর করেছে যে বাঁচতে চাইছ ?

মাধুরী—আমি ব্যর্থ হয়ে গেছি। কারও কাছে কথা বলার অধিকার আমার নেই। আমার জীবনের চারদিকে শুধু কতগুলি প্রশ্ন ভিড় করে রয়েছে, কিন্তু উত্তর দেবার মত শক্তি আমার নেই। হয় সবার কাছে হার মানতে হবে, নয় সরে যেতে হবে, এ ছাড়া আমার পথ নেই।

বাসন্তী—সবার কাছে হার মানবে কেন ?

মাধুরী—সবারই দাবি, সবারই প্রশ্ন, সবারই উপদেশ, শাসন -এত দাবি মেটাবার, এত প্রশ্নের উত্তর দেবার কৌশল আমি জানি না।

বাসন্তী—সবাই তোমার কি করলো মাধুরী। সবার কাছে তুমি কি অপরাধ করেছ ? আমি তো জানি শুধু…।

মাধুরী—তুমি আবার কি জানতে পেলে ?

বাসন্তী—না, আমি কিছু জানি না। বাসন্তী যেন বিরক্ত হয়েই উত্তর দিয়ে একেবারে চুপ করে থাকে। নিস্তব্ধতার মধ্যে রাত্রির ভয়াবহতা

ও বেদনা ধীরে ধীরে আরও ভারী হযে উঠতে থাকে। বাসন্তী ও মাধুরীর নিঃশব্দ চিন্তার পরমাণুগুলি গভীর বিষণ্ণতায বাইরের অন্ধকারের সঙ্গে একাকার হযে যেন মিশে যায। এই দুই চিন্তার মধ্যে কোন মিল নেই। মাধুরীর মনে যেন দুর্যোগের নেশা ধরেছে। এই রাত্রির ঝড় অন্ধকার আর অগ্নিজ্বালার অভিশাপটুকু চিরস্থাযী করে রেখে সে শুধু সরে পড়ার সখের স্বপ্ন দেখে। এ এক অদ্ভুত নেশা। জীবনে কাউকে সুখী করতে পারলো না, কারও প্রশ্নের উত্তর দিতে পারলো না, কারও দাবি মেটাতে পারলো না—এই আনন্দেই ডুব দিযে তলিযে থাকতে চায় মাধুরী।

বাসন্তীব মনে শত বিষণ্ণতার মধ্যেও কোন জ্বালা নেই। এই কাল-রাত্রি অচিরে ভোর হয়ে যাক্। আবার সূর্য উঠুক্। সবাই ফিরে আসুক। সবাই ফিবে আসার পর, সবারই সঙ্গে কথা বলে, সবারই মুখেব দিকে শেষবাবেব মত সব আগ্রহ দিযে তাকিযে, তারপর সে বিদায নেবে আর বেশি দেবি নেই। দিন ঘনিযে আসছে। এ জীবনকে ফাঁকি দিযে আড়ালে সবে পড়তে চায না বাসন্তী। সবারই আশীর্বাদ নিয়ে, এ জীবনেব দুযারে মাথা ঠেকিযে, সবার হাসিমুখ আর নিজের চোখের জল নিযে অন্য ঘবে চলে যাবে। কেউ যেন এতটুকু ব্যথা না পায়, কেউ যেন ক্ষুব্ধ না হয।

মাধুরী বললো— আমি সত্যি চলে যেতে চাই বাসু। যাবার আগে একবার বাবার সঙ্গে যদি দেখা হতো··।

বাসন্তী—দেখা হলে কি করতে?

মাধুরী—বল্‌তাম, তুমি কেশবদার কাছে ক্ষমা চেয়ো!

বাসন্তী—আব কাবও কাছে কিছু বলার নেই?

মাধুরী—হ্যাঁ, কেশবদার কাছে একটা কথা বলার ছিল।

বাসন্তী—আর ?

মাধুরী—পরিতোষ বাবুর কাছে আর কিছু বলবার নেই।

বাসন্তী—বেশ, আর কারও কাছে ?

মাধুরী—না।

মাধুরী গম্ভীর হয়ে বসে থাকে। বাসন্তীর মনে হয়, মাধুরীর মুখটা নিশ্চয় কুৎসিত ও নির্লজ্জের মত দেখাচ্ছে। ভাগ্যিস্ ঘরে অন্ধকার। নইলে, ঐ মুখের দিকে তাকিয়ে ঘৃণায় বাসন্তীর গা শির্ শির্ করতো। জীবনের ওপর কোন শ্রদ্ধা নেই, জীবনের কোন প্রতিজ্ঞা অনুরাগ ও কামনার ওপর কোন নিষ্ঠা নেই, শুধু মন নিয়ে একটা প্রগল্ভ বিলাসিতা। লেখাপড়া শিখে, শহরে বসে সখের স্বদেশী ক'রে, এই হৃদয়হীনতাটুকু লাভ করেছে মাধুরী। ওর জবাবদিহির শেষ নেই। নিজেকে বঞ্চনা করেই ওর আনন্দ। জীবন ধরে এই বঞ্চনার তালিকা শুধু বাড়িয়ে এসেছে মাধুরী। কারও কাছে ওর পাওয়ার মত কিছু নেই। তাই সবাইকে অবাধে আহ্বান করে, সবাই অবাধে প্রত্যাখ্যান করে।

মনের সংশয়গুলিকে আজ আর চেপে রাখতে পারে না বাসন্তী। দু'দিন আগে থেকে ভাব্বার কোন কারণ ছিল না, যা ভয় করার কোন হেতু ছিল না, আজ সেই আশঙ্কা সত্য বলে মনে হয়। মাধুরীর নিঃশ্বাসে অকল্যাণ, মাধুরীর দৃষ্টিতে বিষ আছে। এই মেয়েরই মহিমায় সঞ্জীববাবুর ঘর পুড়েছে।

বাসন্তীর চিন্তাগুলি ক্রমেই উত্তেজিত হয়ে ওঠে। মাধুরীকে ক্ষমা করার কোন সঙ্গত কারণ খুঁজে পায় না। কিন্তু এর পরেও, যদি মাধুরী নিজেকে না সাম্লায়, যদি নিজের ভুল বুঝে সংযত না হয়, যদি একতিলও

প্রায়শ্চিত্তবোধ না জাগে, তবে ওর বিদায় নেওয়াই উচিত। নইলে, আরও অনেকের ক্ষতি করবে মাধুরী। এইবার যার ক্ষতি করতে চলেছে মাধুরী, সে অন্য কেউ নয়। অন্য কেউ হলে বাসন্তী এত ক্ষুব্ধ ও উত্যক্ত হতো না। মাধুরীকে এত কঠোর ভাবে ঘৃণা করতে পারতো না।

মাধুরী শান্তভাবেই প্রশ্ন করে—অজয়দা কবে ফিরবেন কিছু বলে গেছেন ?

বাসন্তীর গলা ঠেলে ধিক্কার ছুটে আসতে চায়। হ্যাঁ, সেই আশঙ্কাই সত্যি। মাধুরীর শুচি-অশুচি বোধ হয় লুপ্ত হয়ে গেছে। ওকে ক্ষমা করা যায় না। ওর জীবনে শাস্তি চাই-ই চাই। নইলে ওর ভ্রান্তি ঘুচবে না। নইলে নিজের জীবনকে কতগুলি মিথ্যা মায়ার রঙ দিয়ে এক নিদারুণ প্রহেলিকা তৈরি করে রাখবে। এক এক করে সবারই চলার পথে দাঁড়িয়ে, সবারই দিক্‌ভুল করিয়ে দেবে মাধুরী।

বাসন্তী বললো—অজয়দা একা ফিরে আসবেন। কেশবদাও আসবেন। পবিতোষ বাবুও আবার আসবেন। সবাই একবার শেষবারের মত আসবেন, তারপর চলে যাবেন।

মাধুরী—সবাই আসবেন ?

বাসন্তী—হ্যাঁ।

মাধুরী—কেন ?

বাসন্তী—আমাকে বিদায় দেবার জন্য। যতদিন না আমি বিদায় নিচ্ছি, সে ক'টা দিন তাঁরা গ্রামেই থাকবেন।

মাধুরী—কেশবদাও যে আসবেন, সে বিষয়ে তুমি এত নিশ্চিন্ত হলে কি করে ?

বাসন্তী—নিশ্চিন্ত হয়েছি, পরিতোষবাবুর কথা শুনে।

মাধুরী—উনি কি বললেন?

বাসন্তী—যে জিনিসের জোরে কেশবদাকে মিছামিছি জেলে পাঠানো হয়েছে, সেই জিনিসের জোরেই কেশবদাকে সত্যি সত্যি জেল থেকে ছাড়িয়ে আনা হবে।

মাধুরী—কিসের জোরে?

বাসন্তী—টাকার জোরে। তোমার বাবা হয়তো পাঁচ হাজার খরচ করেছেন, তাই দশ হাজার খরচ করলেই পাঁচ হাজারের কীর্তি ভেঙে দেওয়া যায়।

মাধুরী—সেই রকম একটা ব্যবস্থা হয়েছে নাকি?

বাসন্তী—হ্যাঁ।

মাধুরী—কে করলেন?

বাসন্তী—পরিতোষবাবু করেছেন।

মাধুরী—হঠাৎ পরিতোষবাবুর এত টাকার জোর হলো কোথা থেকে?

বাসন্তী—তা জানি না।

বাইরে আবার মেজকাকার গলার স্বর শুনে উৎকর্ণ হয়ে উঠলো বাসন্তী। অন্ধকার রাত্রের গুমোট শেষ হয়ে গেছে। ক্লান্ত গাছের পাতার আলস্য পাখির ডাকে ভেঙে যাচ্ছিল। ভোরের হাওয়া বইছে। আকাশ ফরসা হয়ে গেছে।

মেজকাকা বললেন—লোকটা ধরা পড়ে গেছে বাসন্তী।

বাসন্তী উঠে বাইরে গিয়ে দাঁড়ালো। কে ধরা পড়েছে কাকা?

মেজকাকা—ঐ যে গাঁয়ের পোষা কালসাপটি ছিল, ভজু বাউরী।

বাসন্তী—ভজু কোথায়?

মেজকাকা—তবে লোকটার কপাল ভাল। এই কুকীর্তি করে নিজেও পার পেয়ে গেছে।

বাসন্তী—পালিয়ে গেছে ?

মেজকাকা—মরে গেছে।

কিছুক্ষণের মত বেদনায় রুদ্ধস্বর অবস্থায় শুধু দাঁড়িয়ে রইল বাসন্তী। সারা রাত্রি ধরে নানা দুশ্চিন্তার বিক্ষেপের মধ্যে একটা অজানা শঙ্কার শিহর বার বার বাসন্তীর বুক কাঁপিয়ে দিয়েছিল। ভজু চলে যাবার পর থেকেই নানা চিন্তার মধ্যেই ওর মূর্তিটা থেকে থেকে মনের দুয়ারে যেন বড় করুণভাবে উঁকি দিযে ফিরছিল। জীবনের প্রতিশোধ নেবার জন্য ভজু বোধ হয় শেষ অভিযানে বের হয়েছে। কিন্তু কার ওপর প্রতিশোধ নেবে ভজু, কিসেব জন্য, কোন্ ক্ষতির শোধ তুলতে ? কেশবদার সঙ্গে ক'দিনেব জন্য বড় ভাব হযেছিল ভজুর। কতবার এসে ভজু সেই কথা সগর্বে বাখান করে গেছে। কত অভিমানে ভজুর মন ভেঙে গেছে, সেকথাও ভজু মাঝে মাঝে বল্‌তো। কিছুদিন থেকে ভয়ানক রকমের হিংস্র হযে উঠেছিল ভজু। যক্ষ্মা হযে রক্ত কাশতো, তবু ওর বিষ কমেনি। যাব সঙ্গে দেখা হতো তাকেই শুনিযে দিত, এইবাব সে চরম শিক্ষা শিখিযে দিযে যাবে সারা গ্রামকে। ভজু আজ পর্যন্ত গাঁয়ের একটা কুকুর বিড়ালের গাযেও লাঠি মারেনি। তবু এই গাঁ ওকে শান্তিতে থাকতে দেযনি। এইবার সে দেখিয়ে দিযে যাবে, কি করে গাঁযের সর্বনাশ কবতে হয়।

সেই ভজু আজ শেষ হযে গেছে, শুধু তার মনের শেষ সাধ কেশব ঠাকুবের সঙ্গে দেখা, আর পূর্ণ হলো না।

কিন্তু এদিক দিযেও ব্যর্থ হযে চলে গেল ভজু। গাঁয়ের সর্বনাশ

করবার প্রতিজ্ঞা নিয়ে এক ভীষণ রাত্রির অন্ধকারে গ্রামের সর্বনাশের গায়ে আগুন লাগিয়ে সরে পড়লো ভজু। আজ পর্যন্ত গাঁয়ের মধ্যে কোন চুরি রাহাজানি করেনি ভজু। ভিন্ গাঁয়ের গৃহস্থ আর পথিকের মাথায় লাঠি মেরেছে ভজু। জীবনে ভজুর এই একটি গর্ব ছিল এবং এই একটি প্রসন্নতা ছিল। নিজের গ্রামকে ভালবাসে ভজু। কালসাপ হয়ে গাঁয়ের প্রাণে কখনো ছোবল দেয়নি। শেষ পর্যন্ত পারলো না। বাইরে থেকে যত অবাঞ্ছিত উপদ্রব গ্রামে এসে ঢুকেছে, তাকে কেশব ভট্‌চায মেনে নিতে পারেনি। ভজুও শেষ পর্যন্ত মান্‌তে পারলো না। ভজু হয়তো শেষ দিনের শেষ নিঃশ্বাসের সঙ্গে একটি সান্ত্বনা নিযে চলে গেছে যে, কেশব ঠাকুর তাকে বুঝতে পারবে। কেশব ঠাকুরের মত পণ্ডিত মানুষ যে দুঃখে মনমরা হয়ে গিয়েছিল, ভজুর জীবনব্যাপী নিগৃহীত মনুষ্যত্বের হীনতা ও লাঞ্ছনার মধ্যে সেই একই দুঃখের বীজ রয়েছে। এই একই দুঃখের কারণে এক অভিনব মিতালীর প্রস্তাব দিয়েছিল ভজু। কেশব ঠাকুর সে প্রস্তাব উপেক্ষা করেছে। ভজুর পথে কেশব ঠাকুর আস্‌তে পারলো না। নইলে ভজু কি ভয়ানক প্রতিশোধের ষড়যন্ত্র করতো কে জানে ?

অল্পক্ষণ পরে কথা বললো বাসন্তী—আপনি কি ভজুকে দেখতে গিয়েছিলেন কাকা ?

মেজকাকা—হ্যাঁ, নিজের ঘরেই মরে পড়ে আছে, শরীরটা অনেকখানি পুড়ে ঝল্‌সে গেছে।

বাসন্তী—এর পর কি হবে ?

মেজকাকা—পুলিসে খবর দেওয়া হয়েছে।

বাসন্তী—কিসের জন্য ?

মেজকাকা—তুই বুঝবি না বাসু। এ কাজতো আর ভজু নিজের ইচ্ছেয় করেনি। ভজুকে টাকা দিয়ে কেউ করিয়েছে। কারা করিয়েছে সে সব কথাও উঠেছে।

বাসন্তী—কার কথা উঠেছে ?

মেজকাকা—বোর্ডের প্রেসিডেণ্ট ভূদেব আর হেড মাস্টার বিশ্বেস মশাই বলছেন···

মেজকাকা চুপ করে গেলেন। বাসন্তীর সন্দেহ আরো প্রখর হয়ে উঠলো। বাসন্তী আবার প্রশ্ন করলো—কাকে সন্দেহ করছে সবাই ?

মেজকাকা—ওদের কথা ছেড়ে দে। ওরা বলছে, কেশব নাকি ভজুকে আগেই শিখিয়ে রেখেছিল।

বাসন্তী—পুলিস আসলে আমাকে একবার খবর দেবেন কাকা।

মেজকাকা—কেন রে ?

বাসন্তী—আমি সাক্ষ্য দেব। আমি জানি কে ভজুকে দিয়ে কার ঘরে আগুন লাগাবাব ষড়যন্ত্র করেছিল। ভজু রাত্রিবেলা এসে আমায় সব বলেছিল।

মেজকাকা এগিয়ে এলেন। একটু সন্ত্রস্ত ভাবে অথচ কৌতূহলী হয়ে বললেন—কে রে বাসু ?

বাসন্তী—এখন কিছু বল্‌বো না।

মেজকাকা—পুলিসের কাছে একটা কথা বলে ফেললেই তো হলো না। প্রমাণ দিতে পারবি ?

বাসন্তী—হ্যাঁ।

মেজকাকা—কি প্রমাণ ?

বাসন্তী—ভজুকে তিনি চিঠি দিয়েছিলেন, টাকা পাঠিয়েছিলেন। সেই চিঠি আর টাকা ভজু কাল রাত্রে আমার কাছে ফেলে রেখে চলে গেল।

মেজকাকা মন্ত্রমুগ্ধ হয়ে বাসন্তীর কথাগুলি শুনছিলেন। এগিয়ে আসতে আসতে দাওযার ওপরেই উঠে এসে দাঁড়ালেন। তীব্র আগ্রহে মেজকাকার চোখ দুটো জল্ জল্ করে উঠলো। বাসন্তীর কাছে কাতরভাবে প্রশ্ন করতে লাগলেন—নামটা বলে দে মা একবার। কে ব্যাটা এই কাজ করলো। একবার ব্যাটাকে দেখেনি।

বাসন্তী—আজ আর সেটা বলবো না কাকা।

মেজকাকার গলার স্বর আরও কাতর হযে উঠলো—একবার বলে দে বাছা। বড় অর্থকষ্টে আছি মা। একবার নামটা তুই জানিয়ে দে, কিছু আদায করে নেই।

বাসন্তী অপ্রস্তুত হয়ে হেসে ফেললো। মেজকাকার মতিগতিব অনেক পরিচয রাখে বাসন্তী। তাই এটাও কিছু নতুন নয।

বাসন্তী বললো—আমাকে কোন অনুরোধ করবেন না কাকা।

মেজকাকা অত্যন্ত নিম্ন অথচ তিক্ত স্বরে বললেন—ভুল করলি বাসন্তী, মস্ত ভুল করলি, বড় অকৃতজ্ঞ তোরা। একটা স্নেহের সম্পর্ক ও দাবি পর্যন্ত রাখতে চাস্ না। যেমন অজয, তেমনি তুই। তোদের সঙ্গে এক পুকুরের জল খাওযাও ভুল।

বাসন্তী বুঝলো কাকা কথার ইঙ্গিতে সেই পুরানো মাম্লার ভয আবার দেখাচ্ছেন। তবু বাসন্তী চুপ করে থাকে। মেজকাকা কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে মাথা চুলকিযে নিলেন, তারপর চুপচাপ দাওয়া থেকে নেমে গেলেন।

মাধুরীও হঠাৎ ঘর থেকে বেরিযে এসে বললো—আমার তো আর

থাকা চলে না বাসু। আর অপেক্ষা করতে পারি না। আমাকে এখুনি যেতে হবে।

বাসন্তী—যাও, কোথায় যাবে?

মাধুরী—মীরগঞ্জ চললাম।

বাসন্তী—বুঝেছি।

মাধুরী—বুঝতেই পারছো, আগে বাঁচতে হবে।

বাসন্তী—হ্যাঁ, আপনি বাঁচলে বাপের নাম।

মাধুরী আর দাঁড়ালো না, ব্যস্তভাবে দাওয়া থেকে নেমে বাগানে গিয়ে দাঁড়ালো। মেজকাকার মূর্তিটা তখনো বাগানের বেড়া ঘেঁষে বিষণ্ণভাবে চলেছে। মাধুরী চেঁচিয়ে ডাকলো—মেজকাকা।

মেজকাকা চমকে মুখ ফিরিয়ে তাকালেন। ব্যস্তভাবে ফিরে এসে বললেন—তুমি এখানে কোথা থেকে এলে? তুমি আইনে বেঁচে গেছ?

মাধুরী বললো—না, এখনো বেঁচে উঠতে পারিনি। আপনি আমার একটু উপকার করুন।

মেজকাকা—বল। সঞ্জীবদার মেয়ে তুমি। তোমাকে বিপদে আপদে একটু উপকার করতে পারবো না, কি যে বল!

বাসন্তী শুধু দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে একদৃষ্টি তুলে তাকিয়ে রইল। মেজকাকার সঙ্গে মাধুরী তখনই মীরগঞ্জের দিকে ধাওয়া করেছে, সোজা পথ ধরে, আর তিলমাত্র বিলম্ব না করে চলেছে। বাসন্তীর চোখ দুটো জলে ভরে উঠলো। হয়তো নেহাৎ অকারণে। কিন্তু ভয় পেয়ে গিয়ে নয়। পরক্ষণেই চোখ দুটো একটা জ্বালাকর অনুভূতির স্পর্শে শুকনো হয়ে ওঠে। জ্বল্ জ্বল্ করতে থাকে। জ্বলতে থাকে।

কতক্ষণ এভাবে দাঁড়িয়েছিল বাসন্তী তা সে নিজেই জানে না। আর

সমস্ত সম্বিৎ যেন এক মৌনতার আনন্দে ডুব দিয়ে সকল ঝঞ্ঝাটের রূঢ়তা থেকে ক্ষণিকের জন্য মুক্তি পেয়েছিল। বাসন্তী বুঝতে পারে বড় বেশি অবসন্ন হয়ে পড়েছে সে। এ কাজ তার সাজে না, তার শক্তিতে কুলোয় না। চিরদিন নিভৃতের ভালবাসায়, একা মনের চিন্তায় সে বড় হয়ে উঠেছে। কোনদিন কোন বড় কথায়, বড় কাজে ও বাদবিসম্বাদে তার ক্ষুদ্র ব্যক্তিত্বকে সে ব্যস্ত হতে দেয়নি। জীবনে চাওয়া ও পাওয়ার কোন রীতিনীতিকে নিয়ে দুশ্চিন্তা করার চেষ্টা সে করেনি। যা আপনা থেকেই আসে, তাকে সে মেনে নেয়। যা আপনা থেকেই অসম্ভব হয়ে ওঠে, তাকে সে টেনে রাখতে চায় না। যে পথে তার চলে যাবার নিয়ম, সে পথের মাটিকেও সে কাঁটা দিয়ে উত্যক্ত করতে চায় না।

বাসন্তীর অবসন্ন মনে একটি কল্পনার রঙ শুধু লেগে থাকে। একটি উৎসবের দিন। সেদিন সবাই থাকবে। সবার কাছ থেকে বিদায় নিয়ে চলে যেতে হবে। এই প্রতীক্ষার মেয়াদ শীঘ্রই ফুরিয়ে যাক্। জীবনের একটা নির্বাচিত মুহূর্তে হঠাৎ গোধূলির আভা দেখা দিক্, শাঁখ বাজুক। ধীরে ধীরে দশ দিক উদাস্ হয়ে আসুক। জীবনে মুখফুটে চাইবার সকল লজ্জাকে সেই লগ্নে বলিদান দিয়ে, এক অপরিচয়ের জগতে একজনের হাতে ধরে অদৃশ্য হয়ে যাবে সে। সেদিন যেন বিদায়ের বেদনা আর এক তিল স্পর্শ না করে। তারপর দেখা যাবে। ভিন্ন পৃথিবীতে ভিন্ন নিয়মে জীবন আরম্ভ হবে, তার জন্য কোন ভয় নেই, দুঃখ নেই বাসন্তীর। সে শুধু চায়, সারা জীবন ধরে যেন কোন দীর্ঘশ্বাস তার পেছু পেছু ছায়ার মত ঘুরে না বেড়ায়। তা'হলে আর জীবনে চল্‌তে পারবে না কখনও, শুধু পালিয়ে পালিয়ে বেড়াতে হবে।

কে জানে সে কেমন, যার সঙ্গে আর ক'টি দিন পরেই তার জীবন গ্রন্থিবদ্ধ হয়ে যাবে। বাসন্তী বিশ্বাস করে, যেমনই হোক্ সে জগৎ, সেখানেও সাধে-আহ্লাদে কাজে ও আগ্রহে মিশে যাবার মত সব কিছুই আছে। কোন ভুল যেন তার এই নতুন জীবনের অধ্যায় দুর্বোধ্য না করে দেয়।

আজ ভাবতে গিয়ে লজ্জিত হয়ে পড়ে বাসন্তী। নিজেকে অত্যন্ত ছোট মনে হয়, সমস্ত ব্যাপারটাই যেন শুধু লোক হাসাবার মত। কিন্তু লোকে জানে না, এই একমাত্র রক্ষা। সমস্ত পৃথিবীর মধ্যে সে শুধু একলাই জানে যে কেশবদাকে তার ভাল লাগে। কেশবদার মত মানুষের সঙ্গে জীবনে আপন হযে থাকতে ইচ্ছে করে। কিন্তু এই ইচ্ছা আজ পর্যন্ত তারই মনের একান্তে একটা প্রতিধ্বনি মাত্র। কেউ আজ পর্যন্ত শুনতে পায়নি। কেশব ভট্‌চাযের কল্পনায়, অনুমানে ও সংশয়ে কোন মুহূর্তে এই আবেদনের আভাস পর্যন্ত পৌঁছয় নি, যার জন্য বাসন্তীর জীবনের সব চেযে মূল্যবান সত্যটি উৎসর্গ হযে আছে। কিন্তু সে যে নিতান্তই অলক্ষ্য অগোচর ও নিভৃতের বন্দী। তাই তার বেদনাও বুঝি এত তীব্র, এত প্রতিকারহীন। এই অনর্থক অধ্যায় সমাপ্ত করে দেবার দিন আগত।

আর কিছু নয। মাধুরীর জীবনের বিকৃতি যেন কারও মনুষ্যত্বকে আর পথ ভুল না করিযে দিতে পারে, তারই আয়োজন পূর্ণ করে দিয়ে, একটি উৎসবের বিদাযী সন্ধ্যার আলো বাঁশী শাঁখ আর মন্ত্রের জন্য শুধু অপেক্ষা করে থাকে বাসন্তী।

সঞ্জীববাবু কিছুক্ষণ হতভম্বের মত মাধুরীর দিকে তাকিয়ে রইলেন।

তারপরেই ভ্রূকুটি করে বললেন—হঠাৎ চলে এলি যে, গ্রামের সুখ সইলো না বুঝি ?

মাধুরী—সব পুড়ে গেছে।

চম্‌কে উঠলেন সঞ্জীববাবু। কিন্তু এই চমকিত চেহারার মধ্যে আতঙ্ক বা বেদনার ছাপ ছিল না। একটু লক্ষ্য করলেই বোঝা যায়, সঞ্জীববাবুর দু'ঠোঁটে একটা হাসির কুটিল রেখা ধীরে ধীরে ফুটে উঠছে, যেন একটা ঈপ্সিত ঘটনার সংবাদ দু'কান ধন্য করে শুনছিলেন সঞ্জীববাবু।

মাধুরী—কিন্তু তোমার ইচ্ছে পূর্ণ হয়নি।

এইবার সত্যিই আতঙ্কিতের মত চম্‌কে উঠলেন সঞ্জীববাবু। চেঁচিয়ে উঠলেন—আমার ইচ্ছা ? এ সব কথা কোথায় শুনলি ?

মাধুরী—আমাদের বাড়ী পুড়ে গেছে। কেশব ভট্টচাযের বাড়ী পোড়েনি।

সঞ্জীববাবুর সারা মুখ বীভৎসভাবে বিবর্ণ হয়ে উঠলো। যেন তার পায়ের তলার মাটি সরে যাচ্ছে, সেই রকম একটা শঙ্কায় অসহায়ভাবে এক একটা আর্ত শব্দ ছাড়তে লাগলেন—অকৃতজ্ঞ, সব অকৃতজ্ঞ, নরাধাম, গাঁয়ের মানুষ সাপের চেয়ে ভয়ানক, কী বিশ্বাসঘাতক !

মাধুরীও হেসে ফেললো। কিন্তু চোখের দৃষ্টিতে অদ্ভুত রকমের একটা প্রদাহ ছিল।—হ্যাঁ সত্যিই বিশ্বাসঘাতক।

মাধুরী আবার হঠাৎ একটু নিষ্ঠুর রকমের ধূর্ত হয়ে যেন ঠাট্টা করলো—তুমি কার কথা বলছো বাবা ? কে বিশ্বাসঘাতক ?

সঞ্জীববাবু—সবাইরে সবাই। কে নয় ? তোর স্বর্গাদপি গরীয়সী ঐ মান্দার গাঁ আমার কাছে নরকেরও অধম। আমার সর্বনাশ ছাড়া এরা আর কিছু করতে শেখেনি।

মাধুরী—বেছে বেছে তোমার ওপর ওদের এত রাগ কেন বাবা !

সঞ্জীববাবু—হিংসে, আমাকে হিংসে করে। কেন আমি বড়লোক হয়ে গেলাম, এই আমার অপরাধ।

মাধুরী—কিন্তু তোমার মতে যার ঘর পুড়ে যাওয়া উচিত ছিল, সে কি তোমার ওপর হিংসে করে ?

সঞ্জীববাবু—একটু কঠোর ভাবে তাকিয়ে বললেন—তুই কি সবই জেনে ফেলেছিস্ ?

মাধুরী—হ্যাঁ।

সঞ্জীববাবু—কে বললে !

মাধুরী—ভজু নিজ মুখে বলে গেছে।

—বুঝেছি, ছোট একটা প্রতিহিংসার হুঙ্কার ছেড়ে সঞ্জীববাবু একেবারে চুপ করে গেলেন। তারপর যেন তাঁর স্মৃতির ভাণ্ডার তন্ন তন্ন করে খুঁজে এক একটা পুরানো ক্ষত ক্ষতি বেদনা ও অপমানের জ্বালাকে টেনে বার করতে লাগলেন,—আমাকে চিরদিন অপমান করে এসেছে কেশব, চল্লিশ বছর আগে কেশবের বাবা আমাকে অপমান করেছিল। আমার জীবনের আকাঙ্ক্ষাকে সব দিক দিয়ে ব্যর্থ ও অপমান করার জন্যই এই বংশটির জন্ম হয়েছিল।

মাধুরী বিস্মিতভাবে সঞ্জীববাবুর মুখের দিকে তাকিয়েছিল। মাথা ভরা পাকা চুল, বার্ধক্যের জীর্ণতার আভাস লেগেছে, সারা শরীরটা শীতাহত বনস্পতির রিক্ততার মত। আর ক'দিনই বা বাঁচবেন। জীবন ও আয়ুর উত্তাপ শেষ অঙ্গারের মত ধীরে ধীরে ধুক্ ধুক্ করছে, তবু আজ বৃদ্ধ সঞ্জীববাবুর চোখের দৃষ্টিতে, মুখের ভাবে ও বুকের নিঃশ্বাসে এক অদ্ভুত চাঞ্চল্য ! কী জ্বলন্ত অভিমান ও প্রতিহিংসা তাঁর যৌবনের

অভিমান আজও যেন স্পষ্ট শবমূর্তি ধরে রয়েছে। তাঁর চলার পথে সম্মুখের মাঠে মান্দার গাঁয়ে সন্ধ্যা নামছে, সকল গতি অবসন্ন হয়ে আসছে, তবু জীবনের সেই প্রথম আক্ষেপকে আজও সহচর করে রেখেছেন।

শোনা যায়, মানুষের মৃতদেহকে সৎকারের জন্য যখন আগুন দেওয়া হয়, তখন সেই মৃতের মুখটা কেমন হাসিহাসি দেখায়। অতিবৃদ্ধের চেহারাও কেমন তরুণ ললিত ও করুণ হয়ে ওঠে। মাধুরী হয়তো সেই রকমেরই একটা বিস্ময়কর দৃশ্যের দিকে তাকিয়েছিল। সঞ্জীববাবুর বেদনারক্ত উত্তেজিত মুখটা অত্যন্ত কমবয়সের মনে হয়। তরুণ জীবনের স্মৃতির জ্বালাগুলি শিখা হয়ে যেন সঞ্জীববাবুকে ঘিরে ধরেছে। অদ্ভুত দেখাচ্ছিল সঞ্জীববাবুকে।

মাধুরীর বিস্ময় ধীরে ধীরে গলে গিয়ে মমতার প্লাবনের মত সারা হৃদয় সিক্ত করে তুলছিল। সঞ্জীববাবুকে এভাবে কখনো চিনতে ও বুঝতে পারেনি মাধুরী। কোন দিন মুহূর্তের মতও কোন কথাচ্ছলেও সঞ্জীববাবুর এই পরিচয় সে জানতে পারেনি। এতদিন ধরে শুধু বিষয়ে সম্পদে ও বিজ্ঞতায় কৃতী পিতাকে শ্রদ্ধা করে এসেছে মাধুরী। সঞ্জীববাবুর বিজ্ঞতার ত্রুটি দেখলে মাধুরী ক্ষুণ্ণ হয়েছে। সঞ্জীববাবুর কৃপণতা দেখলে কুণ্ঠিত বোধ করছে মাধুরী। এর বেশি কোন ত্রুটি সঞ্জীববাবুর মধ্যে আবিষ্কার করতে পারেনি। কিন্তু আজ হঠাৎ মেঘভাঙা চাঁদের আলোকের মত একটা ইতিহাসের রহস্য যেন দূর অতীতের বেদনাকে স্পষ্ট করে ধরিয়ে দিয়েছে। মাধুরী বিহ্বল হয়ে ভাবতে থাকে, তাই কি সত্যি? কেশবদার বাবা কি অপমান করেছিলেন? কোন্ ধরণের অপমান? কেশবদার বাবার কাছে সঞ্জীববাবু পরাজিত হয়েছিলেন—

কি সেই পরাজয়? কী এত করুণ ও মর্মান্তিক সেই পরাজয়, যার বেদনা আজও এই বৃদ্ধের বিশ্বাসকে পুড়িয়ে মারছে? চিন্তার এই সংশয় ও কৌতূহলের আলোড়নের মধ্যে কোন স্পষ্ট উত্তর না শুনতে পেলেও মাধুরীর হঠাৎ মনে পড়ে যায়—কেশবদার মা সারদা জেঠিমা সত্যিই খুব সুন্দরী।

জীবনে সঞ্জীববাবুকে নতুন করে শ্রদ্ধা করতে পরছে আজ মাধুরী। এই শ্রদ্ধার আবেশে সঞ্জীববাবুর সব অপরাধের তালিকা ভেসে চলে যায়। কে বলতে পারে, সঞ্জীববাবু গ্রাম-ছাড়া মানুষ, সদর মীরগঞ্জের বড় উকিল, বিষয়ী, যশস্বী ও বিজ্ঞ। কিছুই বদলান্ নি তিনি। জোর করে একটা কপট তপস্যার জোরে নতুন একটা মূর্তি ধরে রয়েছেন। কিন্তু এই ঘোর পরিবর্তনের আড়ালে সেই চল্লিশ বছর আগের এক গ্রাম্য কিশোরের রাগ ও অভিমান অটুট রয়ে গেছে। গ্রাম থেকে সরে এসেছেন সঞ্জীববাবু, কিন্তু এই গ্রামেরই কোন্ এক দূর অতীতের স্বপ্নাবিষ্ট প্রহেলিকার ছবিটিকে ছাড়তে পারেন নি। এই একটি অপ্রাপ্তি তার জীবনের সহস্র অর্জন ও প্রাপ্তিকে একেবারে না-পাওয়া করে রেখেছে।

সঞ্জীববাবু বললেন—যখন বুঝলাম, কেশবের হাতে তোকে সঁপে দিতে হবে তখন…।

মাধুরী—তখন আমায় সাবধান করে দিলেই পারতে বাবা। তুমি চুপ করে থেকে আমার সব ভুল করে দিয়েছিলে।

সঞ্জীববাবু—হ্যাঁ আমি চুপ করেই সব অপমান সহ্য করেছি, শুধু হেরে যাবার জন্যই আমি জন্মেছিলাম।

মাধুরীর মুখ হঠাৎ অস্বাভাবিক রকমের রক্তিম হয়ে ওঠে, অন্তরের গহনে একটা রূঢ় প্রতিধ্বনি শুনতে পায়। বহু মোহ, বহু ছলনা, বহু

ভীরুতাকে চূর্ণ করে দিয়ে তার জীবনের এক নতুন প্রতিজ্ঞা আজ স্পষ্ট ভাবে নিজেকে ঘোষণা করতে চাইছে, মাধুরী বলে—কিন্তু তুমি হেবে যাওনি বাবা।

সঞ্জীববাবু—তার অর্থ ?

মাধুরী—কেশব ভট্‌চার্যেব মত মানুষের কাছে আমাকে যদি তুমি আজ সঁপে দাও, তা'হলে আমার উপর অন্যায করা হবে।

সঞ্জীববাবু যেন একটু বিব্রত হযে উঠলেন। একটু গম্ভীরভাবে চিন্তাবিষ্ট থেকে বললেন—পরিতোষ তোকে কিছু বলেছে না কি ?

মাধুরী—পরিতোষের কথা থাক্।

সঞ্জীববাবু—কেন ?

মাধুরী—তাকে আমি বুঝতে পাবি না। তাকেও বিশ্বাস নেই।

সঞ্জীববাবু—কেন ?

মাধুরী—সেও কেশব ভট্‌চার্যেব একজন ভক্ত।

সঞ্জীববাবু হাসলেন—দেখছিস্ তো, কেশব ভট্‌চার্যেব মহিমা। আমাব যা কিছু কেড়ে নেবার জন্যই ওদের জন্ম।

মাধুরী—ওবা তোমার শত্রু হযে দাঁড়িযেছে, কিন্তু তুমি আজ ইচ্ছে করলেই ওদের জব্দ করতে পাব।

সঞ্জীববাবু—হ্যাঁ, ওরা শত্রু হযেই দাঁড়িযেছে। পরিতোষ আর অজয এসেছে কেশবকে জেল থেকে ছাড়িযে নেবাব জন্য।

মাধুরী—ওঁদেব মধ্যে একমাত্র খাঁটি মানুষ অজযদা।

সঞ্জীববাবু একটু কৌতূহলী হযে বললেন—কে বললে !

মাধুরী—আমি জানি।

সঞ্জীববাবু—আব কিছু জেনে লাভ নেই মাধুবী। তুই কিছু ভাবিস

নি। আবার কলেজে ভর্তি হয়ে যা। আমিও আর বেশি দিন এখানে থাকবো না। তোর পরীক্ষা হয়ে গেলেই মীরগঞ্জ ছেড়ে চলে যাব। পশ্চিমের কোন একটা শহরে বাকি ক'টা দিন কাটিয়ে দেব, আর যেন মান্দার গাঁয়ের কোন ভাষা কানে শুনতে না হয়।

মাধুরী—ওরা বোধ হয় তোমার বিরুদ্ধে একটা জঘন্য মামলা দাঁড় করাবে।

সঞ্জীববাবু—কিসের মামলা।

মাধুরী—কেশব ভট্টচাযের ঘরে আগুন লাগাবার ষড়যন্ত্র করেছ তুমি, এই অভিযোগ আনবে।

সঞ্জীববাবু— হাসছিলেন।—কে কে সাক্ষী দেবে রে মাধুরী ?

মাধুরী—সাক্ষী দেবার লোক আছে।

সঞ্জীববাবু—আমার পক্ষে সাক্ষী আছে।

মাধুরী—তোমার পক্ষে ?

সঞ্জীববাবু—হ্যাঁ, আমার পক্ষে তোর সারদা জেঠীমাই সাক্ষী দেবে। কেশব ভট্টচাযের ঘরে আমি আগুন দিতে পারি না। এটা অসম্ভবের চেয়েও অসম্ভব। এই কথা সব চেয়ে ভাল করে, শপথ করে যে বলতে পারবে, সে হলো তোর সারদা জেঠীমা।

মাধুরী—কিন্তু বাসন্তীর কাথায় বুঝলাম, তোমার হাতের লেখা চিঠি আর টাকা ভজুর কাছে ছিল। ভজু সে চিঠি অজয়দার বাড়িতে ফেলে রেখে গেছে।

সঞ্জীববাবু আবার হেসে উঠলেন,—তোর বন্ধু বাসন্তী আমার ওপর ভয়ানক রেগে আছে। ও চিঠিতে কিছু নেই। ও সব বাসন্তীর কথার চালাকি।

মাধুরী—সত্যি কিছু নেই না বাবা ?

সঞ্জীববাবু—আরে না।

মাধুরীর মন থেকে যেন একটা পাথরের বোঝা নেমে গেল। ইস, বাসন্তীর মত গেঁযো মেয়েও কি ধূর্ত বাবা !

সঞ্জীববাবু—ভায়ানক ! আমি জানি গেঁয়ো মেয়ে কি ভয়ানক জীব !

মাধুরী কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে কি একটা কথা ভেবে নেয়, মনের শেষ দুশ্চিন্তাকে দূর করে দিয়ে মুক্ত হবার জন্য যেন সমবয়সী সুহৃদের মতই সঞ্জীববাবুকে সাগ্রহে জিজ্ঞাসা করে—ভজুকে তুমি সত্যিই কিছু বলেছিলে কি বাবা ? অবশ্য আর কোন ভয় নেই, ভজু নিজেই শেষ হয়ে গেছে।

সঞ্জীববাবু ভীরু ভয়ার্তের মত বললেন—কবে ?

মাধুরী—কাল রাত্রেই মারা গেছে ভজু। আজ সকালে খবর শুনেছি।

সঞ্জীববাবুর ভযার্ত ভাব পরমুহূর্তে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেল। যাক, সব জ্বালা মিটে গেছে ভজুর। জীবনে আমাকেই একমাত্র সহযোগী হিসাবে পেয়েছিল ভজু।

মাধুরী চম্‌কে উঠলো—তা'হলে কথাটা সত্যি ?

সঞ্জীববাবু—হ্যাঁ সত্যি। কেশবের ঘরে আগুন দেবার জন্য আমি বলেছিলাম।

মাধুরী—মাপ করো বাবা, আমি বুঝতে পারছি না, তুমি এত বুদ্ধিমান হয়ে একাজ করতে পারো।

সঞ্জীববাবু—বুদ্ধিমান বলেই এ কাজ করতে চেযেছিলাম।

মাধুরী—তোমার এতে কি লাভ বাবা ?

সঞ্জীববাবু—লাভ ছিল বৈকি। একটা আশা ছিল।

মাধুবী উৎকর্ণ হয়ে রইল।

সঞ্জীববাবু যেন মনে মনে দূব অতীতেব একবাশি ঘটনার অস্পষ্ট স্মৃতিব আড়ালে ঝাপসা হয়ে নিজের মনে বিড় বিড় করতে লাগলেন—আশা ছিল, ওবা এইবার শিক্ষা পাবে। সাবা গাঁযে মানুষ নেই, ঘর পুড়ে গেলে ওদেব কে আশ্রয় দিত। আমি দিতাম, আমিই দিতাম। আমাব আশ্রযেই সাবদাকে আসতে হতো। আশা ছিল বৈকি!

মাধুবী স্তম্ভিত হযে দাঁড়িযে শুধু দেখছিল, সঞ্জীববাবুর চোখ দিয়ে ঝর ঝব কবে জল পডছে। মাধুবী অনুযোগ কবলো—তুমি বড় ছেলেমানুষ বাবা!

বাসন্তী প্রস্তুত হলো। সাবা রাত ঝডেব সঙ্গে যুদ্ধ করে ক্লান্ত হযে ও বর্ষাব জলে স্নান কবে মান্দাব গাঁ এখন শান্ত হযেছে। সকালবেলাব বোদে চাবদিক স্বচ্ছ হযে উঠেছে, এই ঘোব সবুজেব সজীবতা, আলোকের স্বচ্ছতা ও মৃদু বাতাসেব দোলাব মধ্যে মাত্র তিনটে জাযগা খাপছাড়া হযেছিল। তিনটে কদর্য ছন্দহীন রূপ। বোর্ড অফিস, ইংবেজী স্কুল আব সঞ্জীববাবুব বাডি—ছাই আব পোড়া কালিব স্তূপেব মত পড়েছিল। মান্দাব গাযেব তিনটে পাপেব আবর্জনা যেন ভস্মীভূত হযেছে।

তাব চেযে আবও বড খবব—ভজু বাউবী মবেছে। দলে দলে গাঁযের লোক ভজুব ঘবেব কাছে ভিড কবেছিল। পুলিস এসেছে তদন্ত কবতে।

বড বিমর্ষ হযে পড়েছে পুলিস। সাক্ষী, প্রমাণ ও বিবরণ যা পাওযা যাচ্ছে তা মোটেই মনেব মত হচ্ছে না। গৃহদাহেব মত এত বড একটা কাণ্ড, এব সঙ্গে দশজনকে অন্ততঃ জডিযে বেঁধে ফেলতে না পাবলে মনেব

পকেট ভরে না। অথবা বলতে পারা যায়, পকেটের মন ভরে না। কেসটা যেভাবেই দাঁড় করানো যাক্ না কেন, দু'পয়সার ভরসা কোন দিক থেকেই নেই।

ভজুর মত আসামী জ্যান্ত ধরা পড়লেই বা কি লাভ হতো? পুলিস নিজের বিমর্ষ মনকে সান্ত্বনা দেয়। একটু আশা তবুও করা যেত হয়তো, ভজুকে দিয়ে কতগুলি কাহিনী একবার কবুল করিয়ে নিয়ে যদি দু'দশটা শাঁসালো গেয়োকে ফাঁসানো যেত। কিন্তু সে আশাও বৃথা। ভজুর মৃতদেহটা আধপোড়া হয়ে পড়ে আছে। নাক দিয়ে একটা ক্ষীণ রক্তের ধারা গড়িয়ে চোয়াল বেয়ে মাটিতে পড়েছে, এতক্ষণে শুকিয়ে গেছে। ভজুর নির্জীব মূর্তির দিকে তাকিয়ে পুলিস যেমন ক্ষুণ্ণ তেমনি হতাশ হয়ে পড়ছিল।

বাসন্তী প্রস্তুত হচ্ছিল। সারদা জেঠীমার সঙ্গে একবার দেখা করে আসবে। আর দেরি করার সময় নেই। মাধুরী আজ সূর্য না উঠতেই গাঁ ছেড়ে মীরগঞ্জে চলে গেছে। নাগিনীর বিষ বোধ হয় ফুরিয়ে গেছে, নতুন করে মান্দার গাঁয়ের প্রাণকে জ্বালাতন করার জন্য, নতুন ভাবে কামড় দেবার জন্য মাধুরী যেন একটা হিংস্র প্রতিজ্ঞা পুষে নিয়ে সদরে গেছে।

বাসন্তী তাই আর দেরি করতে পারে না। মান্দার গাঁয়ের সীমানার চারিদিকে মন্ত্র পড়ে বেঁধে রাখতে হবে, আর কোন বিষাক্ত আবির্ভাব সেই মন্ত্রপূত বেড়া ডিঙিয়ে যেন প্রবেশ করতে না পারে।

বাধা পড়লো। বাসন্তী ঘরের বাইরে এসে একটু অপ্রস্তুত হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। পুলিস এসেছে।

পুলিস—আপনার কাছে কয়েকটা কথা জিজ্ঞাসা করার আছে।

পুলিস বাসন্তীর মুখের দিকে তাকিয়ে গলার স্বর আর একটু ভারী করে নিল,—অজয়বাবু কোথায় ?

বাসন্তী—মীরগঞ্জে গেছেন।

পুলিস—কেন ?

বাসন্তী—জানি না।

পুলিস—সঙ্গে আর কেউ গেছেন ?

বাসন্তী—হ্যাঁ।

পুলিস—তিনি কে ?

বাসন্তী—চিনি না।

পুলিস তার গাম্ভীর্যকে আর একটু কঠিন করে নিল।—সঞ্জীববাবুর মেয়ে মাধুরী কি কাল রাত্রে এখানে ছিল ?

বাসন্তী—না।

পুলিস আশ্চর্য হয়ে বাসন্তীর দিকে তাকিয়ে আবার প্রশ্ন করলো—এখানে ছিল না ?

বাসন্তী—না।

পুলিস—ভজু বাউরীকে আপনি চেনেন ?

বাসন্তী—হ্যাঁ।

পুলিস—আপনাদের বাড়িতে সে প্রায়ই আসতো ?

বাসন্তী—না।

পুলিস—তবে ?

বাসন্তী—তবে আর কি শুনতে চান ?

পুলিস একটু বিব্রত ভাবে বললো—না না, আর কিছু শুনতে চাই না। তবে কিনা, কেসটা এখনো কিছুই বুঝতে পারছি না। কেউ কিছু

বলতে চাইছে না। গাঁয়ের লোকের স্বভাবই এই রকম! এটা কেউ বুঝছে না যে, একটু খবর ধরিয়ে দিতে পারলেই ভাল মত পুরস্কার পাবে।

বাসন্তী চুপ করে রইল। পুলিস যেন একটা প্রত্যুত্তরের আশায় প্রলুব্ধভাবে বাসন্তীর মুখের দিকে তাকিয়েছিল।

নিতান্ত দুঃখিত ভাবেই শেষ পর্যন্ত পুলিস চলে গেল।

সারদা জেঠীমা সাজি হাতে নিয়ে ফুল তুলছিলেন। কার যেন পায়ের সাড়া শুনতে পেয়ে একটু আশ্চর্য হয়েই পেছন ফিরে তাকালেন।

আগন্তুক মূর্তির দিকে তাকাবার পর আরও আশ্চর্য হলেন সারদা দেবী। ঠিক চিনতে পারছেন না। এ কি মান্দার গাঁয়েরই মেয়ে? কিন্তু কোন্ বাড়ির? আন্দাজ করেও কিছু ঠাউরে উঠতে পারছিলেন না সারদা দেবী।

সমস্ত গাঁয়ের মধ্যে মাত্র একটি মেয়েকে ভাল করে চিনে রেখেছেন সারদা দেবী। আজও তাকে ভুলতে পারেন নি। জীবনে সেই মেয়েটিকেই শুধু তাঁর প্রয়োজন। তার নাম মাধুরী। তিনি শুনতে পেয়েছেন, মাধুরী গাঁয়ে ফিরেছে, কিন্তু আজও তার দেখা পাননি। কেশব পাঁচ বছর পরে গাঁয়ে ফিরলো, সেই সঙ্গে সঙ্গে ঘটনার নির্বন্ধে যেন মাধুরীও ফিরে এল। সারদা দেবী আসন্ন একটা উৎসবের স্বপ্ন দেখছিলেন। কিন্তু সে স্বপ্ন ক'দিনের মধ্যেই আবার ফাঁকি দিয়ে পালিয়ে গেছে। কেশব ফিরে এল আবার শুধু চলে যাবার জন্যই। অদৃষ্টের চক্রান্ত শুধু কেশবকেই গ্রামের স্নেহাশ্রয় থেকে দূরে সরিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। আর কাউকে নয়। আবার গ্রামে হাঙ্গামা হলো, আবার মামলা হলো। কিন্তু ভগবানের কি বিধান! সবাই ফিরে এল কেশবকে পেছনে রেখে।

সারদা দেবী সবই জানেন। কেশব আর মাধুরীর মাঝখানে একটা

দৈবেব অভিশাপ যেন অলক্ষ্যে সব আনন্দকে ব্যর্থ করে দিচ্ছে। এ কিসেব অভিশাপ? কেশবের মন, কেশবের মনের ইতিহাসের কথা সারদা দেবীর কিছুই জানতে বাকি নেই। তবু সেই ইতিহাস আজ কিছুতেই পথ পাচ্ছে না। এই বেদনাই সারদা দেবীর জীবনের সব হাসি, আলো ও চাঞ্চল্যকে মলিন করে রেখেছে। তাই ক'দিনের মধ্যেই ভয়ানক বকমেব কৃশ ও করুণ হযে উঠেছেন সারদা দেবী। যেন খুব বড় রকমের একটা অসুখেব আক্রমণে পড়েছেন। শেষ আশার চিহ্নগুলিও একে একে মিটে যাচ্ছে।

কেশবেব সঙ্গে মাধুবীব বিযে হবে, এই ঘটনাকে একটা সঞ্চারিত সত্যেব মত ধবে বেখেছিলেন সাবদা দেবী। সব দুঃখ, বিরহ, নির্বাসন ও মাম্‌লা হাঙ্গামাব বেদনা ও বাধা উত্তীর্ণ হযে একদিন এই সত্য উৎসবের রূপে, বর্ণে ও শব্দে সফল হযে উঠবে, এই একটি আকাঙ্ক্ষার স্বপ্নকে নিযেই বছবেব পব বছব পাব কবে দিযেছেন সাবদা দেবী। মাধুরীকেও ভাল কবে চেনেন। সেই পাঁচ বছব আগেকাব দেখা মাধুবীব চোখের আগ্রহ থেকে তিনি সবই বুঝতে পাবতেন। তাই তাঁব সব সংশয দুব হযে গিযেছিল। শুধু তাঁব আশাই বড হযেছিল এতদিন।

কিন্তু কেন? এ প্রশ্নকে সাবদা দেবী আব বিচাব কবে দেখেন নি। এটা তাব জীবনেব একটা সাধ, এই মাত্র।

সাবদা দেবীব কাছে এগিযে এসে দাঁড়ালো বাসন্তী। সারদা বুঝতে পাবলেন, এ নিশ্চয মাধুবী নয, কিন্তু এ কে? তাঁব মনেব ছবির মাধুরী পাঁচ বছবেব মধ্যে কি ঠিক এই রকমটি হযে উঠেছে? মাধুবী কি এই মেযেটিব চেযেও দেখতে সুন্দব হযেছে

সাবদা বললেন—তোমাকে তো চিনতে পাবলুম না গো।

বাসন্তী—আমি বাসু।

সারদা নিষ্পলক চোখে তাকিয়ে রইলেন। নামটা তবু যেন জানা-শোনা মনে হয়। একটা পুরাতন প্রতিধ্বনির ক্ষীণ আভাসের মত অস্পষ্ট স্মৃতির মধ্যে চেষ্টা করলে শুনতে পায়। কিন্তু এই মূর্তিটা একেবারে নতুন।

সারদা—কাদের বাসু? চিনলাম না।

বাসন্তী—আমি বাসন্তী।

সারদা—অজয়ের…

বাসন্তী—বোন।

সারদা—সে কি রে বাসু!

সারদা দেবী বিস্মিত হয়ে যেন একটা আনন্দধ্বনি করলেন। অজয়ের বোন বাসন্তীকে আজ পাঁচ বছরের মধ্যে সত্যিই একবারও দেখেন নি। কিন্তু পাচ বছর আগের বাসন্তীকে মনে পড়ে। ম্যালেরিয়ায় ভোগা কাঠির মত রোগা চেহারা। বোকা বোকা বিষণ্ণ একটা মূর্তি। গাঁয়ের মেয়েদের মধ্যে বাসন্তী একটা ধর্তব্যই ছিল না। লোকে জানতো, গরীব অজয়ের জীবনের দুশ্চিন্তাকে আরও তিক্ত করার জন্য এই একটা দায় অকারণে টিম্ টিম্ করতো। বাঁচবার আশা নেই, তবু মরেও না। বেচারা অজয়ের কপাল। এমনিতেই অজয়ের ভিটে-মাটি দেনা আর মামলার দায়ে বিকিয়ে যেতে বসেছে। তার ওপর এই রকমের একটি মড়া চেহারার ভগ্নীর বিয়ে দেবার দায়। সারদা দেবী বাসন্তীকে যেন বিশ্বাস করতে পারছিলেন না। বাসন্তী মনে মনে লজ্জিত হয়ে উঠছিল। সেই লজ্জান্বিত মুখের দিকে সারদা দেবী আরও মুগ্ধভাবে তাকিয়ে দেখছিলেন।

সারদা—তুই কবে অসুখ থেকে সেরে উঠলি রে বাসু ?

বাসন্তী—অনেকদিন হলো। প্রায় পাঁচ বছর।

সারদা—আর অসুখ হয়নি।

বাসন্তী—না।

সারদা—তুই তো মাধুরীর চেয়েও ছোট।

বাসন্তী—না জেঠীমা। আমিই দু'বছরের বড়।

সারদা উৎফুল্ল ভাবে মুক্তকণ্ঠে আশীর্বাদ করছিলেন—আহা! তোকে দেখে বড় ভাল লাগতো রে বাসু। বেঁচে থাক্। চিরজীবন নীরোগ থেকে ঐ সুন্দর মুখ নিয়ে বেঁচে থাক্ মা।

কিছুক্ষণের জন্য অন্যমনস্ক হয়ে পড়লো বাসন্তী। সারদা দেবী যদি এখুনি হঠাৎ জিজ্ঞাসা করে ফেলেন—কবে থেকে তুই সেরে উঠ্‌লি ? কার আশীর্বাদে ? কোন্ দেবতার কৃপায় ? বাসন্তী তা'হলে আর উত্তর দিতে পারবে না। এ প্রশ্নের উত্তর নেই, সেকথা সত্য নয়, কিন্তু জীবনে কারও কাছে এর উত্তর মুখ ফুটে ব্যক্ত করার মত দুঃসাহস নেই বাসন্তীর।

পাঁচ বছর আগেকার একটি রাত্রির কথা মনে পড়ে বাসন্তীর। অজয়দা ফিরে এলেন মীরগঞ্জ থেকে, অনেক রাত্রি করে। একটা কাঁথা গায়ে জড়িয়ে ঘরের মেঝেতে অন্ধকারে শুয়ে জ্বরের ঘোরে ছটফট করছিল বাসন্তী। অজয়দা ধরা গলায় বললেন—কেশবকে পার করে দিয়ে এলাম বাসু। পাঁচ বছর কয়েদ হয়ে গেল। কত চেষ্টা করলাম, কিছু হলো না।

কথাগুলি শুনেই বাসন্তী ধড়ফড়্ করে উঠে বসলো। জ্বরের জ্বালার চেয়েও একটা হঠাৎ বেদনার আঁচ যেন বাসন্তীর মনের গভীরে গিয়ে

লাগ্‌লো। যেন কিছু না বুঝতে পেরেই স্তব্ধ হয়ে রইল বাসন্তী। দু'চোখের কোণ থেকে কয়েকটা তপ্ত জলের ফোঁটা ঝরে পড়লো। তারপরেই চম্‌কে উঠেছিল, শিউরে উঠেছিল বাসন্তী। কিছু না বুঝতে পেরেই।

সেই দিন থেকে, ধীরে ধীরে এই অবোধ্য ঘটনার সব তাৎপর্যকে যেন বুঝতে পারলো বাসন্তী। ধুক্‌পুক্‌ রোগজীর্ণ জীবনের একটা মুহূর্তে, অস্থিসার দেহের বিষণ্ণ শোণিতকণিকার মধ্যে, অকারণ বেঁচে থাকার দুঃসহ ধৈর্যের মধ্যে কি এক অভিনব স্পর্শের সাড়া জেগে উঠলো। জীবনের বাতায়ন পথের মুখের যেন নিরেট একটা অনর্থকতার বাধা এঁটে ছিল, হঠাৎ চোখের জলে সেই বাধা সরে গেল। এক নতুন আলোকের মোহ ফুটে রয়েছে আকাশের গায়ে। এগিয়ে গিয়ে তাকে ধরবার সামর্থ্য নেই। এই নিভৃতে সীমানার মধ্যে আত্মগোপন করে দিনযামিনীর প্রতিমুহূর্তে তাকে ধ্যানের কাছে আহ্বান করতে হয়। বাসন্তী আজ নিজেই স্পষ্ট করে জানে, সেইদিন থেকে তার রোগের অভিশাপ যেন সভয়ে সরে গেছে। শোনা যায়, কোন পুণ্য লগ্নে তীর্থসলিলে স্নান করে কত হতাশ রোগীর রোগ ভয় ইহকালের মত দূর হয়ে গেছে। বাসন্তীও তাই মনে করে, নিজের জীবনের দিকে তাকিয়ে সে আজ অকুণ্ঠভাবে সে কথা বলতে পারে। কিন্তু কেউ যেন না শুনতে পায়, এ শুধু তার নিভৃতের রহস্য, তার একান্তের পাওয়া সত্য। সারদা জেঠীমা যতই বিস্মিত হোন্ আর প্রশ্ন করুন, বাসন্তী সেই আসল কথাটা কখনই বলতে পারবে না।

সারদা দেবীও আর কিছু বলবার মত কথা খুঁজে পাচ্ছিলেন না। যা হওয়ার ছিল না, পৃথিবীতে তাই যদি হয় এবং যা হওয়া উচিত, তা

যদি না হয়—তবে বিস্ময়ের কারণ আছে বৈকি। কেশবের অদৃষ্ট তাকে মাধুরীর কাছ থেকে দূরে সরিয়ে নিয়ে যাচ্ছে, এটা উচিত ছিল না। এটা নিয়মের ব্যতিক্রম। অজয়ের বোন বাসু এইভাবে অপরূপ হয়ে উঠবে এটাও ব্যতিক্রম। এতদিনে মাধুরীর এসে একবার দেখা করা উচিত ছিল, কিন্তু তা হয়নি। বাসন্তীকে কোনদিনই আশা করেন নি, বাসন্তীর আসবার কোন কারণ ছিল না, তবু সে এসেছে।

সারদা দেবীর চিন্তা এলোমেলো হয়ে যায়। এক একবার হঠাৎ মনের ভুলে ভেবে বসেন—মাধুরী দেরি করতে পারে, সে বড়লোকের মেয়ে, কলেজে পড়ে নতুন রকম হয়ে গেছে, বড়লোকের বাপের ইঙ্গিতও হয়তো আছে, তাই মাধুরী একবার আসতে পারেনি, কিন্তু জীবনের রীতিনীতি কারও মুখ চেয়ে দেরি করে না। বাসন্তী যেন সেই নিয়মের জোরেই না জেনে শুনে চলে এসেছে।

—ঘরের ভেতরে আয় বাসন্তী। সারদা দেবী বাসন্তীকে ঘরের ভেতর ডেকে নিয়ে চলেন।

আবার জিজ্ঞাসা করলেন—মাধুরী এখন কোথায় আছে ?

বাসন্তী—মীরগঞ্জে আছে।

সারদা দেবীর মুখটা আরও অনুজ্জ্বল হয়ে উঠলো।

বাসন্তী বললো—আপনি এত শুকিয়ে গেছেন কেন জেঠীমা ?

সারদা—বড় দুঃখে আছিরে বাসন্তী।

বাসন্তী—দুঃখে তো আমরাও রয়েছি।

সারদা দেবী হেসে ফেললেন। কি সুন্দর গুছিয়ে মিষ্টি মিষ্টি কথা বলেছে বাসু। এভাবে কথা বলতে কবে শিখলো। এই তুচ্ছ গেঁয়ো

মেয়েটা কোথা থেকে রূপ, গুণ, কথা ও হাসির মধ্যে এই সৌষ্ঠব কুড়িয়ে পেল ?

সারদা দেবী আবার মনের অজানিতে ভেবে ফেলেন—মাধুরী চলে গেছে, মাধুরীর বদলেই যেন বাসন্তী এসেছে।

সারদা দেবী বলেন—আমার দুঃখ তো আর ঢাকা নেই মা। সবই দেখতে পাচ্ছিস্। আর ক'দিন এভাবে বেঁচে থাকতে পারি বল ? জানি না কেশবের কপালে কোন্ কুগ্রহের দৃষ্টি লেগেছে। পাঁচ বছর ঘর ছাড়া হয়ে রইল। আবার এল যদি, দু'দিন না যেতেই চলে গেল। এভাবে আসবে আর চলে যাবে কেশব, আমি একা পড়ে আছি মিছিমিছি। এখনো শ্মশানে যাইনি, কিন্তু এই ঘর আমার কাছে শ্মশান হয়ে গেছে।

বাসন্তী—বেশি ভাব্‌বেন না জেঠীমা। অজয়দা গেছেন মীরগঞ্জে, এইবার কেশবদাকে গিয়ে ছাড়িয়ে আনবেন।

সারদা—বেশ তো। ছাড়িয়ে আনলেই কি সব হয়ে গেল, তারপর ?

বাসন্তী—তারপর কি ?

সারদা—তারপর কেশবকে ধরে রাখতে পারবি তো ? পারবি তো বাসন্তী ?

বাসন্তীর সারা মুখ রক্তিম হয়ে ওঠে। একথা শোনার জন্য বাসন্তী প্রস্তুত ছিল না। দাবির কথাই যেখানে ওঠে না, সেখানে এই উপহার চলে আসে কেন ? জীবনের এক অপ্রাপ্য স্বর্ণকে এক কথায় এত সস্তা করে দিল কি রকম বিদ্রূপের মত মনে হয়। ভয় করে, বুক দুর দুর করে। বাসন্তীর মাথা হেঁট হয়ে আসে। মনে মনে নিজেকেই ধিক্কার দেয়—এখানে আসা উচিত হয়নি তার।

সারদা দেবী বললেন—তুই কি বলতে পারবি বাসু, মাধুরী আর গাঁয়ে ফিরবে কি না ?

বাসন্তী—বোধ হয় না।

সারদা দেবী যেন একটু উদ্বিগ্ন হয়ে উঠলেন—তা'হলে কি করে হয় ?

বাসন্তী জিজ্ঞাসুর মত সারদা দেবীর দিকে তাকিয়ে রইল। সারদা বললেন—আইনে তো সবই ভেঙে গেল।

বাসন্তী—কি ভেঙে যাবে জেঠীমা ?

সারদা—এতদিন যা ভেবে এসেছিলাম, বিশ্বাস করেছিলাম, তা সবই ভুল হয়ে গেল।

বাসন্তী—মাধুরী, মাধুরীর বাবা, আর কেউ এ-গাঁয়ে ফিরবেন না। তাদের ফেরবার পথও বন্ধ হয়ে গেছে। ফিরে এসে থাকবার স্থানও নেই।

সারদা—কি হলো ?

বাসন্তী—কাল রাত্রে মাধুরীদের বাড়ি পুড়ে গেছে।

হা ভগবান! সারদা দেবী আবও অসহায়ের মত করুণ আক্ষেপ করে উঠলেন।

বাসন্তী—মাধুরীর সঙ্গে কেশবদার বিয়ে হবে, আপনি এই আশার কথাইতো বলছেন জেঠীমা ?

সারদা—হ্যাঁ, আমি ওদের দু'জনের মনের খবর জানি বলেই আশা করে আছি।

বাসন্তী—আপনি অনেক দিন আগের কথা বলছেন।

সারদা—হ্যাঁ।

বাসন্তী—পাঁচবছর আগেকার কথা।

সারদা—হ্যাঁ।

বাসন্তী—তারপর কেশবদার জেল হয়ে গেল, সঞ্জীববাবু বড়লোক হয়ে গেলেন, মাধুরী কলেজে পড়লো, স্বদেশী মেয়ে হয়ে উঠলো…।

সারদা—তুই তো সব খবর জানিস্ দেখছি।

বাসন্তী—এত ঘটনা ঘটে গেল, তাই ভয় হয় আপনার আশার কথাটাও এখনো ঠিক আছে কি না।

সারদা—তুই কি ভয় করছিস্?

বাসন্তী—ওদের দু'জনের যে মনের কথা আপনি বলছেন, পাঁচ বছর আগে যা ছিল, পাঁচ বছর পরে ঠিক তাই আছে কি না কে জানে।

সারদ—কিন্তু কেশবের কথা আমি জানি, আমি স্বচক্ষে আবার দেখলাম, পাঁচ বছর পরে ফিরে এসেও…।

একটু থেমে নিয়েই সারদা বলেন—মাধুরীর কথা আজও কেশব ভাবে। সত্যি কথা বলবো কি, আমার একবার সন্দেহও হয়েছিল, ভেবে ভেবে মাথা খারাপ হবার লক্ষণ দেখা দিয়েছিল।

বাসন্তীর চোখের দৃষ্টি ধীরে ধীরে প্রখর হয়ে উঠছিল। কেশবদা আজও পাঁচ বছর আগেকার স্বপ্নে ডুবে আছেন। সারদা জেঠীমা পাঁচ বছর আগেকার বিশ্বাস নিয়েই পড়ে আছেন। এই বিশ্বাসের ছলনায় দু'জনেই আজ এক ভয়ানক প্রবঞ্চনার সম্মুখে এসে দাঁড়িয়েছেন। দু'জনেই ঠকবেন। সঞ্জীববাবুকে ও মাধুরীকে এরা আজ সবচেয়ে বেশি ভুল করে বুঝেছেন।

বাসন্তী বললে—আপনি পরিতোষবাবুকে চেনেন?

সারদা—কোন পরিতোষ? ওবাড়ির নন্দ'র ভাগ্নে হয়, বিলেত গেল পড়তে, সেই ছেলেটি?

বাসন্তী—হ্যাঁ, সে ফিরে এসেছে।

সারদা—ছেলেটি কেমন রে বাসু ?

বাসন্তী—খুব ভদ্রলোক।

সারদা—তুই তাকে দেখেছিস্ ?

বাসন্তী—হ্যাঁ, কালই তিনি এখানে এসেছিলেন।

সারদা—মাধুবীর বাপ ছেলেটিকে খুব ভালবাসে।

বাসন্তী—আপনি সে খবর জানেন তা'হলে।

সারদা—জানি বৈকি। সবই জানি। কিন্তু মাধুরী সেরকম মেয়ে নয়।

বাসন্তী—কিন্তু মাধুরীর বাবাকে হযতো আপনি ভাল করে চেনেন না ? মাধুবীর বাবার ইচ্ছে…।

সারদা দেবী হেসে ফেললেন। শুষ্ক বেদনার্ত মুখটা হঠাৎ এক মর্মান্তিক উজ্জ্বলতায় সজীব হয়ে উঠলো। সারদা দেবী অনুযোগের সুরে বললেন—তুই থাম্ বাসু। মাধুরীর বাবাকে আমি চিনি, ভাল করেই চিনি, তাঁর ইচ্ছেও জানি।

বাসন্তী যেন বিস্মিত সন্দিগ্ধভাবে সারদা দেবীর কথাগুলির তাৎপর্য লক্ষ্য করছিল। কিছুক্ষণ আগে সারদা দেবীর কথায় যে ইঙ্গিত এত স্পষ্ট হয়ে উঠেছিল, কিছুক্ষণের মধ্যেই যেন তিনি ইচ্ছে করে সে সব উল্টে দিচ্ছেন। মনের সহজ প্রসন্নতার আবেগে কিছুক্ষণ আগে যে কথা বলছিলেন, হঠাৎ কোথা থেকে গোপন এক চিন্তার বাধা সেই কথারই প্রতিবাদ করছে। কেশব এবার ফিরে আসলে, আর যেন তাকে চলে যেতে না হয়, তাকে ধরে রাখতে হবে—সারদা দেবী মুহূর্তের আবেগে বাসন্তীর মুখের দিকে সুস্থভাবে তাকিয়ে এই অনুরোধ

করেছিলেন, কিন্তু তার পরেই নিষ্ঠুরভাবে সেই অনুরোধকে মিথ্যে করে দিচ্ছেন।

বাসন্তী আজ জোর করে নিজেকে নির্লজ্জ ও মুখরা করে তোলে। এর জন্য সে প্রস্তুত হয়ে এসেছে। তার মনের গভীরে এক অতি কূট ষড়যন্ত্রের অঙ্কুর লুকিয়ে আছে। আর একটা ষড়যন্ত্রকে ব্যর্থ করার জন্যই এই ষড়যন্ত্র।

বাসন্তী তার অধৈর্য, অস্থিরতা ও দুঃসাহসের জন্যও লজ্জিত নয়। এ কাজ তাকে করতেই হবে। এর জন্য যদি নিজেকে হিংসুক বলেও মনে করতে হয়, তার জন্যও প্রস্তুত বাসন্তী। প্রকাণ্ড একটা অনিয়মের অহংকারকে চূর্ণ করে দিয়ে যাবে বাসন্তী। মাধুরীর মত মেয়ের মনের কোন দাবি নেই। কোন মোহকে বুকের নিঃশ্বাসের মত আপন করে রাখতে জানে না মাধুরীরা। পৃথিবীটা ওদের কাছে খেলা ঘরের মত, যখন যাকে ভাল লাগছে, তার সঙ্গে অনুরাগের এক অভিনয় করে ওরা সরে পড়ে। তবু মাধুরীর দাবিই আজ সব চেয়ে বড়। সারদা দেবী মুক্তকণ্ঠে সেই কথা ঘোষণা করছেন, কেশবের মনেও সেই স্বপ্ন গেঁথে আছে। অথচ, বাসন্তী একবার যেন দৃষ্টি ফিরিয়ে নিয়ে নিজের জীবনের দিকে তাকায়। তার জীবনের সকল নিষ্ঠা আগ্রহ ও মোহ দিয়ে তৈরি সবাকার অবহেলায় ঘেরা হয়ে আছে। আজও কেউ সেই ধ্বনি শুনতে পেল না। চিরকালের মতই এই কামনা নীরব হয়ে থাকবে, কখনো দাবি সৃষ্টি করতে পারবে না। যদি দাবি করেও, সবাকার উপহাসে সে দাবি ধিক্কৃত হয়ে নিঃশেষে নিজের অপমানে লুপ্ত হয়ে যাবে।

বাসন্তী বললো—আপনি নিশ্চয় জানেন না জেঠীমা, মাধুরীর বাবা পরিতোষের সঙ্গে মাধুরীর বিয়ে দিতে চান।

সারদা—ওটা তাঁব অভিমান।

বাসন্তীর বাচালতা স্তব্ধ হযে এল, বোকাব মত অর্থহীন উদাস দৃষ্টি নিযে সাবদা দেবীব দিকে তাকিযে বইল বাসন্তী।

সারদা দেবী বললেন—আমি স্পষ্ট জানি, তিনি সব জেনে শুনে যেন আমাকে ভয দেখাচ্ছেন।

বাসন্তীব দৃষ্টির মূঢ়তা যেন সাবদা দেবীর রহস্যভবা কথাব ছোযায আবও গভীব হযে উঠলো।

সাবদা দেবী যেন নিজের জীবনেব অন্তর্লোকেব এক দুর বেদনাব দিকে তাকিযে এক কাহিনী পড়ে শোনাচ্ছেন—যাতে আমি তাঁকে গিযে একবাব অনুবোধ কবি, এইটুকুব জন্যেই তিনি এত কাণ্ড করছেন। ধন্যি মানুষেব অভিমান। এক যুগ কেটে গেলেও যেন শান্ত হতে চায না।

সাবদা দেবী কিছুক্ষণেব মত একেবারে চুপ কবে বইলেন। বিস্মযে অপ্রস্তুত হযেও, বাসন্তী সাবদা দেবীব মুখেব এই ক্ষণিক বর্ণোচ্ছ্বাসেব ইঙ্গিত বুঝতে পাবছিল। হেঁযালিব চেযেও জটিল ও অবাস্তব মনে হয। কিন্তু বিশ্বাস না কবে উপায নেই। এক অতি পুরাতন দিনেব বনানীর বর্ণছাযা-সৌবভেব ইতিহাস স্তব্ধ হযে গেছে, কিন্তু তাব ঝড়টুকু আজও যেন রযে গেছে প্রতি নিঃশ্বাসেব আড়ালে। সাবদা দেবীব কথায কথায তাবই সাড়া ফুটে উঠছে।

সাবদা দেবী বললেন—কিন্তু আমি অনুবোধ কবতে পাববো না। কোন দিন পাবিনি, আজ তো শ্মশানে যাবাব সময ঘনিযে গেল, আর কেন?

বাসন্তীর কাছে হেঁয়ালি ক্রমেই স্বাদু হয়ে উঠছে। জীবনে এ ধরণের কাহিনী এই প্রথম শুনলো বাসন্তী। এক পরম বিচিত্রতার আস্বাদ আছে এই কাহিনীতে। জীবনের ধর্মের একটি সব চেয়ে বড় রহস্যে ভরা সত্যের আশ্বাস আছে এই কাহিনীর মধ্যে। বাসন্তীর বিহ্বল ও বিব্রত চিন্তার মধ্যে এক নূতন শান্তির প্রসাদ ছড়িয়ে পড়ে। চাঁদ ডুবে গেলেও তার জ্যোৎস্না যদি গাছের পাতায় লেগে থাকে, কী সুন্দর সেই দৃশ্য! কে জানে কবে সারদা দেবীর জীবনে এক আকাঙ্ক্ষিত পূর্ণিমা দেখা দিয়েই মিলিয়ে গেছে, কিন্তু সেই আলোকের বন্ধন আজও তাঁকে জড়িয়ে আছে। কে জানে কবে সঞ্জীববাবু জীবনের আকাশের এক ক্ষণিক রামধনুর উদয় দেখতে পেয়েছিলেন, আজও তাঁর সেই দেখার তৃষ্ণা মিটে যায়নি। জীবনের আঙিনায় এই হেলাফেলা খেলা করার নুড়িকেই কবে যে কখন মুক্তা মনে করে বসে, তার ঠিক নেই।

সারদা দেবী বললেন—সঞ্জীববাবু লোকটি চিরদিনই অভিমানী। বড় ভীতু মানুষ।

বাসন্তী—কিন্তু এখন তিনি আর মোটেই ভীতু মানুষ নন। তিনি বড়লোক হয়ে গেছেন। তিনি এখন আপনার বাড়িতে আগুন লাগাতে পারেন।

সারদা—তুই দেখছি খুব রেগেছিস্ বাসু, কেন বলতো ?

বাসন্তী হঠাৎ লজ্জিত হয়ে পড়লো।

সারদা বললেন—মাধুরীর বাবাকে মোটেই ভয় করি না। ভয় হয় মাধুরীকে। কি জানি, যদি মতিগতি বদলে গিয়ে থাকে, হালফ্যাসনের মেয়ে, কে জানে কি হয় শেষ পর্যন্ত।

বাসন্তী—আপনার কাছে একটা কথা বলতে এসেছিলাম জেঠীমা। রাগের কথা নয়।

সারদা—বল।

বাসন্তী—কেশবদার ওপর মাধুরীর বাবার রাগ আছে।

সারদা—থাকতে পারে।

বাসন্তী—তাই তিনি শেষ পর্যন্ত মাধুরীকে দিয়েই কেশবদাকে অপমান করাবেন।

সারদা—সে কি করে হয়? কেশবের মনের কথা কি মাধুরী জানে না?

বাসন্তী—সেইজন্যই ওঁদের সুবিধে হয়েছে।

সারদা—কিন্তু এতে তাঁদের কি লাভ হবে?

বাসন্তী—তা জানি না। কেশবদার জীবনের একটা দাবি ব্যর্থ হয়ে যাক্, তিনি তাই চাইছেন। এ ছাড়া এত শত্রুতা করার আর কি কারণ হতে পারে?

সারদা দেবীর মুখটা হঠাৎ কালো হয়ে উঠলো।—তুই ছেলেমানুষের মত কথা বলছিস্ বাসু, তবু তোর কথাগুলি একেবারে মিথ্যে নয়। কি জানি কেন এত শত্রুতা!

একটু থেমে নিয়ে যেন শোকাহত সুরে সারদা দেবী বললেন—বুঝেছি এইভাবেই তিনি শিক্ষা দিতে চান। নিজে যেভাবে ভুলেছেন, কেশবের ওপর তারি প্রতিশোধ নিয়ে তিনি বোধ হয় খুশি হতে চান।

সারদা দেবীর শুকনো বিমর্ষ ও ভীত চেহারা হঠাৎ বদলে গেল। বাসন্তীর হাত ধরে যেন অনুরোধ করলেন—তুই সত্যি খুব চালাক মেয়ে বাসু। তোকে একটা কাজ করতে হবে।

অনুরোধ নয়, সারদা দেবীর ভাষা ভঙ্গী ও আবেগ, সবই যেন হঠাৎ একটা ষড়যন্ত্রের মত হয়ে গেছে। বাসন্তী যেন এই ষড়যন্ত্রের অপর একটি আসামীর মত নির্দেশ নেবার জন্য প্রস্তুত হয়েই ছিল।

সারদা দেবী বললেন—কেশব ফিরে আসবার পর, সব ব্যাপার কেশবকে বুঝিয়ে বল্‌তে হবে।

বাসন্তী—বলবেন।

সারদা দেবী বাসন্তীর হাতদুটো ধরে একটু আদরের ভঙ্গীতে নাড়া দিয়ে বললেন—আমি আবার এসব কথা কেশবকে বলবো কি রে? সব তুই বল্‌বি।

বাসন্তী ভয়ার্তের মত বিচলিত হযে বললো—না জেঠীমা, আমি বলতে পারবো না। আমি বললে সব ভুল হযে যাবে।

সঞ্জীববাবু যেন ভীতভাবে ডাকছিলেন—মাধুরী, মাধুরী।

আকাশের গাযে মাত্র বিকালের আমেজ লেগেছে। মধ্যাহ্নের জ্বালা ফুরিযে আসছে। আদালত থেকে অসময়ে ঘরে ফিরেছেন সঞ্জীববাবু। এত বড় নামকরা উকীল সঞ্জীববাবু, বহু মামলা জয করেছেন। হেরে গেলেও কোনদিন বিচলিত হননি, হেরেছেনও কদাচিৎ, কিন্তু আজ তার গলার স্বর অন্য রকমের। যেখানে জয সুনিশ্চিত ছিল, হেরে যাবার কোন আশঙ্কাই ছিল না, এই ধরণেরই একটি বড় মামলায যেন চরমভাবে পরাজয স্বীকার করে নিযে শ্রান্ত ক্লান্ত ও উদ্‌ভ্রান্ত হযে ঘরে ফিরেছেন।

মাধুরী কাছে এসে দাঁড়িযেছে সেদিকেও ভ্রূক্ষেপ করলেন না সঞ্জীববাবু। নিজের মনেই বলে চললেন—আর এখানে নয! সব দিক

বন্ধ হয়ে গেল। না, ঠিক বন্ধ হয়ে যায়নি, সব দিক ফুরিয়ে গেল। আর এগিয়ে যাবার রাস্তা নেই। এখন ঝুলিঝোলা তুলে সরে পড়তে হবে। এইবার সময় এসে গেছে মাধুরী, চল্ মুশৌরী চলে যাই।

মাধুরী আশ্চর্য হলো—হঠাৎ মুশৌরী?

সঞ্জীববাবু—হ্যাঁ, আর কোন মানে হয় না। মুশৌরী অনেক দূর, তাই সেখানে যাচ্ছি। কাছাকাছিও থাকতে চাই না।

মাধুরী—কেন বাবা?

সঞ্জীববাবু—কাছাকাছি থাকলে সব শুনতে পাব। সব কথা কানে আসবে। এমন জায়গায় চলে যেতে চাই, যেখান থেকে ইচ্ছে করলেও চট্ করে আসতে পারবো না। অর্থাৎ যেন আর ফিরতে না হয়।

মাধুরীর মুখ ভয়ে বিবর্ণ হয়ে উঠছিল,—কি ব্যাপার হলো, কিছু বুঝতে পারছি না।

সঞ্জীববাবু—আমার প্ল্যান ভেঙে গেল মাধুরী, আমার জীবনের প্ল্যান।

আর কোন প্রশ্ন করলো না মাধুরী। প্রশ্ন করে লাভ নেই। বাঁধ ভেঙে গেছে, এই জলোচ্ছ্বাস নিজের ভাষাতেই তার শোক, বেদনা ও হর্ষকে প্রতিধ্বনিত করবে। যা প্রশ্নেরও অতিরিক্ত, তারও উত্তর এই উদ্‌ভ্রান্ত বিলাপের মধ্যে নিজের থেকেই ফুটে উঠছে। প্রশ্ন করে আর লাভ নেই।

সঞ্জীববাবুও তাই করলেন। কিছুক্ষণ একেবারে স্তব্ধ হয়ে রইলেন। মনের গভীরে তলিয়ে গিয়ে ডুবুরীর মত হাত্‌ড়ে যেন বহু হারানো রত্নের কণিকা খুঁজে বেড়ালেন। হাতের মুঠোয় যা উঠে আসছে, কিছুক্ষণের জন্য তারই দিকে তাকিয়ে থাকছেন। তার পরেই বুঝতে পারছেন—

কিছুই নয, কিছুই নয়। সব ফাঁকি, সব ফাঁকা। শুধু এক মুঠো মূল্যহীন বালুকণা। এর বেশি কিছু আর পাওযা গেল না। সারা-জীবনের কামনার স্বপ্ন, সেই শুক্তি আর খুঁজে পাওযা যাবে না। কাছে থেকেও সে হারিযে গেছে চিরকালের মত।

সঞ্জীববাবু অনেকক্ষণ পরে বললেন—কেশব আজ ছাড়া পেযেছে। গাঁয়ে ফিরে গেছে।

চমকে উঠলো মাধুরী। অপ্রত্যাশিত আনন্দের জন্য নয, এটা যেন একটা আকস্মিক আঘাত। এটাই আজ তার জীবনে একটা রূঢ় সত্য। অমিয় গরল হযে গেছে, সূর্যোদয দেখলে যেন আজ চোখে ঘুম নেমে আসে মাধুরীর। জীবনে এত ক্ষয-ক্ষতি, চিন্তা-ভাবনা, আগ্রহ ও আবেগের মূল্যে যে সত্য কেনা হযেছিল, আজ সেটা নিছক লোকসান হযে দাঁড়িযেছে। কেশবের মুক্তি সংবাদে মাধুরীকে তাই চমকে উঠতে হয।

সঞ্জীববাবু—ওরা তিনজনেই একসঙ্গে গাঁযে ফিরেছে—কেশব, পরিতোষ আর অজয।

প্রত্যেকটি উচ্চারিত কথার ধ্বনিকে যেন মনে মনে একবার বন্দী করে ধরে মাধুরী। মুহূর্তের মত নামগুলি এক এক করে যেন মূর্তি ধরে তার চোখের সম্মুখে দাঁড়ায। কেশব, পরিতোষ, অজয।

কেশব, এই নামের পরীক্ষা যেন সম্পূর্ণ হযে গেছে, এ নাম মোটেই দুর্জ্ঞেয় নয, একেবারে রহস্যহীন অতি-পরিচিত। তাকে জানা হযে গেছে। তার প্রতিটি নিঃশ্বাসকে মাধুরী চেনে, তার জীবনের প্রত্যেকটি আলোকের কলরবের মর্ম মাধুরীর কাছে একেবারে স্পষ্ট, মান্দার গাঁযের দীঘির একেবারে স্পষ্ট। মান্দার গাঁযের দীঘির জলের পদ্মগুলির মত।

খুবই সুন্দব, কিন্তু বড় পরিচিত। অনেক দিন ধবে, শত সহস্রবার তাব দিকে তাকানো হযেছে। আর নতুন করে দেখবাব মত কিছু নেই। কেশব যা ছিল তাই আছে, সেই দীঘিব জলপদ্মের মত। তাকে দেখবার নেশা ক্রমেই যেন নিবাস্বাদ হযে গেছে।

পবিতোষ, এ নামেব অর্থ মাধুবীব নিজেবই সৃষ্টি। পরিতোষ মাধুরীব কাছে এগিযে যাযনি, মাধুবী তাকে কাছে ডেকে এনেছে ইচ্ছে কবে। পরিতোষ বিলেত গিযেছিল নিছক পড়াশুনা করাব জন্যেই। মাধুরী ইচ্ছে কবেই পবিতোযেব প্রবাস-জীবনেব মুহূর্তগুলিব মধ্যে বিবহেব বেদনার স্পর্শ এনে দিযেছিল। যেখানে ভালবাসাব কথাই উঠতে পাবে না, মাধুবী সেই শূন্যতাব শান্তিকে অবীব কবে দিযেছিল ভালবাসাব কথা তুলে। এই অনুবাগেব আলপনা মাধুবীব নিজেব চেষ্টায, নিজেব খেযালে, নিজেব হাতে আঁকা। নিজেব ইচ্ছামত বঙ দিযে এঁকেছে। এব মধ্যে পবিতোষেব কোন হাত ছিল না, সেই বীতিনীতি তাব জানা নেই, এত দুঃসাহসও তাব ছিল না। সঞ্জীববাবুব উপকাবে শুধু কৃতজ্ঞ থাকবাব জন্য পবিতোষ প্রস্তুত হযেছিল। সেই কৃতজ্ঞতাকেই সোনাব শিকল দিযে মাধুবী বন্দী কবে ফেলেছিল।

পবিতোষেব দাবিব মূল্য কতটুকু? সে তো মাধুবীব হাতেব কৌশলে তৈবী একটি কৃত্রিম ফোযাবা। আজ যদি সে এক উৎসেব গর্ব নিযে মাধুবীব জীবনে নদী হবাব দাবি কবে, কী হাস্যকব সেই দাবি!

অজযদাও গাঁযে চলে গেছে। মাধুবীব চিন্তাব অহংকাবগুলি যেন এইখানে এসে হঠাৎ মাথায আঘাত পায, মাথা হেঁট হযে যায।

আজ সবচেযে বহস্যময মনে হয এই মানুষটিকে—অজযদা। নিজেবই সৃষ্টি, এক অদ্ভুত পৃথিবীতে অজযদা যেন একা একা ঘুবে বেড়াচ্ছেন।

সেখানে তিনি কারও সাহায্যের প্রার্থী নন। তাঁর দাবি আজ পর্যন্ত কেউ শুনতে পায়নি। পরিতোষের কথা যদি বিশ্বাস করা যায়, তবে একথাও বিশ্বাস করতে হয়—কী বিচিত্র অজয়দার এই পৃথিবী! এক স্বপ্নচারিণীর রূপে মাধুরীকে সেই পৃথিবীতে ঘুরে বেড়াবার অবকাশ দিয়েছেন অজয়দা। আর কাউকে নয়। একথা বিশ্বাস করতেও যে এত গর্ব ছিল, তা মাধুরী জানতো না। আজ সবই বুঝা যায়। আরও জানতে, চিনতে ও দেখতে লোভ হয়। বিনা উপকারে, বিনা আবদারে, বিনা প্রলোভনে কেউ কারও জন্য সর্বস্ব দিয়ে আড়ালে একটা স্বর্গ রচনা করে রাখবে, জীবনে এতখানি গৌরব আশা করা যায় না। তবু মাধুরী জানে, অজয়দা সেই অসম্ভব ও অবাস্তবকে একেবারে সত্য করে রেখেছে। জীবন ধন্য হয়ে যাবার মত এই উপহার।

সঞ্জীববাবু—আর দেরি করবো না মাধুরী। ক'দিনের মধ্যেই সব গুছিয়ে নিতে হবে।

মাধুরী—একটা কথা ছিল।

সঞ্জীববাবু—না, আর কোন কথা থাকতে পারে না। কেশবের হাতে আমি তোমাকে বিলিয়ে দিতে পারবো না।

মাধুরী—না, সেকথা নয়।

সঞ্জীববাবু—তবে আর কি ?

মাধুরী—আমার আশ্চর্য লাগছে, তুমি এত ঘাবড়ে যাচ্ছ কেন। গাঁয়ের লোকেরা তোমাকে সম্মান করতে পারলো না, সব দিক দিয়ে শত্রুতা করলো, এর জন্য এত কি ভাববার আছে ?

সঞ্জীববাবু—ঠিক কথা। আর ভাববো না। এইবার সব চুকিয়ে দেব। শুধু একটা শিক্ষা রেখে যাব···।

সঞ্জীববাবুর এত বিষণ্ণ ও করুণ চেহারাও মুহূর্তের মধ্যে কঠোর হয়ে উঠলো। এখনো যেন একটা শেষ প্রতিশোধের সঙ্কল্পকে হাতের কাছে পুষে রেখেছেন।

নিজে থেকেই বেসামাল হয়ে বলে ফেললেন সঞ্জীববাবু—ঐ পুরুত ছোঁড়া আমার ওপর টেক্কা দিতে এসেছিল। বাপের গুণ পেয়েছিল। তার মাতৃদেবীও এ বিষয়ে তাকে চিরকাল নাই দিয়েছে। সব ভেঙ্গে দিয়ে চলে যাব।

সঞ্জীববাবু আক্রোশ বর্বরের প্রতিহিংসার মত নির্লজ্জ হয়ে উঠলো—সঞ্জীব উকিলের মেয়েকে বিয়ে করবে সারদার ছেলে? সারদা এই আলোক মনে মনে জপছে সারা জীবন ধরে। এই আলোক চূর্ণ হবে। সারদাকে আমি ক্ষমা করতে পারি না।

মাধুরীর মাথা হেঁট হয়ে এল।

সঞ্জীববাবু এঘর ওঘর পায়চারি করে বেড়ালেন। আজ সব দিক দিয়ে হেরে গিয়ে শুধু শেষ প্রতিহিংসার আঘাত দিয়ে সরে পড়তে চান। মাধুরীর মনে হয়—আজ সত্যি করে জেঠীমার ঘরে আগুন লাগাবার জন্য প্রস্তুত হয়েছেন সঞ্জীববাবু। কেশবকে ব্যর্থ করে দিয়ে, অনুরাগের প্রতিশ্রুতির ধর্মকে বাতিল করে দিয়ে, সারদা জেঠীমার সম্মুখে একটা প্রায়শ্চিত্তের অগ্নিকুণ্ড রেখে দিয়ে সঞ্জীববাবু চলে যাবেন। এর বেশি আর কিছু করতে চান না।

মাধুরী বললো—কিন্তু গাঁয়ের মানুষকে তুমি এখনো চিনতে পারনি বাবা।

সঞ্জীববাবু—কি বললি?

মাধুরী—তুমি যা করছো, তা'তে কেশবদার কোন ক্ষতি হবে না। তারা বড় বেশি চালাক বাবা।

সঞ্জীববাবু—কি চালাকি করেছে?

মাধুরী—কেশবদা এইবার খুশি হয়েই গাঁয়ে থাকবে। আরও বেশি খুশি হবে এই কথা শুনে যে, আমাদের বাড়ি পুড়ে গেছে, আমরা আর গাঁয়ে ফিরবো না।

সঞ্জীববাবু—তা কি করে হয়। অন্ততঃ তোকে তো সে আজও ।

মাধুরী—মোটেই না। সেই সব নিয়ম উল্টে গেছে। গাঁয়ের লোক বোকা নয়।

সঞ্জীববাবু উত্তেজিত হয়ে উঠলেন—কিছুই বুঝতে পারছি না।

মধুরী—যদি কয়েকদিনের মধ্যেই শুনতে পান যে, কেশবদার বিয়ে হয়ে গেছে।

সঞ্জীববাবু—বিয়ে? কার সঙ্গে?

মাধুরী—ঐ গাঁয়েরই একটি মেয়ের সঙ্গে।

সঞ্জীববাবু—এও কি সম্ভব?

মাধুরী—কেন সম্ভব নয়?

সঞ্জীববাবু—ঠিক বলেছিস্। কেন সম্ভব হবে না। এ তো নতুন কিছু নয়, এ-রকম আরও হয়েছে। নতুন

সঞ্জীববাবু নিজের মনে যেই হারিয়ে বিড়বিড় করতে লাগলেন। ধীরে ধীরে অবসন্ন হয়ে আসতে লাগলেন। সব পথ সত্যিই নিঃশেষ হয়ে গেছে। আর কিছু করবার নেই, সময় বুঝে সবাই বদলে গেছে তপস্যা করা জীবনের রীতি নয়। সারদা সাবধান হয়ে গেছে, কেশবও প্রস্তুত হয়েছে। সত্যি ওরা বড় চালাক।

সঞ্জীববাবু—তা'হলে তো সবই পরিষ্কার হয়ে গেল মাধুরী। আর দুঃখ করার কিছু নেই।

মাধুরী—আর রাগ করারও কিছু নেই।

সঞ্জীববাবু—হ্যাঁ, আর অপমানেরও কিছু নেই।

মাধুরী—এখন আমরা অনায়াসে গাঁয়ে গিয়ে থাকতে পারি।

সঞ্জীববাবু বোকার মত তাকিয়ে রইলেন, যেন আর্তনাদ করলেন—আবার?

মাধুরী হেসে ফেললো—এত ভয় পাবার কোন দরকার নেই বাবা। গাঁয়ের কারও সঙ্গে আমাদের কোন সম্পর্ক নেই। আমরা সবারই পর হয়ে থাকবো।

সবারই পর হয়ে থাকবো—কথাটা যত সহজে মাধুরী বলতে পারে, সঞ্জীববাবু তত সহজে বুঝে উঠতে পারে না, এই পর হয়ে থাকার শাস্তি ও অপমান থেকে উদ্ধার পাওয়ার জন্য তিনি গাঁয়ের মায়া ছাড়তে পেরেছিলেন। কাউকে আপন-করে পাওয়ার স্বপ্ন যেখানে নেই, সেখানে থেকেই বা লাভ কি? বহুদিন ধরে, বহু ধৈর্যে, বহু কষ্ট-দৈন্য স্বীকার করে সঞ্জীববাবু গ্রামের মাটির এক দুরাশাকে আঁকড়ে পরেছিলেন। এভাবে পড়ে থাকার মধ্যেই একটা মোহ ছিল। সকল আকাঙ্ক্ষার এপারেই সে দাঁড়িয়েছে, কিন্তু তবু তাকে নিকটে পাওয়া যায় না—এ এক অদ্ভুত অস্তিত্ব। যদি মাঝখানে একটা দুস্তর ব্যবধান সৃষ্টি করে সে চিরকালের মত ওপারের রহস্যে অস্পষ্ট হয়ে যেত, তবে জীবনের এই অস্থিরতার একটা সমাপ্তি খুঁজে পাওয়া যেত। কিন্তু তা হয়নি। সারদা আজও মান্দার গাঁয়ে রয়েছে, সঞ্জীববাবুও গেঁয়ো হয়েছিলেন, দুরাশার শেষ ইঙ্গিতটুকু দেখা পর্যন্ত। তাঁর আঙিনার

চারদিকে তার পদধ্বনির রেশ শোনা যায়, কিন্তু এই আঙিনার ভেতরে সে কোনদিন আসবে না। এই সামান্য সত্যের নিয়মটুকু যেদিন বুঝতে পারলেন, সেদিন আর এক মুহূর্ত দেরি করেননি সঞ্জীববাবু।

কিন্তু আজ আবার মাধুরী তাঁকে সেই নির্বাসনের ভূমিতেই ফিরে যেতে অনুরোধ করছে। জীবনব্যাপী একটা সংগ্রামের গর্ব আজ আসন্ন হয়ে গেছে, সব দিক দিযে পবাজয স্পষ্ট হযে উঠেছে। আজ আর কখনই উচিত নয়। সারদার নিষ্ঠুব অহংকারের কাছে গিযে একেবারে মাথা হেঁট করে ভিখিরী হযে যাওযার কোন অর্থ হয় না। তাছাড়া, মাধুরীই বা এত সাহস করে কেন? কি আছে সেখানে? জীবনে এত হঠাৎ, এত ভযানক ভাবে ঠকে গেল মাধুরী, তবু ওর শিক্ষা হয় না।

সঞ্জীববাবু বললেন—কিন্তু তোব দিন কাটবে কি করে?

মাধুরী—যেভাবে তোমার দিন কেটে যাবে, আমাবও সেইভাবে কাটবে।

সঞ্জীববাবু—না বুঝে কোন কথা বলিস না মাধুরী। আমার মতন করে দিন যেন কারও না কাটে।

মাধুরী—আমি সব বুঝেই বলছি বাবা। আমারও দিন কেটে যাবে।

সঞ্জীববাবু ছটফট করে উঠলেন, কিন্তু সে যে তোর পক্ষে ভযানক শাস্তি। এ শাস্তি সইবার দরকাব কি?

এই প্রশ্নের উত্তর মাধুরীর মনের মধ্যেই গুঞ্জরণ সৃষ্টি করে, ভাষায় প্রকাশ হতে চায় না। শান্তি না শূন্যতা—ঠিক অনুমান করে উঠতে পারে না মাধুরী। তবু এই পথই সে আজ বেছে নিচ্ছে। যাদের কাছে তার দাবি ছিল, তাদের সঙ্গে কথা বলাব পালা ফুরিয়ে গেছে। সেই ব্রত সাঙ্গ হযে গেছে। তার সঙ্গে সঙ্গে যত ভুল, গ্লানি ও বেদনার সমাপ্তি

হোক্। শুধু থেকে যায় একখানি অজ্ঞাত পৃথিবীর আবেদন। নিজেরই গোপনীয়তায় সেই পৃথিবী অলীক হয়ে রয়েছে। বোধ হয় চিরকাল অলীক হয়েই থাকবে। অজয়দার মুখের ভাষায় তার তিলমাত্র আভাসও কোন দিন ফুটে উঠবে না।

ক্ষতি কি? এই নতুন পৃথিবীর ধ্যানে, নীরবে এক এক করে যদি দিন কেটে যায়, ক্ষতি কি?

সারদা বললেন—আর এখানে নয় রে কেশব। এ গাঁয়ে থাকলে তোর সর্বনাশ হবে।

কেশব—আমিও তাই ঠিক করেছি।

সারদা—তবুও তুই আর একবার ভাল করে ভেবে দেখ। আমার দোষ দিস্ না।

কেশব হেসে ফেললে—আমি সব ভেবে দেখিছি। ভাবনা শেষ হয়ে গেছে। তুমি যা ভেবে ভয় করছো, তার আর কোন মানে হয় না।

সারদা—মাধুরীরা ফিরে এসেছে, শুনেছিস্?

কেশব—হ্যাঁ।

সারদা—তবে?

কেশব—তা'তে কিছুই আসে যায় না। ওরা নিজের খেয়ালে চিরকাল এভাবে আসবে আর যাবে, তার জন্য আমরা এভাবে পড়ে থাকতে পারি না।

সারদার চোখ দুটো অকারণে সজল হয়ে উঠেছিল—এতটা ভাবতে পারেনি। সব যেন কেমন গোলমাল হয়ে গেল। কি ভেবেছিলাম, আর কি হলো!

কেশব—আমরা বেঁচে গেলাম মা।

সারদা—হয়তো তাই। সবাই বাঁচতে চায়, কেউ কাউকে বাঁচাতে চায় না।

কেশব—ক'টা দিন দেরি করতে হবে মা।

সারদা—কেন?

কেশব—অজয়ের অনুরোধ। বাসন্তীর বিয়েটা চুকে যাক্।

সারদা একটু আশ্চর্য হলেন—বাসন্তীর বিয়ে?

কেশব যেন মনের ভেতর একটা বিষণ্ণকর বেদনাকে জোর করে একপাশে সরিয়ে রেখে ক্লান্তভাবে উত্তর দিল—হ্যাঁ, সব ঠিক হয়ে গেছে।

সারদা কিছুক্ষণ কেশবের মুখের দিকে তাকিয়ে রইলেন। তারপর বললেন—একটা কথা আমার মনে হয়েছিল কেশব, কিন্তু সময় থাকতে মনে পড়েনি, আজ আর মনে করেও কোন লাভ নেই।

কেশব—কি কথা?

সারদা যেন নিজেকে শক্ত করে নিজের মনের ইচ্ছেটার দিকে তাকিয়ে বার বার আপনি বলতে লাগলেন—না না, আজ আর কিছু করবার নেই। বড় অশোভন হবে।

কেশব চুপ করে রইল। সারদা বললেন—বাসন্তীর সঙ্গে তোর দেখা হয়েছে?

কেশব—হ্যাঁ।

সারদা—কি বললে বাসন্তী?

কেশব বিস্মিত হয়ে বললে—কি আর বলবে? আমার কাছে তার বলার মত কি এমন কথা থাকতে পারে?

সারদা—তা নয়, আমি ওকে বলেছিলাম, তোকে কতকগুলি কথা জানিয়ে দেবার জন্ত।

কেশব হঠাৎ বিরক্ত ও উত্তেজিত হয়ে পড়লো—আমার আর কারও কথা শোনবার মত শক্তি বা ইচ্ছে নেই। এ গাঁ থেকে যখন চলে যেতে চাইছ, তখন চলে যাবার কথাই শুধু ভাবা উচিত, অন্ত কোন কথা নয়।

সারদা—তাই হবে রে বাবা, আর অশান্তি সৃষ্টি করিস না, কিন্তু বাসন্তীর বিয়েটা ভালয় ভালয় চুকে যাক্। বড় লক্ষ্মী, বড় বুদ্ধিমতী মেয়ে।

কেশব—বাসন্তী তোমার কাছে কেন এসেছিল ?

সারদা—কি জানি, কিসের জন্ত মেয়েটা ভয়ানক রাগ আর অভিমান করে বসে আছে। মাধুরীর নাম শুনলে ও ভয় পেয়ে ওঠে।

কেশবের বিষণ্ণ মুখটা হঠাৎ যেন উত্তপ্ত হয়ে ওঠে। কোথা থেকে লজ্জার রঞ্জিত ছটা এসে চোখে মুখে ছড়িয়ে পড়ে। মাথা নীচু করে দুর্ভেদ্য কতগুলি ভাবনার মধ্যে যেন পথ খুঁজতে থাকে কেশব।

কেশব—সঞ্জীববাবু আবার গাঁয়ে ফিরে এল কেন বলতে পার ?

সারদা অকারণে চমকে উঠলেন—এ প্রশ্ন আমাকে কেন ? আমি কি করে বলবো। তারা বড়লোক মানুষ, নিজের খেয়ালে আসছে যাচ্ছে।

কেশব—চক্ষুলজ্জা বলে তো একটা জিনিস আছে।

সারদার মুখটা আরও বিবর্ণ হয়ে উঠলো—চক্ষুলজ্জা ? হ্যাঁ, তা তো থাকা উচিত, কিন্তু এই সব মানুষের তাও নাই। শত্রুতা করেও সাধ মেটে না, অপমান পেয়েও লজ্জা হয় না। না, আর এ গাঁয়ে কোনমতেই থাকা চলবে না রে বাবা, তাড়াতাড়ি ব্যবস্থা কর।

কেশব—আজই চল।

সারদা—বাসন্তর বিয়েটা হয়ে যাক্। মেয়েটার জন্য কি জানি কেন বড় মায়া হয়, ওর মমটা যেন সারাক্ষণ কাঁদছে, একটু ভুলিয়ে ভালিয়ে ওকে বিদেয় করতে হবে।

কেশব—তোমার কথার অর্থ আমি বুঝি না।

সারদা—অবুঝেরা কোনদিনই বোঝে না। কিন্তু বাসন্ত তোদের মত অবুঝ নয়।

সারদা দেবী যেন হঠাৎ তাঁর মনের আবেগ ও ভাষার সঙ্কোচ ও মাত্রা ভুলে গেলেন। অবাধে যেন একটা অদম্য কথা বলার সুখের আবেগে বলে চললেন—বাসন্তর মত মেয়ে গাঁয়ে আর দুটি তিনটি হয় না। ও ঠিক আমারই মত। তাই বোধ হয় ওকে আমি চিনে ফেলেছি। তাই ওকে এত ভাল লাগে। তাই বলি, এত মায়াই বা আসে কেন? এ গাঁয়ে থাকতে পারলে, অন্য কোথাও যেতে চাইবে না বাসন্ত। কিন্তু ঠাঁই নেই, যেতেই হবে। তাই ওকে আশীর্বাদ করি, জীবনে যেন অবুঝ হয়ে না থাকে। বাসন্ত আজ ভয় পাচ্ছে, লজ্জা করছে, মুখ লুকোতে চাইছে। যেন একটা ভয়ানক অপরাধ করে ফেলেছে। কিন্তু ওকে বুঝিয়ে দিতে হবে, এ সব কিছুই অপরাধ নয়।

কেশব একেবারে চুপ করেছিল। সারদা হঠাৎ সাবধান হয়ে গেলেন। বললেন—এর মধ্যে তোর কিছু ভাবনা করার নেই কেশব। তুই এত ভাবছিস্ কি?

কেশব—ভাবছি একটা কাজের কথা।

সারদা—কি?

কেশব—তুমি যা বললে তাই। বাসন্তীকে ভুলিয়ে ভালিয়ে বিদেয় দিতে হবে। যেন কোন দুঃখ না নিয়ে যায়।

সারদার মুখটা যেন অপ্রসন্ন হয়ে উঠলো। চুপ করে গেলেন।

কেশব একটু বিচলিতভাবেই বললো—আর কি বলছিলে বল।

সারদা—তোর কথাগুলি শুনতে আমার মোটেই ভাল লাগছে না কেশব। বৃথা তোর সঙ্গে এত বক্‌বক্ করলাম।

কেশব বোকার মত তাকিয়ে রইল। সারদা বেশ রাগ করেই যেন অনুযোগ করলেন—কেন, বাসুকে বিয়ে করতে তোর এত আপত্তি কেন? ভাবতে এত সঙ্কোচ কেন? এতে আশ্চর্য হবারই বা কি আছে?

সঞ্জীববাবু গ্রামে ফিরে এসেছেন। কিন্তু সবারই কাছে প্রথম বিস্ময় হলো—পোড়া বাড়িটাকে আর সারিয়ে তুলবার কোন চেষ্টা করলেন না সঞ্জীববাবু। নতুন একটা মেটে ঘর তুললেন, পিতা-পুত্রী উভয়ে যেন পলাতকের মত একটা গোপন আশ্রয়ে এসে ঠাঁই নিয়েছে। লোকের চোখে তাই ওরা আরও বিস্ময়কর হয়ে ওঠে। এত বড় পয়সাওয়ালা মানুষ সঞ্জীববাবু তবু বারবার কোন্ সাধে গ্রামের একটি কোণে ঠাঁই পেতে চান, কে জানে? সঞ্জীববাবু এ গ্রামের কোন উপকার করেননি। তাঁর মেয়ে মাধুরী হঠাৎ কলেজে পড়ে সখের স্বদেশী করলো, দুটো দিন হইচই করে চুপ করে গেল। এদের স্বরূপ ধরা পড়ে গেছে। এরা আর ধর্তব্যের মধ্যে নয়। এখানে তাদের কেউ কাছে ডেকে শ্রদ্ধা জানাবে না, দুটো পরামর্শ দিতে আসবে না, দুটো কুশলবার্তা জিজ্ঞাসা করবে না। কারণ এরা অত্যন্ত নতুন, ভিন্ন ধরণের ও ভিন্ন ধর্মের। তবু এরা বারবার আসে, লোকে সন্দেহ করে এর মধ্যে একটা রহস্য আছে এবং সে রহস্য যদি ভালভাবে খুঁজে আবিষ্কার করা যায়, তবে

দেখা যাবে যে সঞ্জীব উকিল গ্রামের কোন একটা ভয়ানক ক্ষতি করার জন্যই যেন প্রতিজ্ঞা করে রয়েছেন।

দু'দিনের মধ্যেই সঞ্জীববাবু ছটফট করতে লাগলেন, বিকারগ্রস্ত রোগীর মত নির্বাসনের আশ্রয় মনে করে যেখানে তিনি সকলের থেকে পর হয়ে দিন কাটাবার জন্য এসেছিলেন, তাঁর হঠাৎ মনে হয়েছে, দিন শেষ হয়ে গেছে, আর দিন কাটিয়ে দেবার প্রশ্ন আসে না। নির্বাসন নয়, নিজের সমাধি রচনা করেছেন সঞ্জীববাবু। তাঁর জীবনের সকল আশা, উত্তাপ ও দ্বিধা দ্বন্দ্বের চাঞ্চল্য এখানে এসে একেবারে লয় হয়ে যেতে চলেছে, কারণ ·।

কারণ তিনি শুনতে পেয়েছেন, সারদা ও কেশব গাঁ ছেড়ে চলে যাচ্ছে। ক'মাসের মধ্যেই গ্রামের জীবনে একটা ওলট-পালট হয়ে গেছে। বোর্ডের প্রেসিডেণ্ট ভূদেব গাঁ ছেড়ে চলে গেছে। হেড মাস্টার দিনমণি বিশ্বাস চলে গেছেন, আর আসবেন না। এক একটা ধ্বংসের ভস্মচিহ্ন রেখে তারা চলে গেছে, এ গ্রামের মাটি তাদের সহ্য করতে পারলে না। তবু যেন গ্রামে শান্তি আসেনি। একটা শূন্যতা চারিদিক গ্রাস করে রয়েছে। তবু পাঁচ বছর আগেকার জীবনের কলরব নতুন করে জেগে উঠতে পারেনি।

এই শূন্যতাকে চরম করে দেবে, সেই ঘটনার সংবাদ শুনতে পেয়েছেন সঞ্জীববাবু। সারদা ও কেশব চলে যাবে।

মাধুরী জিজ্ঞাসা করলো—তুমি কোথায় চললে বাবা ?

সঞ্জীববাবু যেন অন্যমনস্ক ভাবেই বললেন—একটা আলো চাই, নইলে অন্ধকারে পথ চিনতে পারবো না। একটা বাতি ঠিক করে দে তো মাধুরী। শীগ্‌গির কর।

মাধুরী উদ্বিগ্ন হয়ে উঠলো—হঠাৎ এ সময়ে তুমি বাইরে বের হবে কেন? কি এমন কাজ আছে?

সঞ্জীববাবু অস্বস্তির মধ্যে যেন ছট্‌ফট্ করছিলেন। এক অনিশ্চিতের উদ্দেশ্যে যাত্রা আরম্ভ হবে এই মুহূর্তে, তার ওপর পথ চেনেন না, সঙ্গে কউ নেই। সঞ্জীববাবুর মুখের চেহারা, আচরণ ও ভাষা সবই এলোমেলো হয়ে উঠছিল। জীবনের সর্বস্ব বাজি রেখে একটা শুধু হার-জিতের জেদের আনন্দে জুয়া খেলতে নেমেছিলেন, আজ বুঝতে পেরেছেন—হার অবধারিত। তাই আজ হঠাৎ নিঃস্বতার শঙ্কায় আকুল হয়ে উঠেছেন। নতুন করে চাল দেবার মত কোন সঞ্চয় সম্পদ আর দুঃসাহস নেই। সব ফুরিয়ে যাবার পালা শুরু হয়ে গিয়েছে। তিনি আজ শুধু শেষ অধ্যায়ের আঙিনায় গিয়ে একবার দাঁড়াবেন। তিনি আজও বুঝতে নিতান্তই অক্ষম, সেখানে গিয়ে কি হবে? কি আশায় চলেছেন? কি লাভ আছে? তবু থাক্‌তে পারছেন না, একবার সারা জীবনের বিরাট ক্ষতির হিসাবটা শুধু খতিয়ে বুঝে আসবার জন্য খাতক হয়ে মহাজনের কাছে চলেছেন।

মাধুরী ভেবে পাচ্ছিল না, কি করা উচিত? সঞ্জীববাবুর এই হঠাৎ উন্মনা হবার কোন কারণ চোখে পড়ছিল না। তবু সন্দেহ হচ্ছিল। মাধুরী তার আভাস কিছুদিন আগেই পেয়েছে। কিন্তু সেই সন্দেহটাই কি আজ সব কুণ্ঠা, লজ্জা, অভিমান, প্রতিহিংসা ও বহু বছরের নীরবতার ব্যবধান ঠেলে ফেলে দিয়ে সত্য হতে চলেছে?

সঞ্জীববাবু বললেন—তোকেও সঙ্গে নিয়ে যেতাম, কিন্তু যাক্, অতটা ভাল দেখায় না। এতটা নামতে পারবো না।

মাধুরী চম্‌কে উঠলো—তুমি কি সারদা জেঠীমার বাড়ি চললে?

সঞ্জীববাবু—হ্যাঁ, একটা জরুরী কাজের কথা মনে পড়ে গেছে, মনে না পড়লেই ভাল ছিল। কিন্তু কি করবো, বার বার মনে পড়ে যাচ্ছে, মন তো কারও অধীন নয়।

মাধুরী লজ্জা পায়। সমস্ত ঘটনাগুলির মাত্রা ভেঙে গিয়ে একটা বিসদৃশতার রূপ প্রকট হয়ে উঠছে। মন কারও অধীন নয়—মাধুরীর কাছে ওটা কোন নতুন কথা নয়। এই সত্য কথাটার মর্ম মাধুরী তার নিজের জীবন দিয়েই বুঝেছে। এই একটা নির্লজ্জ সত্যের বিধান মাধুরীকে মাধুরীর কাছেই সব চেয়ে ছোট করে দিয়েছে। কিন্তু এসব সত্য তাদের সম্বন্ধেই খাটে, যারা জীবনের আলো-ছায়ার ধাঁধায় ভরা আসরে প্রথম প্রবেশ করলো। যারা ভুল করতে মাত্র আরম্ভ করলো। যারা ছায়ার নীচে দাঁড়িয়ে আলো দেখে মুগ্ধ হয়, আলোর নীচে দাঁড়িয়ে ছায়া দেখে মুগ্ধ হয়। যারা মুখ চিনে সাথী খুঁজতে গিয়ে ভিড়ের মধ্যে হারিয়ে যায়। একমাত্র তারাই জানে, মন তো কারও অধীনে নয়। সারা জীবনে এই একটা লজ্জা তাদের সব আন্তরিকতার গর্বকে বিদ্রূপ করে। কিন্তু সঞ্জীববাবুর মত মানুষ আজ জীবনের সয়াহ্নে পৌঁছে এত উত্যক্ত হয়ে উঠবেন কেন? জীবনের সেই আঙিনা এঁরা কবে পেছনে ফেলে এসেছেন, তার তারিখও আজ হিসাব করে আবিষ্কার করতে হয়। তবু আজ তিনি কত ব্যস্ত হয়ে উঠেছেন। অস্তাচলের ক্ষীয়মান আভার দিকে পথিক যদি দৌড়ে যায়, কি লাভ হবে? মুহূর্তে মুহূর্তে সেই আভা মিলিয়ে যাবে, হঠাৎ থমকে পড়তে হবে, আর পথ চলা যাবে না। সঞ্জীববাবু যে ভাবে ব্যস্ত হয়ে উঠেছেন, মনে হয় কোথাও সূর্যোদয় হবে, সেই আশায় চঞ্চল হয়ে তিনি ছুটে বেরিয়ে যাচ্ছেন।

মাধুরী বললো—আমিও যাব তোমার সঙ্গে।

সঞ্জীববাবু আপত্তি করলেন—না না, সাবধান, তুই আর অপমানের ভিতর যাস না। আমি চলেছি হেস্তনেস্ত করতে। সারদা কোন্ অহংকারে আমাকে চিরকাল অপমান করলে, আমি স্পষ্ট করে সেই কথাটা বুঝে আসবো।

মাধুরী—আমার আর কোন অপমানের ভয় নেই বাবা।

সঞ্জীববাবু—তোকে নিয়েই তো যত ঝঞ্ঝাটে ভুগলাম। নইলে সারদার ছেলে আমাকে এত অপমান করতে পারে?

মাধুরী—আমি তোমায় বলেছি কেশব ভট্‌চাযের কোন সাধ্যি নেই তোমায় আর অপমান করতে পারে। শুধু তাই নয়, তোমাকে বলতে লজ্জা নেই, তোমাকে যে অপমান করেছে তার প্রতিশোধ নেবার যদি সুযোগ থাকে, তাও নেব।

সঞ্জীববাবু কিছুক্ষণের জন্য বিমূঢের মত দাঁড়িয়ে রইলেন। মাধুরী বললো—তুমি যাচ্ছ, যাও। কিন্তু আর তুমি কাউকে সাধতে যেও না। তোমাকে ছোট হতে হবে না। যদি দু'কথা শুনিয়ে দিয়ে আসতে পার, তবে যাও।

সঞ্জীববাবু একটু যেন সজীব হয়ে উঠলেন—শুনিয়ে দিয়ে আসতে পারি, খুব ভাল করেই পারি। কিন্তু তোর কোন ক্ষতি হবে না তো? যদি সারদা কেশবের সঙ্গে তোর বিয়ের কথায় রাজী না হয়?

ছিঃ ছিঃ! মাধুরীর মুখ থেকে সমস্ত প্রতিবাদের ভাষা শুধু দুটি ধিক্কারধ্বনি হয়ে ফুটে উঠলো। সঞ্জীববাবুকে আরও বিব্রত করে মাধুরী বলে ফেললো—যদি রাজী না হয় তবে জানবো আমি বেঁচে গেলাম। যদি রাজী হন, তবে জানবো আমাকে মরতে হবে।

সঞ্জীববাবু বিস্মিতভাবে বললেন—সে কি! সত্যিই কি তুই···।

মাধুরী—আমি আজ নিজেকে চিনতে পেরেছি, তাই এত জোর করে বলতে পারছি।

সঞ্জীববাবু হতাশায় একেবারে দমে গিয়ে বললেন—তা'হলে কি উপায় হবে ?

মাধুরী যেন সময় বুঝে জেরা করার জন্যই বললো—কিসের উপায় বাবা ?

সঞ্জীববাবু—তা'হলে তো আর সারদাকে মানিয়ে রাখার কোন পথ নেই। কোন সম্পর্ক রইল না, ওরা দু'জনে চলে যাবে। সারদা এ গ্রাম ছেড়ে চলে যাবে। তারপর…।

সঞ্জীববাবু চুপ করে বসে রইলেন। তাঁর সব চাঞ্চল্যের যেন কিছুক্ষণের জন্য সমাধি লাভ হয়েছে।

মাধুরী আর প্রশ্ন করে না। আর প্রশ্ন করার প্রয়োজন নেই। সঞ্জীববাবুর দুঃখের স্বরূপ আজ সব কঠিন আবরণ সরিয়ে স্বচ্ছ হয়ে উঠেছে। স্পষ্ট দেখা যায়। সারদা জেঠীমা গ্রাম থেকে চলে গেলে সঞ্জীববাবুর আকাশ চিরকালের মত মেঘাবৃত হয়ে যাবে। আর সেখানে চন্দ্র সূর্যের অস্তিত্ব থাকবে না। এই চরম শূন্যতার শাস্তিকে অনুনয় করে দূরে সরিয়ে রাখার জন্যই আজ তিনি উঠে দাঁড়িয়েছিলেন, আলো খুঁজছিলেন, যেতে চাইছিলেন। মাধুরী তাঁকে আবার নিস্তব্ধ করে দিয়েছে।

নিজের জীবনের যত কাহিনীর আরম্ভ ও পরিণামের ইতিহাসের দিকে একবার যেন পলকে তাকিয়ে নেয় মাধুরী। তার আরম্ভে ও শেষে কোন মিল নেই, কোন সূত্র নেই। পদে পদে হোঁচট খেয়েছে, সূত্র ছিন্ন হয়েছে, নতুন ডোরের বন্ধন গায়ে জড়িয়েছে মাধুরী। একটা শেষ না হতেই আর একটা ছলনা। মান্দার গাঁয়ের শিউলিতলায় দাঁড়িয়ে সেই

এক পুরাতন দিনের চোখের জলের প্রতিশ্রুতি আজ একেবারে শুষ্ক ও শীর্ণ হয়ে গেছে। ভালবাসতে গিয়ে নানা কাহিনী শুধু সৃষ্টি করেছে মাধুরী, কোন ইতিহাস সৃষ্টি হয়নি।

কিন্তু প্রৌঢ় সঞ্জীববাবু বেদনার ভারে যেন চূর্ণ হয়ে গেছেন। তিনি আজও তাঁর প্রথম যৌবন প্রভাতের আকাশটিকে ভুলতে পারেননি। মাস গেছে, বছর গেছে, আয়ু স্তিমিত হয়ে এসেছে, বয়স বিরূপ হয়ে গেছে, তবুও তিনি সেই আকাশের দিকেই আজও তাকিয়ে আছেন। আবার সূর্য উঠবে বলে বিশ্বাস করেন। ভালবাসার দাবি এই মানুষটির জীবনকে ছাপিয়ে গেছে।

সঞ্জীববাবুর মূর্তিটার দিকে তাকিযে মাধুরী যেন তার মনের সকল যুক্তি বুদ্ধি মীমাংসা ও আবেগ দিযে বিরাট এক অনুরাগের মহিমার উদ্দেশ্যে স্তোত্র রচনা করছিল। কিছুক্ষণ আগেই সঞ্জীববাবুকে সাবধান করে দিযেছে মাধুরী। জীবন-ভরা প্রবঞ্চনার বোঝা যেন এইবার তিনি বিনা দ্বিধায দূরে ছুঁড়ে ফেলে দেন। মাধুরীর হঠাৎ মনে হয়—প্রবঞ্চনা নয। সঞ্জীববাবুর সারা জীবন ভরে আছে, আশ্বাসে ও আশায়। কোন শূন্যতা সেখানে প্রবেশ করতে পারেনি।

জীবনের আরম্ভে যেখানে মাধুরী নিজেকে ব্যর্থ করে দিয়েছে, সঞ্জীববাবু জীবনের অন্তিমে এসেও সেখানে সফল হয়ে আছেন। এই অনুরাগের মহত্ব যেন অদৃশ্য পরাগরেণুর মত মাধুরীর সত্তার ওপর ছড়িয়ে পড়তে থাকে। মুগ্ধ করে। মাধুরীর মাথা শ্রদ্ধায় অবনত হয়ে আসে।

সঞ্জীববাবু বোধ হয় উঠতেন না, কিন্তু মাধুরী এগিযে এসে কাছে দাঁড়ালো। সহস্র শিকলের বন্ধন ছিঁড়ে দিয়ে এক বন্দিনী যেন হঠাৎ মুক্তি পেয়ে উঠে দাঁড়িয়েছে—মাধুরীর চেহারা দেখে কতকটা সেই রকমের

মনে হয়। কিন্তু সঞ্জীববাবু চুপ করে মাথা নীচু করে বসে আছেন, এক যাবজ্জীবন বন্দীর মূর্তি। মাধুরী যেন কিছু বলার জন্যই এগিয়ে এসেছে। জীবনে কোন সাধ্য বস্তুকেও সফল করতে পারেনি মাধুরী। যা নিতান্ত সহজ ছিল তা'ও তার মনের ভুলে অসাধ্য হয়ে গেছে, কিন্তু আজ একটা নতুন শক্তির পুলক মাধুরীর চেতনায় যেন দীপালি জ্বালিয়ে দিয়েছে। এক সঙ্কল্পের গর্বে বুক ভরে গেছে। সে আজ প্রথম অসাধ্যসাধন করবে।

মাধুরী ডাকলো—তুমি ওঠ, একবার ঘুরে এস।

সঞ্জীববাবু নিঃশব্দে বসে রইলেন।

মাধুরী ক্ষমা প্রার্থনার সুরে অনুনয় করলো—আমার কথাগুলি গ্রাহ্য করো না বাবা, রাগের মাথায় যা বলেছি তার কোন অর্থ হয় না।

সঞ্জীববাবু মুখ তুলে তাকালেন—রাগের মাথায় ?

মাধুরী—হ্যাঁ, রাগের মাথায় মানুষ আত্মহত্যা করে, আমিও তাই করতে চেয়েছিলাম।

সঞ্জীববাবু—কিন্তু কেশবকে কি ক'রে বোঝাব যে ।

মাধুরী—কেশবদা অবুঝ নয়। তুমি বললেই সে বুঝবে।

সঞ্জীববাবু উঠে দাঁড়ালেন, একটু উৎসাহিতভাবে বললেন—আমারও তাই মনে হচ্ছে মাধুরী।

সঞ্জীববাবু এগিয়ে গেলেন। মাধুরী একটা আলো এনে সঞ্জীববাবুর হাতে ধরিয়ে দিলেন। চিরজীবনের অন্ধকারের বাধা ঠেলে সঞ্জীববাবু যেন শেষে পথ ধরে চললেন।

অনেকক্ষণ পরে বারান্দার ওপরে একটা আলো দেখে চমকে উঠলো মাধুরী। সঞ্জীববাবু কি করে এলেন ?

মাধুরী উঁকি দিয়ে দেখলো, বারান্দার ওপর দাঁড়িয়ে আছেন অজয়দা। আলোটার মতই নিতান্ত সঙ্কুচিতভাবে চুপ করে দাঁড়িয়ে আছেন। এই অপ্রত্যাশিত আবির্ভাবকে হঠাৎ না বুঝতে পেরেই ভয় পেল মাধুরী। অজয়দা কেন? কি তাঁর কাজ? এতদিন পরে আজই-বা এলেন কেন? তাঁর তো আসবার কথা নয়।

সব চেয়ে ভয় হচ্ছিল সেই কথা ভেবেই—যদি আজ অজয়দার মনের সেই মুখচোরা আবেদন হঠাৎ মুখ খুলে ফেলে। কি উত্তর দেবে মাধুরী? আজ আর কোন উত্তর দেবার, কোন ছলনা দিয়েও সান্ত্বনা দেবার উপায় নেই। নাটকের শেষ অঙ্ক ঠিক হয়ে গেছে। আর কোথাও রদবদল হবে না। আর কোথাও কোনক্রমে, দুঃখের জায়গায় হাসি, আর হাসির জাগায় অশ্রু দিয়ে নতুন করে সাজানো যাবে না। মনের ভুলে নানা পথে ঘুরে ফিরে জীবনের পরিণাম সেই গাঁয়ের শিউলিতলায় এসে থামতে চলেছে। জোর করে পথহারা হতে চেয়েছিল সে, জোর করেই যেন দৈবী-নিয়মে তাকে আবার সেই প্রথম পথের মোড়েই এসে পৌঁছে দিয়েছে। সঞ্জীববাবু বলে গেছেন, সারদা জেঠীমা তাঁর কথা উপেক্ষা করতে পারবেন না। আর কেশব? কি সাধ্য আছে তার, মাধুরীর দাবিকে অগ্রাহ্য করে? বাসন্তীর মিষ্টিমুখের উপদেশ আর কাজলপরা চোখের চাউনি যত মধুর হয়েই উঠুক না কেন, মাধুরী পেছন থেকে যদি ডাক দেয়, কেশব ভটচায এক পা অগ্রসর হতে পারবে না। কিন্তু অজয়দা আজ কি মনে করে?

মাধুরী বাইরে এসে দাঁড়ালো। অজয় বললো—তোমার বাবা বাড়িতে নেই নাকি মাধুরী?

মাধুরী—একটু বাইরে গেছেন।

অজয়—তা'হলে তোমার কাছেই বলে যাই।

মাধুরী—বলুন।

অজয়—বাসন্তীর বিয়ের দিনটা ঠিক হয়ে গেছে। তোমরা যেও কিন্তু। আর রাগ করে থাকা উচিত নয়।

মাধুরী—দিন ঠিক হয়ে গেছে?

অজয়—হ্যাঁ।

মাধুরী—পাত্র ঠিক হয়ে গেছে?

অজয়—সে তো কবেই ঠিক হয়ে আছে।

মাধুরী—নামটা বলুন না অজয়দা, এত ভয় পাচ্ছেন কেন?

অজয় হেসে ফেললো—ভয় পাব কেন? নামটা বললে তুমি চিনতে পারবে কি?

মাধুরী বোকার মত ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে রইল। এত গর্ব করে বুঝতে গিয়ে হঠাৎ যেন একেবারে বুদ্ধি হারিয়ে গেছে।

অজয় বললো—পাত্রের বাড়ি মাত্র এখান থেকে চার ক্রোশ পথ, গেরস্তঘরের ছেলে। বংশ ভাল। স্কুলে পড়েছে। পৈতৃক দেনা আছে। খায় দায় থাকে। এর চেয়ে বেশি আর কোন পরিচয় নেই।

মাধুরী একটা চেয়ার টেনে নিয়ে এসে বারান্দার ওপর রাখলো। বার বার অকারণে অনুরোধ করলো—আপনি একটু বসুন অজয়দা। কি সব কথা বলেছেন, আমি কিছু বুঝতে পারছি না। একি কখনো সত্যি হতে পারে? ছি-ছি, এ কখ্খনো হতে পারে না। কি এমন দোষ করেছে বাসন্তী?

মাধুরীর কথাগুলি যেন হঠাৎ বেদনার জ্বালায় এক এক করে ফুটে উঠছিল। একেবারে হতভম্ব ও অপ্রস্তুত হয়ে গেছে মাধুরী। আর

গর্ব করার, অনুগ্রহ করার, প্রতিশোধ নেবার, প্রতিশ্রুতি রাখবার কোন আনন্দ রইল না। বাসন্তী নিজেকে ডুবিয়ে দিয়ে সবাইকে চিরকালের মত হাল্‌কা করে দিতে চলেছে। কিন্তু মাধুরীর হঠাৎ সন্দেহ হয়, হাল্‌কা হওয়া যাবে না। চিরজীবনের মত এক নতুন শাস্তির ভার মাথার ওপরে চেপে বসবে।

অজয় বললো—আমি এবার যাই।

মাধুরী বলে—যাবেন না। আমাকে একটা পথ বলে দিতে হবে। আপনি কোনদিন আমাকে একটাও উপদেশ দেননি। আজ আমার কতকগুলি কথার উত্তর দিতে হবে।

অজয়—স্পষ্ট কোন উত্তর দিতে বোধ হয় পারবো না।

মাধুরী—পারতে হবে অজয়দা। আপনি স্পষ্ট করে একবার বলুন যে···।

অজয়—কি ?

মাধুরী কিছুক্ষণের জন্য নিজেরই নির্লজ্জতায় আশ্চর্য হয়ে চুপ করে রইল।

মাধুরী শান্তভাবে বললো—বাসন্তী কিছু বলছে না অজয়দা ?

অজয়—না। কি-ই বা বলবার আছে ?

মাধুরী—আপনিও কি তাই মনে করেন, ওর পক্ষে বলবার আর কিছু নেই।

অজয়—আমি কিছু জানি না।

মাধুরী—কিন্তু আমি জানি।

অজয়—ভাল কথা।

মাধুরী—আপনি যেন রাগ করে রয়েছেন অজয়দা !

অজয় হেসে ফেললো—তুমি এত দুঃখ করছো কেন মাধুরী ? আমার

রাগ করার কিছু নেই। কার ওপর রাগ করবো? বাসন্তীও কারও ওপর রাগ করে নেই। এইভাবেই ওকে চলে যেতে হবে, সে কথা বাসন্তী খুব ভাল করেই জানতো, বিশ্বাস করতো। এর জন্য সে প্রস্তুত হয়ে আছে।

মাধুরী—কিন্তু আমি জানি, এ ভাবে চলে যেতে বাসন্তী নিশ্চয় চায় না।

বাসন্তী—ও সব কথা যাক মাধুরী। তোমরা যেও। সঞ্জীববাবুকে যেতে বলো।

মাধুরী—আপনি সব জিনিস এক মুহূর্তে চুকিয়ে দিতে চান অজয়দা। আমার প্রশ্নগুলিকেও জবাব না দিয়ে সরে পড়তে চাইছেন।

অজয়—তুমি বৃথা কেন এ সব ব্যাপার নিয়ে আলোচনা করছো!

মাধুরী—আমি যদি না করি তবে কে করবে? সব গণ্ডগোলের মূলে তো আমিই।

অজয়—না, তা ঠিক নয়। এ সব ব্যাপারের কোন মূল নেই। সংসারের নিয়মই এই রকম। বিনা কারণে···।

মাধুরী—চুপ করে গেলেন কেন অজয়দা?

অজয়—আমি এ সব বুঝতে পারি না, তাই চুপ করে যাওয়াই ভাল। বাসন্তীর জন্য আমার দুঃখ হয় ঠিকই, কিন্তু কিছু করবার পথ নেই।

মাধুরী—খুব ভাল পথ ছিল। আপনি ইচ্ছা করলেই বাসন্তীকে এভাবে বিদেয় না দিয়েও পারতেন। আপনার হাতে সে ক্ষমতা ছিল।

অজয়—কি রকম?

মাধুরী—কেশবদার সঙ্গে বাসন্তীর বিয়ে দিতে পারতেন। আপনি কেশবদার প্রাণের বন্ধু, আপনার অনুরোধ সে অগ্রাহ্য করতো না।

অজয়—একটা কথা ভুল করে ফেললে মাধুরী।

মাধুরী—ভুল?

অজয়—হ্যাঁ, প্রথম কথা হলো, প্রাণের বন্ধুকে অনুরোধ করার কোন অর্থ হয় না। অনুরোধ করার আগেই প্রাণের বন্ধুদের সেটুকু বুঝে দেখা উচিত। আর একটা ভুল হয়েছে, প্রাণের বন্ধু কেশব আমার অনুরোধে যদি রাজীই হয়, তাতে কি আসে যায়? বাসন্তী রাজী হবে কি না, সে খবর আমি জানি না।

মাধুরী—বাসন্তী রাজী হবে না? আমি সব বুঝতে পারি অজয়দা। কিছু অজানা নেই।

অজয় একটু বিরক্ত হয়ে বললো—না, বাসন্তী রাজী হতে পারে না। অত কূটবুদ্ধি তার নেই। সেও মানুষ চিনতে পারে। বাসন্তী কি জানে না যে তোমার সঙ্গে কেশবের…।

মাধুরী—সবাই জানে, সবাই জানে। তুমিও জানো অজয়দা। কিন্তু তারপর তো কেউ চুপ করে বসে নেই। কেউ আর তার প্রতিজ্ঞা নিয়ে মালা জপছে না। কেউ নয়। কেশবদাও না, বাসন্তীও না, আমিও না।

অজয় চকিতে একবার মাধুরীর উত্তেজিত মুখের দিকে তাকিয়ে অন্য দিকে মুখ ঘুরিয়ে নিল।

মাধুরী যেন সংসারের সব নিয়ম নিষ্ঠার আর প্রতিশ্রুতির পর্বগুলিকে একটু ঠাট্টা করে বললো—সবাই যে চুপ করে বসে নেই, সে খবরও তো জান অজয়দা।

অজয়—জানি।

মাধুরী—তবে, শুধু আমাকেই দোষী করার জন্য এত চেষ্টা কেন?

অজয়—একটা কথা যদি বলি, তুমি কিছু মনে করবে না মাধুরী ?

মাধুরী—কিছুই মনে করবো না।

অজয—সব দোষের আরম্ভে কিন্তু তুমিই আছ।

মাধুরী—আমি একটা কথা বলি অজয়দা ?

অজয়—বল।

মাধুরী—সব দোষের শেষে কিন্তু তুমিই এসে দাঁড়িয়েছ।

অজয চম্‌কে উঠলো। মাধুরীর মুখের দিকে তাকালো। অজয় চেষ্টা করছিল—এই অতি চালাক ফ্যাশানেবল্ বাচাল মেয়েটার মুখের ছবিটা একবার দেখে রাখা উচিত। কিন্তু তার বদলে, অজয শুধু বিস্মিত দৃষ্টির গভীরতা নিযে দেখলো—মাধুরীর ধূর্ত চেহারাটা যেন দুঃসহ বেদনার জ্বালায করুণ হযে রযেছে। ও চেহারার মধ্যে আর কোন খরবুদ্ধির প্রগল্‌ভতা নেই, চোখের দৃষ্টিতে সেই ফ্যাশানেবল্ লীলামযীর চটুলতা নেই। একটা ব্যর্থতার দীন প্রতিমূর্তি। এক নিরীহ বোকা মেযে, খেলা করতে করতে পথ ভুলে গেছে। তারপর থেকে শুধু ছট্‌ফট্ করেছে আর পথ খুঁজে বেড়িয়েছে। আজ সন্ধানের সীমায় এসে দাঁড়িয়েছে।

অজয বললো—যা কখনো আশা করিনি, তুমি অকারণে সেই সব কথা বলে আজ আমায উত্যক্ত করছো শুধু।

মাধুরী—কি আশা করনি অজযদা, আজ তোমাকেই বলতে হবে।

অজয—তুমি এত চালাক, তা জানতাম না।

মাধুরী—আজও চালাকী দেখতে পাচ্ছ অজয়দা। আমার জীবনের সব অপমানগুলি বেহাযার মত তোমাদের সামনে ছড়িযে দিচ্ছি, তবু তোমরা আমাকে আজও চালাক বলবে ? কি চালাকীর দেখলে অজয়দা ?

অজয়—তুমি কিছু মনে করো না মাধুবী। আমার মনটা ভাল নেই। কথাগুলি তাই কঠোর হয়ে উঠছে।

মাধুবী—মোটেই কঠোর নয়, খুব বেশি চালাকী আছে তোমার কথার মধ্যে।

অজয়—সব অভিযোগ আজ আমার বিরুদ্ধেই বুঝি ঘুরিয়ে দেবে?

মাধুবী—অভিযোগ বৈকি! তুমি নিশ্চয় আজ আমার সঙ্গেই দেখা করতে এসেছ। বাবার সঙ্গে দেখা করতে আসনি।

অজয় হঠাৎ অপ্রস্তুত হয়ে গেল। মাধুবীর অভিযোগটা একেবারে রূঢ়ভাবে স্পষ্ট, ভাষার মধ্যেও কোন সঙ্কোচের আবরণ নেই, চোখের দৃষ্টিতেও কোন কুণ্ঠা লজ্জা ও সঙ্কোচ নেই।

মাধুবী যেন সুযোগ বুঝে জেরা করার জন্য আরও নির্লজ্জের মতই প্রশ্ন করলো—মিথ্যে কথা বলো না অজয়দা, তুমি যা বলবে আমি তাই বিশ্বাস করবো। তাই সাবধান হয়ে বলবে, যদি আমার অমঙ্গল না চাও। বুকে হাত দিয়ে সত্যি কথাটা বলবে।

অজয়ের মনের ভেতর মত্তা ও ভীরুতার একটা মিলিত ষড়যন্ত্র যেন মুহূর্তের মধ্যে তার চেহারাটা অপরাধীর মত কুণ্ঠিত করে তুললো।

বহুক্ষণ ধরে একটা একটানা স্তব্ধতার মধ্যে দু'জনে যেন সব প্রশ্নের খেই হারিয়ে দাঁড়িয়েছিল। মাধুবীর পক্ষে আজ আর দুর্ভাবনার কিছু নেই। স্নেহ তার হারিয়ে গেছে অনেকদিন। তাই আজ তার দুঃসাহসেরও সীমা নেই। আজ যেন মাধুবীর ব্রত সাঙ্গ করার দিন। শুধু প্রশ্ন করে যাবার পালা। শুধু উত্তর শুনে যাবার পালা, মাধুবীর মনে মনে একটা গর্ব ছড়িয়ে পড়ছিল। শুধু বাসন্তীই কি পালিয়ে যেতে শিখেছে, আর কেউ পারে না? সকল মোহ অবহেলার পেছনে রেখে

দিয়ে একটা অনিশ্চিতের স্রোতে স্থির বিশ্বাস নিয়ে ভেসে পড়তে শুধু বাসন্তী নয়, মাধুবীও জানে। মুক্তিলাভের কৌশল শুধু গেঁয়ো মেয়ের পাকা বুদ্ধিতেই খেলে না, শহুরে মেয়েও কি করতে পারে, তারই উদাহরণ আজ সফল করে দেখিয়ে দেবে মাধুবী। জীবনে মালা-গাঁথার নিয়মে যখন ভুল হয়েই গেছে, তখন শুধু গ্রন্থিগুলি নিয়ে বসে থেকে আর লাভ কি? এক এক করে এই গিঁট খুলে ফেলতে হবে। মুক্ত হতে হবে।

অজয় বললো—আজ একথা জিজ্ঞেসা করছো কেন? আমি কি আজ প্রথম তোমায় দেখতে এলাম? এর আগে কি আর কখনো আসিনি?

মাধুবী যেন একটা পাল্টা আঘাত পেয়ে পিছিয়ে গেল। এই উত্তর কল্পনা করতে পারেনি মাধুবী। কোন মিথ্যা নেই অজয়দার কথায়। যা কোন দিন মনে পড়েনি, আজ যেন একটা আলেয়ার সিবিজ ছবির মত এক এক করে চোখের সম্মুখে ভেসে ওঠে। এসেছেন, অজয়দা আরও কতবার এসেছেন। মীরগঞ্জে যতবার গেছেন, মাধুবীর সঙ্গে দেখা করে গেছেন। যতবার ফিরে এসেছেন—যে বার্তা নিয়ে এসেছেন—সবার আগে মাধুবীকে বলে গেছেন। দু'বছর আগে, তিন বছর আগে, পাঁচ বছর আগে, আট বছর আগে—মান্দার গায়ের কোলে সন্ধ্যা-সকাল, মেলা-খেলা, পূজা-উৎসব, সকল আনন্দের মেলামেশার ঘটার মধ্যে অজয়দা এসেছেন। কেশবের প্রাণের বন্ধু অজয়দা, কেশবকে কখনো একা রাখতে পারেন নি। দিঘীর এপারে কেশবকে পৌঁছে দিয়ে নিঃশব্দে ওপারে গিয়ে দাঁড়িয়েছে অজয়দা। দূর দিনের স্বপ্নের মধ্যে কেশব ও মাধুবী এপারে খেলা করেছে, অজয় ওপার থেকে শুধু দু'চোখ মেলে দেখেছে। কিন্তু কী আশ্চর্য কেশবদাকে এত বড়

করে দেখতে গিয়ে অজয়কে আজ এতদিনের মধ্যেও ভাল করে দেখাই হয়নি। অজয়দার মুখচোরা অস্তিত্ব নেপথ্যে লুকিয়েছিল, কোনদিন তাকে পথে আহ্বান করার কথা মনে পড়েনি মাধুরীর। কিন্তু সে যে নিতান্ত সত্য, নিছক বাস্তব। আড়ালে আড়ালে নিজেকে কত বার উৎসর্গ করে রেখেছিল অজয়দা, কাউকে সে সব জানতে দেয়নি। তাঁর প্রাণের বন্ধুও জানতে পারেনি।

মাধুরী বললো আমার কাছে যতটা বুদ্ধি আশা কর, তা যদি আমার না থাকে, তবে সেটা কি আমার অপরাধ ?

অজয়—বুদ্ধি নয় মাধুরী, মন বলে একটা জিনিস মানুষের থাকে বলে শুনতে পাওয়া যায়। বুঝতে হলে বড় বেশি বুদ্ধির দরকার হয় না, মন থাকলেই হয়।

মাধুরী—মনেরও ভুল হয়।

অজয়—নিশ্চয। কিন্তু সেটা অনেক দেবিতে বুঝতে পারলে, এই যা দুঃখ। অনেকদিন আগেই মনের ভুলটা বুঝে ফেলা উচিত ছিল। ভুল হযেছে সেইদিনই যেদিন শুধু সামনের দিকে তাকিযে দেখতে, পাশের কাউকে দেখতে পেতে না।

মাধুরী—মাপ করবেন অজয়দা, যে ভুল হযে গেছে, তা ভুল হযেই থাকুক। আজ নতুন করে যেন কোন ভুল না হয।

অজয—তুমি আমাকে আব কোন প্রশ্ন করো না, তা'হলেই ভুল হবে।

মাধুরী—না, তা হবে না।

অজযের গলার স্বর যেন ভযানক একটা তীব্রতা থেকে রেহাই পাওযার জন্য একেবারে মৃদু হযে গেল। অসংযত নিঃশ্বাসের আলোড়নে হৃৎপিণ্ডটা যেন ক্ষুব্ধ হয়ে ফিস্ ফিস্ কবে এক গোপন দুরাকাঙ্ক্ষাকে

মুক্ত করে দিল—তুমি বিশ্বাস করতে পার মাধুরী, কেশবের চেয়ে আমি তোমায় ঢের বেশি ভালবাসি। কতখানি ভালবাসি তার পরিমাপ করো না। পরিমাপ করতে পারবে না। তুমি তার মূল্য জান না, তোমার বুদ্ধিতে তার হদিস্ মিলবে না। তুমি আমার কেউ নয়, তোমার কাছে কিছুই চাই না, কোন দাবি নেই—তবু তোমাকেই আমি···।

দু'চোখ বন্ধ করে শান্ত শ্রদ্ধাপ্লুত ভাবে মাধুরী যেন একটা স্তোত্রপাঠ শুনছিল। কথা বললো মাধুরী। আর প্রশ্ন নয়—শান্তিধারার মত পরম তৃপ্ত এক আগ্রহের আবেদন যেন ধীরে ধীরে ঝরে পড়ছিল—বলে যাও অজয়দা, থেমে যেও না, যা খুশি বলে যাও। আজ শুধু তোমার কথাই শুনবার জন্য আমি তৈরি হয়েছি। এই কথা শোনবার জন্যেই আমি মীরগঞ্জ ছেড়ে এই গাঁয়ে ফিরে এসেছি অজয়দা, তুমি বিশ্বাস কর।

অজয়—আর তো বলবার কিছু নেই মাধুরী। সব বলা শেষ হয়ে গেল।

মাধুরী—কিন্তু সব তো শেষ হলো না। তুমি আজ একথা বিশ্বাস করতে পার, তোমার কাছে যে-খবর পেলাম, সেই আমার জীবনের সব চেয়ে বড় খবর।

অজয়—অন্যায় করছো মাধুরী, কেশব কোন ভুল করেনি।

মাধুরী—না, সে ভুল করেনি, আমিও তাকে ভুল বুঝিনি, সে ঠিকই আছে। তাকে কোনদিন ছোট করবো না। তাকে যে ভাবে জেনেছিলাম, আজও সে আমার কাছে তাই আছে। কিন্তু যে উপহার আজ আবিষ্কার করলাম, সে আমার কাছে একেবারে নতুন ঐশ্বর্য। সব চেয়ে বড়।

অজয়—তুমি অকপটে একথা বলছো?

মাধুরী—বলছি বৈকি। আজ যে আমার কোন ভয় নেই। তুমি কোন প্রতিজ্ঞা করনি, আমি কোন প্রতিশ্রুতি দিয়ে তোমাকে আপন করাব লোভ দেখাই নি, তবু তুমি কী শক্ত মানুষ অজয়দা, চুপ করে এই তৃষ্ণা জীবনে পুষে নিয়ে আসছো, তবু চুপ করে থাকতে পার।

মাধুরী আবার হঠাৎ চুপ করে গেল। শেষ উত্তর দেবার জন্য যেন মনের সব শক্তিগুলিকে সংহত করে নিল।—না চাইতে তুমি আমায় সব চেয়ে বড় সম্মান দিয়ে ফেলেছ অজয়দা, এই একটি ভুল করেছ। কিন্তু এই সম্মান গ্রহণ করবার মত যোগ্যতা আমার নেই।

অজয়—যোগ্যতার প্রশ্ন তুলে লাভ নেই। আমি বিশ্বাস করি, আমার উপহার মেনে নেবার উপায় তোমার নেই। নেওয়া উচিত নয়। আমি চলি। বাসন্তীর কথা মনে রেখ, যেও কিন্তু।

অজয় চলে গেল।

সঞ্জীববাবু অন্ধকারে আলো হাতে নিয়ে বের হয়েছিলেন। ফিরে এলেন আলো হাতে নিয়ে। ডাক দিলেন—মাধুরী।

মাধুরীর চোখে তন্দ্রা জড়িয়েছিল। চমকে উঠে উত্তর দিল—এই যে বাবা।

সঞ্জীববাবু—ঘুমিয়ে পড়েছিলি বুঝি?

মাধুরী—হ্যাঁ।

সঞ্জীববাবু—তবে উঠলি কেন? ঘুমো, ঘুমো। একটু শান্ত হয়ে ঘুমো। জীবনে শান্তিটাই সব চেয়ে বড় জিনিস।

তবে কি শান্তির আস্বাদ পেয়েছেন সঞ্জীববাবু? মাধুরী যেন পরীক্ষকের মত সঞ্জীববাবুর মূর্তি থেকে বিচ্ছুরিত উৎফুল্লতার রহস্যগুলিকে

খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখছিল। যাত্রী ফিরে এসেছে কৃতার্থ হয়ে, যাত্রা সফল হয়েছে নিশ্চয়। এক সুখী কৃতার্থ প্রসন্ন মূর্তি। এ পর্যন্ত জীবনে বহু সফলতার গর্ব লাভ করেছেন সঞ্জীববাবু, বহু মামলায় জয়লাভ করেছেন, বহু মানুষের আশীর্বাদ তোষামোদ এবং ধন্যবাদ পেয়েছেন। কিন্তু কোনদিন তাঁর মুখে এত বড় তৃপ্তির স্বাক্ষর ফুটে ওঠেনি। জীবনে যা প্রাপ্য ছিল, আজ তিনি তাই পেয়ে গেছেন। আজ আর তাঁর কোন ভ্রান্তি নেই, বিকার নেই, বিক্ষোভ নেই। চোখের সম্মুখেই সকল সংশয় ও প্রশ্নের উত্তরটা স্পষ্ট হয়ে রয়েছে, মাধুরীর বুঝতে কোন ভুল হচ্ছিল না।

সঞ্জীববাবুকে যেন আজ সব চেয়ে নতুন করে বুঝতে পারছিল মাধুরী। এত আন্তরিকভাবে মমতার দৃষ্টি দিয়ে সঞ্জীববাবুকে কোন দিন সে দেখেনি, দেখবার কারণও হয়নি। মাধুরীর কাছে সঞ্জীববাবু আজ হঠাৎ একেবারে ছেলেমানুষ হয়ে গেছেন। মাধুরীর চোখের দৃষ্টিটা সেই রকম আবেশে মুগ্ধ হয়েছিল—এক মমতাময়ী মাতা যেন দুরন্ত ছেলের শান্ত রূপের দিকে তাকিয়ে মনে মনে খুশি হয়ে উঠছে।

সঞ্জীববাবু বললেন—সারদার সঙ্গে দেখা হলো। বড় রোগা হয়ে গেছে—আহা! কিন্তু সারদার মনটা আজও একটুও বদলায় নি। আমাকে দেখে প্রথমে তো কিছুই বলতে পারলো না। তারপর কেঁদে ফেললো। এ রকম করুণ কান্না আমি জীবনে শুনিনি। কী ভয়ানক ভুল! কী কঠিন প্রায়শ্চিত্ত!

মাধুরী যেন ছাত্রীর মত দাঁড়িয়ে পাঠ নিচ্ছিল। সঞ্জীববাবুও শুধু পাঠ শুনিয়ে দেবার আবেগেই এক রহস্যমুক্ত জীবনের ইতিবৃত্তকে আক্ষেপে আহ্লাদে ও আগ্রহে মিশিয়ে নিয়ে বধির সংশয়ের কানে আজ তাঁর জয়গৌরবের বার্তা ঘোষণা করছিলেন।

মাধুরী একটু কৌতূহলী হয়েই প্রশ্ন করলো—সারদা জেঠীমা আমার কথা কিছু জিজ্ঞেস করলেন ?

সঞ্জীববাবু—তোর কথা ? না, তোর কথা কিছু জিজ্ঞেস করেনি।

মাধুরী—তুমি আমার কথা কিছু বলেছ ?

সঞ্জীববাবু—আমি ? 'না, আমি কেন বলতে যাব ? কি-ই বা এমন বলার আছে ? তুই যে ভাল আছিস্, সে সব কুশল সংবাদ সারদা জানেই, জিজ্ঞেসা না করলে কি আসে যায় ?

মাধুরী—কেশবদার বিষয় কিছু শুনতে পেলে ?

সঞ্জীববাবু—না, কেশব বাড়ি ছিল না।

মাধুরী—সারদা জেঠীমা কিছু বলেন নি ?

সঞ্জীববাবু—না।

মাধুরী—কিছুই না।

সঞ্জীববাবু—কি-ই বা এমন বলার আছে ? আমি তো জানিই, কেশব ভাল আছে। জিজ্ঞেস করেই বা কি হবে ?

মাধুরী—বাসন্তীর কথা কিছু শুনতে পেলে ?

সঞ্জীববাবু—বাসন্তী কে ?

মাধুরী—অজয়দার বোন বাসন্তী।

সঞ্জীববাবু—তার সঙ্গে সারদার সম্পর্ক কি ?

মাধুরী—সেই কথাই জিজ্ঞেস করছিলাম। সারদা জেঠীমা কি বাসন্তীব সম্বন্ধে কোন কথা বললেন ?

সঞ্জীববাবু—না।

মাধুরী—অজয়দা এসেছিলেন।

সঞ্জীববাবু—কেন ?

মাধুরী—বাসন্তীর বিয়ে ঠিক হয়ে গেছে। তাই…।

সঞ্জীববাবু—টাকা ধার চায় বোধ হয়। আর ধার কেন? এমনিই দিয়ে দেব। বড় ভাল ছেলে অজয়। বড় গরীব।

মাধুরী—তোমাকে বিয়েতে নেমন্তন্ন করে গেছে অজয়দা।

সঞ্জীববাবু—বেশ, নিশ্চয় যাব। তুইও যাস্। গ্রামের সবারই সঙ্গে মেলামেশা থাকা ভাল। এর মধ্যে বেশ একটা আনন্দ আছে। এ আনন্দ পয়সা দিয়ে কেনা যায় না। সত্যি কথা বলতে কি, মীরগঞ্জ শহরেও এই জিনিস পাবি না। শুধু দেশের মাটিতে পাওয়া যায়, আর কোথাও নয়, আর কোথাও নয়।

মাধুরী—সারদা জেঠীমারা কি গাঁ ছেড়ে চলে যাবেন বলে একেবারে ঠিক করে ফেলেছেন?

সঞ্জীববাবু—না, ওসব বাজে কথা। কোথাও যাবে না ওরা। সারদা সে রকম মানুষ নয়। এই গ্রাম ছেড়ে সারদা কি অন্য কোথাও যেতে পারে?

আর কোন প্রশ্ন খুঁজে পেল না মাধুরী। সব প্রশ্নের উত্তর জানা হয়ে গেছে, মীমাংসাও হয়ে গেছে।

মেটে কুটীরের দাওয়ার ওপর একটা আসন টেনে নিয়ে সঞ্জীববাবু বসে রইলেন। আলোটাকে সামনে রাখলেন। জীবনের পরম প্রাপ্যকে পেয়ে গেছেন সঞ্জীববাবু, তিনি যেন চিরকালের মত এইখানে বসলেন। তাঁর সম্মুখে আলো জ্বলছে।

মাধুরী অন্য ঘরে চলে গেল।

সকাল থেকে সানাই বাজছিল অজয়ের বাড়িতে। ছোট মান্দার

গাঁয়ের বুকে আকস্মিক একটা সুরের দোলা লাগলো। মান্দার গাঁয়ের সবাই জানে খবর—বাসন্তীর বিয়ে। বরযাত্রীরাও এসে গেছে। মান্দার গাঁয়ের ছায়ায় ঢাকা কোলের একটি কোণে একটু চঞ্চলতা জেগে উঠেছে। বাগানের পথের লোকের আনাগোনা আজ একটু বেশি। অনেকেই আসছেন আপনজনের মত সহৃদয় কথাবার্তা বলে যাচ্ছেন। গুরুস্থনীয়েরা এসে অনেক উপদেশ দিয়ে গেলেন। ভালয় ভালয় ব্যাপারটা চুকে যাক্—কোন ভয় নেই—ঘাবড়াবার দরকার নেই। সকাল থেকে সবাকার সান্ত্বনা-বাক্যে অজয়ের মনমরা ভাব দূর হয়ে যাচ্ছিল। সন্ধ্যে হতে হতেই দুঃসাহসী হয়ে উঠলো অজয়।

যে যতই উপদেশ দিক, অজয় জানে আজ বাসন্তীর আত্মহত্যার দিন। সানাইয়ের শব্দ সেই লুপ্তির লগ্নকে ঘোষণা করছে। এই বিসর্জনকে বাধা দেবার মত কোন শক্তি নেই অজয়ের। বাসন্তীও বোধ হয় অজয়ের চেয়ে বেশি করে এই সত্যকে উপলব্ধি করেছে। তাই অজয় যদিও বিষণ্ণ, কিন্তু বাসন্তী একেবারে ধীর ও স্থির, অনিশ্চিতকে নিশ্চিতভাবে বরণ করে নেবার জন্য সে আজ প্রস্তুত।

সকাল থেকে সন্ধ্যে পর্যন্ত অজয় এক দুঃসহ অভিমানে পুড়ছিল। বাসন্তীকে সান্ত্বনা দিতে এ গাঁয়ের একটিও মানুষ এখনো আসেনি। আর কেউ আসুক না আসুক, অন্ততঃ একজনের আসা উচিত ছিল। কিন্তু সেও আসেনি। না আসার কি কারণ থাকতে পারে? তার কাছে কি আজও সব কথা না জানা আছে? কেশব স্বয়ং সবই বুঝতে পেরেছে, কেশবের মা সব কথা শুনেছেন, শুনে কোন আপত্তি করেন নি। বরং উৎসাহিত হয়েছিলেন। সাবদা নিজে থেকে অজয়কে ডেকে আড়ালে আড়ালে অনুরোধ করেছেন—'বাসন্তীকে আমার ঘরে আনতে চাই

অজয়।' কিন্তু কই, সেই আহ্বানের সাড়া আজ হঠাৎ লুকিয়ে পড়েছে। কেশবের মা যা ভেবে যা-ই বলে থাকুন না কেন, কেশব এ কী কাণ্ড করলো ? সে তো সব শুনেছে। তার কি কোন কর্তব্য নেই। কিন্তু সন্ধ্যে হয়ে আসছে, কেশব একবার উঁকি দিয়ে দেখলো না।

কেশব না হয় তার বুদ্ধিসুদ্ধি হারিয়ে ফেলেছে, উচিত অনুচিত বুঝতে পারে না। পুরাতন নতুনে তফাৎ দেখতে পারে না। যেখানে প্রত্যাখ্যান আছে, সেইখানেই নির্লজ্জ একগুঁয়ের মত জীবনের সব আগ্রহ সঁপে দিয়ে বসে আছে। মাধুরীর স্বপ্ন নিয়েই বিভোর হয়ে আছে কেশব। কিন্তু আজ বুঝবার মত সে ক্ষমতাও তার নেই যে, সেই স্বপ্ন লুট হয়ে অন্য জগতে চলে গেছে। সেখান থেকে মাধুরীকে ফিরিয়ে আনবার সাধ্য নেই কেশবের। মাধুরীকে কেউ ধরতে পারবে না। মাধুরী এক অদ্ভুত মেয়ে। যার কাছে যেমন খুশি এক একটি স্বপ্ন সৃষ্টি করেছে। যে ধরতে গেছে, তখুনি তার কাছ থেকে দূরে সরে গেছে।

কিন্তু মাধুরীও একবার এল না। বাসন্তীর সঙ্গে শেষবারের মত একটিবার দেখা করে যেতে আর বাধা কি ? তারও তো কর্তব্য রয়েছে। নিজের জীবনের কোন পথ পেল না মাধুরী, কিন্তু পরের পথ ভুল করে দিয়ে আর লাভ কি ? আসুক, আসুক, মাধুরী অন্ততঃ একবার এসে বাসন্তীর বিসর্জনের দুঃখে একটু হাসি ছড়িয়ে যাক। নইলে বাসন্তী সবার কাছ থেকে হাসিমুখে বিদেয় নিয়ে চলে যাবে। সবার জীবনে বাসন্তীর শেষ হাসি অভিশাপের কাঁটা হয়ে চিরকাল ফুটে থাকবে। কেউ আজ এই সামান্য কাটা তুললো না।

ভাবনা ছেড়ে দিয়ে অজয় সত্যই দুঃসাহসী হয়ে উঠলো। কেউ না আসুক, কারও আসবার প্রয়োজন নেই। বাসন্তী চলে যাক, কারও

কাছে সে কৃতজ্ঞ নয়, কারও কাছে তিলমাত্র উপকার ও অনুকম্পার বন্ধনে বাঁধা নয়। চিরদিনের গর্ব নিযে বাসন্তী আজ রাত্রে মান্দার গাঁযের হৃদযহীনতার বেড়া লাথি মেরে সরিযে দিযে চলে যাক।

বরযাত্রীদেব সঙ্গে এখনো একবাবও দেখা কবেনি অজয। প্রতিবেশী ও কুটুম্বেরা সকল আযোজন তদাবক কবছে। পাত্রটিকেও একবাব ভাল করে দেখেনি অজয। দেখবাব দবকাবও নেই। শোনা যাচ্ছে পাত্রটি অতি গোবেচাবা মানুষ, মাথায টাক আছে, বযসও নেহাৎ কম নয, দোকানদাবী আবম্ভ কবেছে, জমিদারী সেবেস্তাব কাজও কিছু কিছু জানে। যাঁবা খবব আনছেন, তাঁরা সবাই অজযকে আশ্বস্ত করছেন ও উৎসাহ দিচ্ছেন—পাত্রটি বেশ হযেছে, বেশ পাকাপোক্ত কাজেব মানুষ।

অজয ডাকলো—বাসন্তী।

বাসন্তী সামনে এসে দাঁডাতেই, অজয উৎসাহের সঙ্গে বললো—কিছু ভাবিস না বাসন্তী।

বাসন্তী হেসে ফেললো। অজয বুঝতে পাবলো—এই বুঝি বাসন্তীব অভিশাপেব হাসি মাত্র আবম্ভ হলো।

অজয—এইবাব তৈবী হযে নে। খুডিমাকে ডেকে দিচ্ছি। সময হযে এসেছে। কিছু ভাবিস না।

বাসন্তী—আমি তো কিছুই ভাবছি না।

নিঃশব্দে ঘবেব ভেতব ঢুকলো মাধুবী। অজয কিছুক্ষণ অপ্রস্তুতের মত দাঁডিযে রইল। মাধুবীব যেন স্থান কাল পাত্র জ্ঞান ছিল না। অজয যে সামনে দাঁড়িযে আছে, সে কথাও একেবাবে ভুলে গেছে মাধুবী।

বাসন্তী হেসে ফেললো।

মাধুরী একটু সচকিত হয়ে বললো—আপনি একটু অন্য ঘরে যান অজয়দা, বাসুর সঙ্গে ঝগড়াটা ভাল করে সেরে নিই।

চলে যাচ্ছিল অজয়। আঙিনার দিকে কলরব জেগে উঠছে। লোকজন আসছে। আলো জ্বলে উঠছে একে একে। একে একে নিমন্ত্রিতেরা আসছে। সুর বদল করে রাতের সানাই দীর্ঘ রাগিণীর আলাপে মেতে উঠেছে।

সংসারের ভিড়টা হঠাৎ যেন হিসাব-নিকাশ করার জন্য একটা লগ্নে বিচিত্ররূপে দেখা দিয়েছে। বরযাত্রীরা এসে গেছে। পুরহিত এসেছেন। আর ভাবনা করার ফুরসৎ নেই। ঘটনাগুলি নিজের নিয়মে গড়ে উঠছে, বদলে যাচ্ছে ফুরিয়ে যাচ্ছে।

আবার ব্যস্তভাবে ঘরের দিকে ফিরে এল অজয়। সঙ্গে কেশব।

সবার আগে কথা বললো কেশব—আমি কেন এসেছি বুঝতে পারছি না। তাই আমাকে মাপ করতে হবে।

মাটির দিকে মাথা হেঁট করে তাকিয়েছিল বাসন্তী। কেশবের কথা শেষ হলে কেউ কোন প্রত্যুত্তর দিল না। শুধু দেখা গেল, বাসন্তী হাসছে।

আর সময় নেই। খুড়িমা এসেছেন। সকলকে তাড়া দিচ্ছেন। বাইরের আসর থেকে বারবার অজয়ের ডাক আসছে। লগ্ন এগিয়ে আসছে।

হঠাৎ এক প্রবল ব্যস্ততা, হাঁকডাক আহ্বানের এক মুখের আলোড়ন। তারই মধ্যে, সভার আসরে বরমশাই এসে বসলেন।

সঞ্জীববাবু আর সারদা দেবী এক সঙ্গে দেখা দিলেন। দু'টি প্রসন্ন মূর্তি এক সঙ্গে চারদিকে ঘুরে ফিরে বারান্দার এক কোণে বসলেন।

শাঁখ বাজবার আগে এই উৎসবরাত্রির রূপটা কিছুক্ষণের মত যেন জায়গায় জায়গায় নানাভাবে ভাগ হয়ে রইল।

বারান্দার এক কোণে সঞ্জীববাবু ও সারদা দেবী গল্প করছিলেন। ওঁদের ছু'জনের আচরণে আজ আর কোন ব্যস্ততা নেই।

অজয়, মাধুরী, বাসন্তী ও কেশব—ঘরের ভিতর ওরা কিছুক্ষণের জন্য নির্বাক মূর্তির মত দাঁড়িয়েছিল। ওদের ভাষা ফুরিয়ে গেছে, পথ হারিয়ে যাচ্ছে। আজ আর ওদের কিছু বলবার নেই। কোন দিকে এগিয়ে যাবার পথ নেই।

শুধু উৎসাহের সঙ্গে ঘুরে বেড়াচ্ছিল পরিতোষ। পরিতোষ এসেছে, সে খবরও এখনও কেউ জানে না। পরিতোষ এসেই নিজের উপযুক্ত কাজে লেগে গেছে। বরের সঙ্গে কনেবাড়ির কোন মানুষ এ পর্যন্ত একটা কথাও বলেনি। সে যেন আজকের উৎসবের মধ্যে সব চেয়ে বেশি অবান্তর হয়ে গেছে। বিনা কারণে, বিনা দোষে।

সব কাজ ছেড়ে দিয়ে পরিতোষ শুধু বরের সঙ্গে গল্প করছিল ও হাসছিল।

সমাপ্ত